ঠগী

শ্রীপান্থ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

এই বইয়ের স্থান কাল পাত্র কিছুই কাল্পনিক নয়। প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি চরিত্র, এমনকি পরিবেশ এবং সংলাপও ঐতিহাসিক সত্য। অবশ্য উদ্ধৃতিগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে—শব্দ নয়, বক্তব্যের দিক থেকেই আক্ষরিক। যে সব পুঁথিপত্র এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে এ-কাহিনী রচিত হয়েছে পরিশিষ্টে তার উল্লেখ আছে। সুতরাং পুনর্কথন উপলক্ষ্যে আপন বাচনভঙ্গী এবং নতুন করে ঘটনা-বিন্যাস ছাড়া লেখক হিসেবে আমার কৃতিত্ব অতি সামান্য। যাঁদের উৎসাহ এবং আন্তরিক সহযোগিতায় এই সামান্যটুকুও অবশেষে নিষ্পন্ন হল তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য শ্রীরমাপদ চৌধুরীর নাম। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বন্ধুবর শ্রীঅমলেন্দু চৌধুরীর সক্রিয় উদ্যোগে নির্ঘণ্টটি যোগ করা সম্ভব হল। তাঁকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্রীপান্থ

শ্রীমতী মীরা সরকার-কে

মেজর-জেনারেল স্যার উইলিয়াম হেনরী স্লীম্যান।
যৌবনে তিনিই বিখ্যাত 'ঠগী স্লীম্যান'।

স্লীম্যানের হাতে লেখা ঠগীদের একটি বংশ-তালিকা
তাঁর হাতে এগুলো ছিল অন্যতম হাতিয়ার

হারিয়ে গেলেন।

ভূপাল থেকে আউরঙ্গাবাদের পথে হাঁটছিলেন দুই মুসলমান পথিক। দুই জনের হাতে দুই গাদা বন্দুক। সঙ্গে একটি ছোট্ট আরবী ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে সওদা।

রুক্ষ পাহাড়িয়া পথ। মাইলের পর মাইল জনহীন উপত্যকা। দিনান্তে কখনও কাঁটাগুল্মের ঝোপের মত এক-আধখানা গ্রাম। চলতে চলতে ওঁরা তাপ্তী নদীর তীরে এসে হাজির হলেন।

তাপ্তীর সেই নামহীন ঘাটে সেদিন যেন কোন পীরের মেলা। এখানে ওখানে গাছতলায় রাশি রাশি মানুষ। কেউ রসুই পাকাচ্ছে, কেউ তামাক খাচ্ছে, কেউ গলা ছেড়ে গান গাইছে। বিন্ধ্যাচলের গান। তাদেরই একজন এগিয়ে এসে সালাম জানাল। বলল, আমার নাম রোসন জমাদার, দেশ ঝাঁসীর পুরা গাঁ। দলে আমরা পাঁচ কুড়ি তিন গণ্ডা। আমরাও আউরঙ্গাবাদের যাত্রী। আর একজন দু'থালা খাবার নিয়ে এগিয়ে এল। বলল, খেতে বসেছিলাম, আপনারা মেহ্‌মান, বহু দূর হেঁটে এসেছেন, আপনাদের না দিয়ে খেলে গুনহ্‌া হয়!

দেখতে দেখতে দু'দলে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিশ্চিন্ত পথিকেরা একসঙ্গে চলতে আরম্ভ করলেন। তাই ভাল। নির্জন পথ-ঘাট, দিনকাল ভাল নয়, দল যত বড় হয় ততই মঙ্গল।

বোরহানপুর পেছনে পড়ল। ঝাঁসীর একশ' বারো মানুষের বিরাট বাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন ভূপালের কারবারী-যুগল। এবার আর কোন ভয় নেই তাঁদের, কোন দুশ্চিন্তা নেই। যেখানেই রাত হোক, রাত্রি নিয়ে কোন ভাবনা নেই।

সন্ধ্যা যখন নামল ওঁরা তখন আরও ছ' ক্রোশ দক্ষিণে, একটি গাঁয়ের বাঁয়ে। গাঁয়ের নাম—তানকোলি। রোসন জমাদার বলল, সেই ভাল, রাতটা এখানেই কাটান যাক। অদূরে সন্ধ্যার শান্ত গ্রাম। কালো কালো কুঁড়েগুলোর পিঠ ফুঁড়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া উঠছে। রাত্তিরের খাবারের আয়োজন হচ্ছে। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। যেন এক ঝাঁক জোনাকী স্থির হয়ে আছে। চারদিকে তাকিয়ে ভূপালের মানুষ দু'জনও সায় দিলেন, হ্যাঁ, সেই ভাল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে বোঝা নামান হল। আম্রকুঞ্জের ধারে ছাউনি পড়ল। কেউ রুটি বানাতে বসল, কেউ তামাক সাজাতে, কেউ ধারে কাছে শুকনো ডালপালা কিছু পাওয়া যায় কিনা তাই দেখতে বেরিয়ে গেল।

হাতে হাতে কাজ। দেখতে দেখতে আয়োজন শেষ। সন্ধ্যার দুই ঘড়ি পরেই খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ। রোসন জমাদার নিজে অতিথি দু'জনের পাশে বসে এক সঙ্গে খেল। খাওয়া শেষে নিজে গিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এল। তারপর বসল গল্পে।

নানা রাজ্যের নানা গল্প। শুনতে শুনতে চোখ জড়িয়ে আসে। তবুও জোর করে জেগে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। বহু দেশ দেখেছেন ভূপালের এই দুই কারবারী। কিন্তু এমন মিষ্টি গলা, গল্প বলার এমন ভঙ্গী—আর কোনদিন শুনেছেন বলে মনে পড়ে না। ওঁরা ঠায় জেগে বসে রইলেন। মাঝে মাঝে তামাক আসছে, জমাদার গুর গুর করে তাই টানছে; বাতাসে মিষ্টি গন্ধ, ওঁরা তন্ময় হয়ে রোসন জমাদারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

তাই ছিলেন। রাত ক'ঘড়িতক কেউ তা জানে না, কিন্তু রোসন জমাদার নিজে বলেছে, ভূপালের কারবারী দু'জন তার মাতুরে বসেই গল্প শুনছিলেন। বোরহানপুর থেকে ছ' ক্রোশ দূরে তানকোলি গাঁয়ের বাঁয়ে আমগাছতলায় বিছান সেই মাতুরটিতে।

তবুও পরদিন ভোরে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না মানুষ দু'টিকে। ওঁরা হারিয়ে গেলেন। কোন্ যাদুবলে যেন উধাও হয়ে গেলেন। দুটো বন্দুক, একটি ঘোড়া, এক ঘোড়া সওদা, জ্বলজ্যান্ত দু'টি মানুষ—কোথাও কোন চিহ্ন নেই তার। ভোর হল। উদ্বিগ্ন রোসন জমাদার চারদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখল। তারপর সূর্য ওঠার আগেই পা বাড়াল দক্ষিণের পথে। তার ঝাঁসীর দলে এবার আর ভূপালের কারবারীরা নেই। ওঁরা হারিয়ে গেছেন। কোথায় কেউ জানে না। বুড়ো রোসন জমাদারের মুখের দিকে তাকালে মনে হয়—সেও না।

হারিয়ে গেলেন।

আরও একদল মানুষ হারিয়ে গেলেন।

ওঁরা দলে ছিলেন ছ'জন। দলপতি পনের বছরের এক তরুণ। বাকী পাঁচজন তার সহচর।

একই দক্ষিণী পথ। কাকার কাছ থেকে বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছে বালক। বাবা—এক বর্ধিষ্ণু গাঁয়ের মোড়ল। কাকা ব্যবসায়ী। তিনি প্রবাসী, শহরে থাকেন। পনের বছরের ছেলে, একা এত দূর পথে ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। সাবধানী কাকা তাই সঙ্গে পাঁচজন লোক দিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া একটি ঘোড়াও। জিনিষপত্র যা দিয়েছেন—এক ঘোড়াই যথেষ্ট।

চলতে চলতে ওঁরা এসে হাজির হলেন এক সরাইখানায়। সেদিনকার মত সেখানেই রাত কাটান ঠিক হল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওঁরা শুতে যাবেন—এমন সময় সেই ছোট্ট সরাইয়ে এসে উপস্থিত

হল নতুন আগন্তুক দল। সে দলে মানুষ হবে প্রায় চল্লিশ জন। তারাও রাতটা এখানেই থাকতে চায়।

একই ছাউনির নীচে আস্তানা। সুতরাং আলাপ হল। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল ওরা জয়পুরের মানুষ। কাজের ধান্ধায় দক্ষিণে এসেছে। দলপতি রুস্তম খাঁ আরও জানাল—আপাতত দিন তিন তারাও একই পথে চলবে বলে মতলব করেছে। তারপর সর্দারের ছেলে যখন চলে যাবে বাঁয়ে জব্বলপুরের দিকে, ওরা তখন যাবে ডাইনে ইন্দোরের দিকে। শুনে ছেলেটি যারপর নাই খুশী হল,—বহুৎ আচ্ছা, একসঙ্গে চলা যাবে। তার সঙ্গীরা মাথা নেড়ে সায় দিল।

পর পর দুই দিন একসঙ্গে চলছে ওরা। জয়পুরের রুস্তম খাঁ এখন আর দক্ষিণী বালকের কাছে অপরিচিত ভিন্‌দেশী নয়, ওরা দু'জনে যেন যুগ-যুগান্তের বান্ধব। নিজের বয়সের কথা ভুলে গেছে রুস্তম খাঁ, সে যেন কোন স্নেহপরায়ণ অন্ধ অভিভাবক—বালক যা বলে তাতেই সম্মত। সে যদি বলে, এ গাছতলাতে বসে বিশ্রাম করব, তবে রুস্তম খাঁ সেখানেই ছাউনি ফেলতে আদেশ করে; জায়গাটা ভাল কি মন্দ, সে কথা বিবেচনা করে না।

তৃতীয় দিনে ওরা এসে হাজির হল রঙ্গুর বলে একটা জায়গায়। ছোট্ট হাট। খানকয় মহাজনের ঘর। ওরা একসঙ্গে সেখানেই রাত কাটাল। পরদিন সকালে আবার যাত্রারম্ভ হল। সন্ধ্যায় ওরা এসে দৌসা নামে আর এক হাটে এসে উপস্থিত হল। বালক বলল, আজ এখানেই থাকা যাক। কিন্তু বেঁকে বসল রুস্তম খাঁর দলের লোকেরা। তারা বলল, এখনও ভাল করে সন্ধ্যে মিলায়নি, হাঁটলে আরও দু'ক্রোশ পথ অনায়াসে এগিয়ে যাওয়া যায়। রুস্তম খাঁ তাদের অনেক বোঝাল। কিন্তু তবুও তারা কিছুতেই এখানে রাত কাটাবে না। উপায়ান্তরহীন রুস্তম খাঁকে বাধ্য হয়ে বিদায় নিতে হল। সরাইখানায়

কথাবার্তা বলে বালকের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে সে বিদায় নিল। যাওয়ার আগে বলে গেল, নসিবে থাকলে কাল আবার দেখা হবে।

সত্যিই দেখা হয়ে গেল। রুস্তম খাঁর দল তখনও যাত্রার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত। এমন সময় বালক এবং তার সঙ্গীরা এসে হাজির। বলল, তোমাদের ধরব বলেই আমরা অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কই, পারলে কি পালাতে?

খুশীতে বুড়ো রুস্তম খাঁর চোখ ভরে জল এল।

আবার দুই দল এক সঙ্গে পথে নামল। এবার সন্ধ্যা নামল একটা মরা নদীর ধারে এসে। রুস্তম খাঁ আজ আর বালককে ছেড়ে যেতে রাজী নয়। তার হুকুমে সেখানেই ছাউনি পড়ল। তখনও রাত হয়নি। চারদিকে জনহীন প্রান্তর, পথের ডাইনে হঠাৎ কতখানি বন। নদীর ধারে অস্তায়মান সূর্যের দিকে মুখ করে রুস্তম খাঁ বসে আছে। পাশে তার সেই বালক। অদূরে তার সঙ্গীরা। কেউ ঘোড়ার তদারক করছে, কেউ রান্নার আয়োজন করছে। রুস্তম খাঁ জয়পুরের গল্প বলছে, বালক তন্ময় হয়ে সে কাহিনী শুনছে।

হঠাৎ কি হল—বালকের চোখ থেকে মুহূর্তে সব যেন উধাও হয়ে গেল। সে হারিয়ে গেল। তার পাঁচ সঙ্গী, ঘোড়া—সব উধাও হয়ে গেল।

বাবার কাছ থেকে খবর এল ছেলে বাড়ী ফেরেনি। উন্মাদের মত কাকা পথে নেমেছিলেন তাকে খুঁজতে। খুঁজতে খুঁজতে রঙ্গুরের সেই মহাজনের ঘর। সেখানে এসে তিনি শুনেছিলেন—ছেলেটি সেখানে রাত কাটিয়েছিল বটে! তারপর—দৌসা। সেখানেও সেই একই কথা—ভোরে ওরা এখান থেকে বেরিয়ে গেল।

কাকা ঘোড়ার খুর ধরে আরও ক' ক্রোশ এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু পদচিহ্ন সেই নদী তীরে এসেই যেন শেষ। তারপর আর কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু সেই মরা নদী, জনহীন প্রান্তর, আর এক

টুকরো একটি বন। তার আদুরে ভাই-পো কোথাও নেই। সে হারিয়ে গেছে। কোথায়, কেউ জানে না। ক'দিন পরে দৌসার সেই সরাইখানায় আবার ফিরে এসেছিল রুস্তম খাঁ। ঘরে ফেরার পথে উন্মাদ কাকা তখনও সেখানে হাউ হাউ করে কাঁদছেন। রুস্তম খাঁ এগিয়ে এসে খবর নিয়েছিল বালকের। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শোকাতুর কাকা শেষ সান্ত্বনা পেয়েছিলেন সেদিন—কি করে হারিয়ে গেল ছেলেটি, বুড়ো এখনও তা ভাবতে পারে না।

উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকের কাহিনী। তখনও রেল বসেনি, কিন্তু কলকাতার পত্তন হয়েছে, শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধ হয়ে গেছে—ভারতে কোম্পানির রাজত্ব দ্রুত মধ্যাহ্নের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তবুও সে যেন কোন অবিশ্বাস্য পৃথিবীর খবর। ভারত এক অবিশ্বাস্য দেশ, তার ঘর থেকে বের হলে মানুষ ঠিকানায় পৌঁছায় না, তারা হারিয়ে যায়।

নিরুদ্দিষ্ট—আজকের পৃথিবীতেও বিস্ময়কর কোন ঘটনা নয়। মানুষ এখনও হারায়—হারিয়ে যায়। কখনও স্কুল থেকে ফেরার পথে বারো বছরের ছেলে হারিয়ে যাচ্ছে, কখনও সিনেমার পথে অষ্টাদশী তরুণী, কখনও বা তীর্থের ঘাট থেকে কুলবধূ, ট্রেনের কামরা থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত গৃহস্থ। কিন্তু সেদিনের কাহিনীর সঙ্গে কোন মিল নেই তার। সে নিরুদ্দিষ্টের দল আরও নিঃশব্দ, তাদের হারিয়ে যাওয়ার পথ আরও নিশ্ছিদ্র।

ঝাঁক ঝাঁক সিপাই হারিয়ে যেত। ছুটি নিয়ে দল বেঁধে দেশে যেত, আর ফিরত না। ফৌজের কর্তৃপক্ষ কিছুকাল অপেক্ষা করতেন, তারপর নাম কেটে দিতেন। পাশে লাল পেন্সিলে লিখে রাখতেন—ডেসার্টার ; পালিয়ে গেছে। উত্তর ভারতে তীর্থ করতে গিয়ে দক্ষিণের মস্ত দলটি কোন দিনই আর গাঁয়ে ফিরত না। আত্মীয়রা

অপেক্ষা করতেন। তারপর কেঁদে কেটে আবার সংসারে মন দিতেন। কোন স্মরণীয় সন্ধ্যায় অথবা নিঃসঙ্গ শয্যায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলে মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন—ভাগ্যবান ছিল, গঙ্গা স্নান করতে গিয়ে গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে। বনপথে বাণিজ্য করতে গিয়ে ভূপালের সওদাগর তখন ঘরে ফেরে না, পাঁচ দিনের পথ ভেঙ্গে ছেলে মায়ের কোলে ফিরতে পারে না। লোকে বলত—বাঘে খেয়েছে। নয়ত—সাপে, কিংবা অজ্ঞাত কোন ব্যাধিতে।

ভারতবর্ষ তখন এক আশ্চর্য দেশ। বছর বছর তখন হাজার হাজার মানুষকে সেখানে বাঘে খায়, হাজার হাজার মানুষের গঙ্গা প্রাপ্তি হয়, হাজার হাজার সেপাই কোম্পানির ফৌজ থেকে পালিয়ে যায়। সে যেন এক নিরুদ্দিষ্টের দেশ। সেখানে হারিয়ে যেতে কোন মানা নেই।

বিশেষ কোন বছরে নয়, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ তাই যাচ্ছিল। হারিয়ে-যাওয়া তখন বিস্তীর্ণ ভারতে প্রতিদিনের নিয়ম। জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক খুব সাবধানে মনোযোগ দিয়ে হিসেব কষতে বসেছিলেন একবার। হিসেব শেষে তিনি জানিয়েছিলেন—ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তার আগের তিন শ' বছরে প্রতি বছর গড়ে অন্তত চল্লিশ হাজার মানুষ হারিয়ে গেছে এদেশের কোল থেকে। হ্যাঁ, বছরের পর বছর—তিন শ' বছর। প্রতি বছর গড়ে তাদের সংখ্যা ছিল—চল্লিশ হাজার।

কোথায় গেল সেই লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা? কোথায় গেল ভূপালের সেই দুই কারবারী, জব্বলপুরের পথ থেকে পাঁচ সঙ্গী সহ পনের বছর বয়সের দক্ষিণী মোড়ল-তনয়?

উত্তরটা দিয়েছিল রোসন জমাদার নয়, তার ওপরওয়ালা বুকুত জমাদার। সাহেবের কাছে সগর্বে সে বলেছিল, বাঘ নয়, সাপ নয়, যতদূর মনে পড়ছে ভূপালের সেই কারবারী দু'জন হারিয়ে গিয়েছিল যার হাতের ছোঁয়ায় সে আমি।

২

—আমার নাম বুকুত জমাদার, দেশ ঝাঁসীর পুরা গাঁ। বুড়ো জমাদার টেবিলের ওপারে বসা সাহেবকে সালাম জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বিনা ভূমিকায় স্বরু করেছিল তার জবানবন্দী।

—শরৎ কালের কথা। সেবার আমরা দক্ষিণের পথে বের হয়েছি। আমরা মানে আমি, ঠাকুরী, ধোকুল, পাণ্ডে আর মোকলাল এই পাঁচ জন। সবাই আমরা এক গাঁয়ের মানুষ।

ঝাঁসী, ভিল্‌সা, রেলি হয়ে আমরা ভূপালের দিকে এগিয়ে চললাম। কিন্তু ভূপালে গেলাম না। শহর ডাইনে রেখে চীপানেরেতে আমরা নর্মদা পার হলাম। নদীর ওপারে গাঁ। গাঁয়ের ধারে মস্ত এক বটগাছ। আমরা সেখানে বসে বিশ্রাম করছি, হঠাৎ চোখে পড়ল অদূরে আর একটি গাছতলায় কারা যেন জট পাকিয়ে বসে আছে। অনেক লোক। আমাদের একজন গিয়ে খবরাখবর করে এল। ওরাও আমাদের মতই, একই মতলব নিয়ে পথে নেমেছে।

সে দলে ছিল পঞ্চাশ জন। সবাই এক দলের মানুষ নয়। দশ জন ছিল রোসন জমাদারের অনুচর, তিনজন গুলাব খাঁয়ের, কিছু মাদারী সেখের, কিছু আহির মোল্লা এবং কিছু কেরী লোদীর। সাত জন করে ছিল ঘুরীবা আর জুলফিকার জমাদারের দলে।

আলাপ হল। আমাদের মত ওরাও তখন পর্যন্ত খালি হাত। সুতরাং স্থির হল এক সঙ্গে চলাই ভাল। সে রাত্তিরটা আমরা সেই গাছতলাতে কাটিয়ে দিলাম। পরদিন ভোরে আবার সুরু হল পথ চলা। এবার আমাদের বেশ বড় দল।

ছুই দিন পরে দল আরও বড় হয়ে গেল। তৃতীয় দিন চলতে চলতেই পথে দেখা হয়ে গেল চুয়ান্ন জনের আর একটি দলের সঙ্গে। অবশ্য তারাও সবাই এক দলের ছিল না। প্রসাদ লোদী, পরশুরাম জমাদার, মনোহর জমাদার—প্রত্যেকের তাদের আলাদা আলাদা দল। পথেই তারা এক হয়েছে। এক সঙ্গে চলছে। আমরাও যোগ দিলাম তাদের সঙ্গে। তারপর সবাই মিলে হাঁটতে হাঁটতে ক'দিন বাদে এসে হাজির হলাম তাপ্তী নদীর ধারে। দলে আমরা তখন একশ' বারোজন।

সেখানেই আলাপ হয়েছিল ভূপালের কারবারী ছু'জনের সঙ্গে। সোথাই হয়েছিল রোসন জমাদার। তার ওপরই ভার দেওয়া হয়েছিল ভিন্‌দেশীদের বশ করবার। রোসন জমাদার পুরানো লোক, তার মোটেই বেগ পেতে হয়নি।

তানকোলি সম্পর্কে আগেই মনস্থির করে রেখেছিলাম আমরা। জায়গাটা ভাল। নির্জন। অদূরে গাঁ। গাঁয়ের উত্তরে নদী। নদীর ধারে পথ, পাশেই বন। এর চেয়ে ভাল জায়গা কয়েক ক্রোশের মধ্যে আর ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পরেই তাই 'ঝিরণী' দিয়ে দেওয়া হল। মানুষ ছুটি অবশ্য বসেছিল রোসন জমাদারের মাছুরে। কিন্তু সে হাত ছোঁয়ায়নি। কাজটা শেষ করেছিল—খোদাবক্স মুসলমান আর ভুকুত ব্রাহ্মণ।

—কত পাওয়া গেল? সাহেবের হয়ে প্রশ্ন করলেন হিন্দুস্তানী দারোগা।

—নগদ পাওয়া গিয়েছিল হুজুর একশ' পঞ্চাশ টাকা। তাছাড়া

দুটো বন্দুক, একটা ঘোড়া, এক ঘোড়া কাপড়চোপড়—সওদা। এগুলো বাদ দিলে ভাগে মাথাপিছু প্রত্যেকে এক টাকা পেয়েছিলাম আমরা।

—মাত্র এক টাকা? সবিস্ময়ে বুকুত জমাদারের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন সাহেব। নিস্পৃহ জমাদার উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ হুজুর। তবে ক'দিন পরে বারওয়াঘাট সব পুষিয়ে দিলে।

—বারওয়াঘাট! গোটা ঘর আবার নড়ে চড়ে বসল। সাহেব টেবিলে মেলে রাখা ম্যাপটায় জায়গাটার পাশে একটা ছোট্ট লাল দাগ দিয়ে কান পাতলেন। দারোগা খাতার পাতা উল্টালেন। বুকুত জমাদার যেন ওঁদের এই তৈরী হওয়ার অপেক্ষাতেই চুপ করে ছিল। এবার সে মুখ খুলল।

—ভূপালের কারবারীদের নিয়ে ঝামেলা যা ছিল সে তো রাত্তিরেই মিটে গেল। পরদিন ভোরে আবার পথে নামলাম আমরা। এবার বোরহানপুর থেকে দশ ক্রোশ দক্ষিণে ইদৌলাবাদ। শহরের বাইরে শহরতলীর এক কোণে পথের ধারে কয়েকটা গাছ, তার আড়ালে এক ফকিরের টুকিয়া—ছোট্ট একটা ঘর। সেদিনকার মত সেখানেই ছাউনি ফেললাম আমরা। নসিব ভাল। সেই দিনই খবর পাওয়া গেল—আটজন রকৌরিয়া শহরের দিকে যাচ্ছে। তারা বোম্বাইয়ের নামী কারবারী ধনরাজ শেঠের লোক। টাকা নিয়ে বোম্বাই থেকে ইন্দোর চলেছে। সঙ্গে তাদের ছয়টি বন্দুক, দু'দুটি উট। উটের পিঠে থলি বোঝাই টিপুশাহী রুপেয়া। তিলহাইরা আরও খবর নিয়ে এল, আজকের মত রাতটা তারা ইদৌলাবাদেই কাটাবে। খোদাবক্স আর মল্লু জমাদারকে তিলহাই করে পাঠিয়ে দেওয়া হল শহরে। আড়ে থেকে তারা লোকগুলোর ওপর নজর রাখবে। তিলহাইদের তাই কাজ।

পরদিন সকালে রকৌরিয়ারা আবার পথ ধরল। পেছনে পেছনে আমাদের তিলহাই। আমরা ভেবেচিন্তে দেখলাম, দিন শেষে ওদের

তানকোলিতে গিয়ে থামতেই হবে। কিন্তু মাত্র একদিন আগে সেখানে ভূপালের কারবারীদের নিয়ে খেলে এসেছি আমরা। তাই ঠিক হল ওপথে আজই আবার ফিরে না যাওয়াই ভাল।

বদলী হিসেবে আমরা চান্দদোভির পথ বেছে নিলাম। আগেই বলেছি সেদিন আমাদের নসিব ভাল। তিলহাইরা পথেই খবর দিয়ে গেল, রকৌরিয়ারা তানকোলিতে থাকছে না, তারা রাত কাটাবে বোরহানপুরে। শুনে পরদিন ভোরেই পঞ্চাশজন বাছা মরদ নিয়ে মহারাজ পাঠক, জালিম আর পরশুরামরা চলে গেল বোরহানপুরের দিকে। আর একদল চলে গেল অন্যদিকে, ভূপাল জেলার দেওলিয়ার পথে। কে জানে, বোম্বাইওয়ালারা শেষ পর্যন্ত কোন্‌দিকে মোড় নেয়।

সন্ধ্যার এক ঘড়ি আগে আমরাও বোরহানপুরে এসে সামিল হলাম। এবারও শহরের বাইরেই ছাউনি ফেলতে হল। পথের ওপর নজর রাখতে হবে। তিলহাইরা খবর দিয়ে গেল ওরা বাজারে উঠেছে। মল্লু আর দলের আর-একজন তখুনি চলে গেল বাজারে।

কিন্তু রকৌরিয়ারা বাজারে নেই। ওরা গোটা বাজার তন্ন তন্ন করে খুঁজল। এক জায়গায় তিনটে উটও দেখতে পেল, কিন্তু রকৌরিয়ারা কোথাও নেই। ওরা মুখ বেজার করে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে খলিল, মনোহর আর মুদারা—এই তিন জনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আসিরের পথে। ওদের বলে দেওয়া হল—যদি হদিশ করতে পার তো একশ' রুপেয়া!—আমরা তোমাদের জন্যে আসিরে অপেক্ষা করব, তারপর বরগাঁওয়ে।

ওরা তিন জন যখন আসিরে পৌছেছে তখন মাঝরাত্তির। সুতরাং রাত্তিরে আর খবরাখবর বিশেষ হল না। কথামত পরদিন ভোরে আমরা আসিরে গিয়ে হাজির হয়েছি। কিন্তু রকৌরিয়াদের কোন খবর নেই। মিছিমিছি আর এখানে বসে থেকে কি লাভ! আমরা আশরফ আর মঙ্গা এই দুইজনকে বাজারে পাঠিয়ে বরগাঁওয়ের

পথ ধরলাম। ওদের বলে দিলাম, আটা ময়দা যা পাওয়া যায় কিছু কিনে তোমরা চলে এস, আমরা সামনেই যে নালাটা দেখছ তার ধারে অপেক্ষা করে থাকব।

বাজার থেকে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল ওরা। বলল, রকৌরিয়ারা বাজারেই ছিল। আমরা দেখে এলাম কাষ্টমস হৌসে বসে তারা হিসেব মিটাচ্ছে! আমরা সেখানে দু'জন তিলহাই পাঠিয়ে দিয়ে তক্ষুনি বরগাঁওয়ের পথ ধরলাম।

বরগাঁও এসেছি, কতক্ষণ পরেই তিলহাইরা ফিরে এল। কানে কানে বলল, রকৌরিয়ারা পথ বদলে ফেলেছে, তারা আর এদিকে আসছে না, পঞ্চপুকুরের দিকে যাচ্ছে। শুনে তক্ষুনি আবার সে পথ ধরতে হল।

কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, ওরা পঞ্চপুকুরেও নেই।—তবে কি মানুষগুলো হাওয়া হয়ে গেল? সারারাত আমরা পঞ্চপুকুরে নানা জল্পনা-কল্পনা করলাম। ভোর হওয়ামাত্রই ছ'জনকে পাঠিয়ে দিলাম চারদিকে। যে করে হোক, খুঁজে বের করতেই হবে মানুষগুলোকে।

সন্ধ্যার কিছু আগে শেরপুরের পথে গিয়েছিল যে দু'জন তারা ফিরে এল। এসে খবর দিল রকৌরিয়ারা আগের রাত্তিরটা শেরপুরেই কাটিয়েছে। এখন তারা ইন্দোরের দিকে হাঁটছে। শেরপুর থেকে আট ক্রোশ দূরে তারা রাত কাটাবে। ওরা গাঁয়ের নামটাও জেনে এসেছিল, আসতে আসতে ভুলে গেছে। অন্য চার জন লোকও ততক্ষণে ফিরে এসেছে। তারা জানাল—রকৌরিয়ারা কোথায় গেছে কেউ তার আভাস দিতে পারে না। বোঝা গেল, শেরপুরে পাওয়া খবরটাই পাকা। আমরা আর সময় নষ্ট না করে ইন্দোরের দিকে পা চালালাম। দলের সবাই ক্লান্ত! কিন্তু তবুও খবর যখন পাওয়া গেছে, হাঁটতেই হবে।

আট ক্রোশ হেঁটে অবশেষে আমরা যখন সেই নাম-না-জানা

গাঁয়ে এসে হাজির হয়েছি তখন মাঝরাত্তির। পথের ধারে একটা বটগাছ ছিল, তার তলাতেই আমরা মাতুর পেতে একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিলাম।

ভোরে সত্যি সত্যিই গাঁ থেকে বেরিয়ে এল রকৌরিয়ারা। আমরাও যাত্রার জন্যে তৈরী হলাম। প্রায় তু'মাইল হেঁটেছি, এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল কাস্টমস চৌকির চৌকিদাররা। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রকৌরিয়ারা চোখের আড়ালে চলে গেল। পাছে একেবারেই হারিয়ে যায়, সেই ভয়ে আমি কোঁচড় থেকে একটা টাকা আর একটা সিকি দিয়ে তাড়াতাড়ি চৌকিদারদের সঙ্গে মিটিয়ে নিলাম।

ইতিমধ্যে লোকগুলো বারওয়াঘাটে নর্মদা পার হয়ে গেছে। নদীর ওপারে বারওয়া বাজার। সেখানে ওরা আস্তানা পেতে ফেলেছে। আমরাও যথারীতি গাছতলায় বসে গেলাম। লোকগুলো সেদিন আর পথে বের হল না। বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই একটা দিন জিরিয়ে নিচ্ছিল। আমরাও ক্লান্ত। বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে মনে মনে তাই খুশীই হলাম।

পরদিন ওরা বাজার ছাড়তে যাবে এমন সময় কাস্টমস চৌকির দারোগার তলব পড়ল। সবাইকে তার সামনা দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু রকৌরিয়ারা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেল। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি মাশুল নিয়ে দারোগার সঙ্গে কথা কাটাকাটি চলছে তাদের। ভালই হল। যতক্ষণ ওদের মামলার ফয়সলা না হচ্ছে ততক্ষণ আমরাও আমাদের মাশুল দিচ্ছি না। কেননা, ওদের পিছু পিছু চলাই আমাদের মতলব।

বেলা গড়িয়ে চলল। কিন্তু দারোগা তবুও কিছুতেই ছাড়ছে না ওদের। আমরাও সেই থেকে বসেই আছি। শেষে আমাদেরই একজন মহারাজ পাঠক এগিয়ে গেল। সে দারোগাকে বলল, হুজুর, এতক্ষণ ওদের আটকে রেখেছেন। এদিকে যে বিকেল হতে চলল। বেচারারা টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছে, পরে যদি একটা কিছু হয়!

ওর কথা শুনে দারোগার চৈতন্য হল। তিনি তক্ষুনি পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে ওদের ছেড়ে দিলেন। কিন্তু রকৌরিয়ারা ততক্ষণে মত পাল্টে ফেলেছে। পাঠকের কথায় তাদেরও হুঁস হয়ে গেছে। অবেলায় তারা আর এ চৌকি ছেড়ে যেতে রাজী নয়।

আমাদেরও তাই বাধ্য হয়েই কাছাকাছি থাকতে হল। চৌকি থেকে দু'ক্রোশ গিয়েই আমরা সেদিনকার মত হাঁটায় ক্ষান্ত দিলাম। সেখানেই রাত্তিরে রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া হল।

সকালে সবে আমরা তৈরী হচ্ছি এমন সময় পথের বাঁকে ওদের উট উঁকি দিল। তাড়াহুড়ো করে আমরা তল্পিতল্পা বেঁধে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলাম।

কিছুদূর গিয়েই সামনে একটা নালা। তার ধারে প্রকাণ্ড এক বাঁশবন। আমরা সেখানে বসে গেলাম। যেন বিশ্রাম নিচ্ছি। দলের দু'জন গিয়ে ক'টা বাঁশ কেটে নিয়ে এল। আমরা বসে বসে সে বাঁশে ক'খানা লম্বা লাঠি বানালাম।

আগের দিন রাতে কাস্টমস চৌকিতে একজনকে রেখে আসা হয়েছিল। ঘোড়ায় চড়ে সে রকৌরিয়াদের আগে আগে চলে এল। এসে আমাদের সঙ্গে বিশ্রাম করতে বসে গেল। তার প্রায় পেছনে পেছনেই রকৌরিয়ারা এসে হাজির। ওর দেখাদেখি তারাও আমাদের সামনে এসে থেমে দাঁড়াল। তারপর অনুরোধ করা মাত্র আমাদের সঙ্গে তামাক খেতে বসে গেল।

ওরা তামাক খাচ্ছে। আমরা ধীরে ধীরে ওদের ঘিরে বসছি। হঠাৎ 'ঝিরণী' উঠল। ওরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দু'জন তখনও উটের পিঠে ছিল। আমাদের জানা ছিল, তাই থাকবে হয়ত। সে জন্যেই লম্বা লাঠিগুলোর ব্যবস্থা করেছিলাম। তাই দিয়ে ওদের নামান হল। তারপর মাত্র কয়েক মিনিটের মামলা।

সাহেব প্রশ্ন করলেন, দেহগুলো কোথায় রেখেছিলে?

—কেন? সেই শুকনো নালার তলায়! সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল বুকুত জমাদার।—ওদের চাপা দিয়ে আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে তক্ষুনি ঘুরিবার দিকে পা বাড়ালাম। এবার আমাদের আঁকাবাঁকা বনপথ। দু'ক্রোশ চলে উটের পিঠের বোঝা নামিয়ে সেগুলো ঘোড়ার পিঠে চাপান হল। উট দুটোকে ছেড়ে দেওয়া হল বনে।

সেখান থেকে আমরা আবার অন্য পথ ধরলাম। এবার আর ইন্দোরের দিকে নয়—পূব দিকে। তিন দিন চলে অবশেষে সন্দৌলপুরে এসে হাজির হলাম আমরা। এখানে এসে খুরজিগুলো কাটা হল।

—কি পেলে? কলম থামিয়ে দারোগা প্রশ্ন তুললেন।

—বস্তা থেকে পাওয়া গেল পনের হাজার টিপুশাহী টাকা, একশ' তোলা রূপা এবং শিলমোহর করা একটা পেতলের বাক্স।

—তাতে কি ছিল? আবার প্রশ্ন করলেন দারোগা। ততক্ষণে ফর্দটা টোকা হয়ে গেছে তাঁর।

—তাতে ছিল চারটে হীরের আংটি, আটটা মুক্তো আর একজোড়া সোনার বালা। হয়ত কাউকে উপহার পাঠিয়েছিল ধনরাজ শেঠ। জিনিষগুলোর দাম ধরেছিলাম আমরা হাজার টাকা। তবে আখেরে খুব বেশী কিছু ভাগে পড়েনি আমাদের। দলটা বড়। তাছাড়া জালিম একটা মোটা টাকা আগেই এক পাশে সরিয়ে রেখেছিল। কেননা, বিন্ধ্যাচলে একটা পুজো দিতে হবে। তা হলেও প্রত্যেকে দেড়শ' টাকা করে পেয়েছিলাম আমরা!

—প্রত্যেকে সমান পেয়েছিলে? দারোগা আবার প্রশ্ন তুললেন।

—হ্যাঁ, এমনকি যারা হাজির ছিল না তারাও নিজ নিজ ভাগ পেয়েছিল। ভূপালে যারা চলে গিয়েছিল তাদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের হাতে। আমাদের মধ্যে নিমকহারামী নেই হুজুর!—বুকুত জমাদার সগর্বে তার জবানবন্দীর উপসংহার টেনেছিল।

কিন্তু পথিকদের বেলায় তার উল্টোটাই ছিল ধর্ম। সেখানে বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল চিরকালের নিয়ম। বুকুত জমাদারের কাহিনীটি ১৮৩৩ সনের। রুস্তম খাঁ দক্ষিণের সেই পনের বছর বয়সের মোড়ল-তনয়ের কাহিনীটি শুনিয়েছিল ১৮৩৪ সনের জানুয়ারীতে। সেবছর ডিসেম্বরে আর-এক জমাদার জুলফিকার তার স্মৃতি মন্থন করে যে কাহিনীটি শুনিয়েছিল সেটি ঘটেছিল একুশ বছর আগে।

সেও এক বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। জুলফিকার জমাদারের নিজের জবানীতে তার বিবরণঃ

সেবার মহরমের পরে আমরা তিনশ' জন একসঙ্গে মিলিত হলাম। স্থির হল এবার পথে নামতে হবে। কারা কোন্ দিকে যাবে তা ঠিক হতে না হতেই—হাতের সামনে এসে হাজির হল সাতাশ জন মানুষের একটা দল। শোনা গেল আমরা যেখানটায় আছি—তার পাশেই বাজারে আস্তানা নিয়েছেন তাঁরা। সঙ্গে তাঁদের চারটি সওদা-বোঝাই ঘোড়া।

পরদিন সকালে ওঁরা লাকাদাউনের দিকে যাত্রা করেছেন। পেছনে পেছনে আমরাও সেই পথে পা বাড়ালাম। কয় ক্রোশ পরেই দু'দলের দেখা হয়ে গেল। প্রথমে ওঁরা আমাদের এড়িয়ে যেতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রবীণ যারা ছিল তারা কথায় কথায় পথের বিপদের কথা মনে করিয়ে দিল। এত দূরের পথ, বনপথে টাকা-পয়সা নিয়ে এভাবে একা একা চলা কি ঠিক হবে?

ওঁরা মাথা নাড়ালেন। হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। নিজেরা নিজেরা পরামর্শ করে তাঁরা স্থির করলেন, একসঙ্গে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা জানতাম ওঁদের শেষ পর্যন্ত মত হবেই। পাছে বিগড়ে গিয়ে অন্য পথে পা দেন সেই ভয়ে ইতিমধ্যে নিজেরাও দু'দলে ভাগ হয়ে গেছি। একদল ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, আর একদল অন্য পথে এগিয়ে গেছে। আমরা বিফল হলে, এক দিন কি দু'দিন পরে তারা দায়িত্ব নেবে!

ঠগীদের একটি দল।

। সমসাময়িক আলোকচিত্র হইতে

একজন হাত ধরবে. একজন পা. 'ভুকোত'-এর কাজ শুধু রুমাল পরান।

(সমসাময়িক মাটির তৈরী মডেল

তার দরকার হল না। ওঁরা রাজী হয়ে গেলেন। আমরা একশ' পঁচিশ জন আর ওরা সাতাশ জন। এবার একসঙ্গে যাত্রা সুরু হল। ঘনিষ্ঠতা হতে আরও একটি দিন কেটে গেল। পরদিন 'ঝিরণী' উঠল।

১৮৩৩ সনের এপ্রিলে সেখ এনায়েত যা শুনিয়েছিল সে আরও লোমহর্ষক, আরও নিষ্ঠুর :

পনের বছর আগের কথা। তুমি তখন কোথায় ছিলে সঠিক জানি না সাহেব, হয়ত নিজের দেশে। গর্বিত নায়ক এনায়েত পুরানো দিনের কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। তারপর মাথা চুলকে বলেছিল, হ্যাঁ, নাম ছিল তার বটে জেনকিন সাহেব। তিনি তখন নাগপুরে রেসিডেণ্ট।—নয় কি হুজুর ?

খবর পেলাম সাহেব সদলবলে নাগপুর থেকে বান্দার দিকে চলেছেন। আমরা তখন জব্বলপুরে। একশ' পঁচিশ জন বেকার বসে আছি। খবর পেয়ে ভাবলাম মন্দ কি, বাঘের লেজেই একবার হাত দিয়ে দেখা যাক-না মায়ের কি মর্জি! জব্বলপুর ছেড়ে আমরা সেওড়ায় এসে খাপ পেতে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।

জেনকিন সাহেব আমাদের সামনা দিয়ে চলে গেলেন। পেছনে পেছনে তাঁর লোকজন। সে হুজুর, মস্ত দল। দেখে মালুম হল এ দল আমাদের কর্ম নয়। কিন্তু একেবারে বিনা চেষ্টায় ছেড়ে দিতেও মন রাজী হল না। আমি মাথা খাটাতে লাগলাম। বুদ্ধির অসাধ্য কিছু নেই, একটা উপায় বের হল।

সাহেবের দল চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। চলতে চলতে ছু'চার জনের সঙ্গে আলাপ হল। সাহেবের সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু সবাই তো আর সাহেব নয়, ক্রমে কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়ে গেল। তাদের আমরা বোঝালাম—একেবারে সাহেবের সঙ্গে সমান কদমে চলতে হবে তার কি কথা? তোমরা ভাই একটু ধীরে

চল-না, তাতে তোমাদেরই সুবিধে। দেখছ না, এত বড় দল, যেখানেই যাচ্ছে জিনিষপত্তরের দরে যেন আগুন লাগছে, কুয়োর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু পেছনে গেলে তোমাদেরই সুবিধে, কিংবা আগে আগে অন্য পথে।

প্রথমদিন কথাটা ওরা কানে তোলেনি। দ্বিতীয় রাত্রে একটু ভাবান্তর দেখা গেল। সুযোগ বুঝে অসুবিধেগুলো আরও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল।—এক জায়গায় এত মানুষ, বাপ্‌রে, না যায় একটু শান্তিতে ঘুমনো, না চলে একটু দিলখোলা কথাবার্তা। সঙ্গে অনেকের জেনানা ছিল। তাদের মুখ দেখে বোঝা গেল, কথাটা তারা মেনে নিয়েছে।

পরদিন জেনকিন সাহেবের দল থেকে সত্যিই একটি টুকরো ছিটকে পড়ল। সাহেবের তখনও লটবহর গোছান হচ্ছে, আমরা পছন্দের জনাকয়কে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। শিকারপুরে এসে একটা ঝোপের কাছে ছাউনি পড়ল আমাদের। সাময়িক ছাউনি। দু'দণ্ড বসে বিশ্রাম করে নেওয়া যাক। কানে কানে মন্ত্র নিয়ে দু'জন এগিয়ে গেল আরও সামনে। সুবিধেমত জায়গা কোথায় আছে তার খবর করতে।

জায়গা স্থির হল। সেখানে এসে রাত্রির মত নতুন করে ছাউনি পড়ল। দলের মেয়েরা রান্না করল। আমরা সকলে মিলে খেলাম। খাওয়া শেষে গল্পগুজব, ঠাট্টা তামাসা। রাত তখনও অনেক বাকী। সাহেব আমাদের থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ পেছনে। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছে। কেউ ঘুমিয়ে নেই। হট্টগোল থেকে দূরে এসে সবাই আনন্দিত। আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। মেয়েরা গালে হাত দিয়ে গল্প শুনছে, পুরুষেরা ফুরুক ফুরুক হুঁকো টানছে। এমন সময় আমি 'ঝিরণী' দিলাম।—সাহেব খান, পান লেও!

চোখের নিমেষে পঁচিশটা মানুষের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পাঁচজন তাদের জেনানা। দলে দুটি বাচ্চা ছিল। জহির একটিকে কোলে টেনে নিল, অন্যটিকে নিল কেইরী। কিন্তু জহিরের কোলের বাচ্চাটার কান্না আর কিছুতেই থামে না। মায়ের জন্যে ছোকরা যেন পাগলা হয়ে উঠেছে। জহির দু' এক দফা ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল, কিন্তু সে ছেলে কিছুতেই বাগ মানবে না। সামনে ছিল একটা পাথর। রেগে গিয়ে জহির তার ওপরে দেয় এক আছাড়! অবুঝ শিশু চিরকালের মত শান্ত হয়ে গেল।···আমরা সেই রাতেই আবার নিজেদের পথে পা বাড়ালাম।

নবাব 'সবজী' খানের উধাও কাহিনীটিও একই হৃদয়হীনতায় বর্ণাঢ্য। তারও নেপথ্যে নায়ক ছিল এই এনায়েত। দু'বছর পরে, ১৮৩৫ সনে একই ভাবলেশহীন কণ্ঠে সে বলে গিয়েছিল সেই 'ঝিরণী'র কাহিনীটি।

সবজী খান হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের একজন পদস্থ কর্মচারী। লোকে তাঁকে সবজী খান বলতেন, কারণ বিলাসী নবাবের একমাত্র নেশা ছিল বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি একটি ভেষজ—পানীয়।

সেবার ষোল বছরের পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজাম দরবার থেকে ভূপালে চলেছেন। দলে তাঁর দু'জন সহিস, দু'জন সেপাই, ছেলে আর একটি ক্রীতদাসী তরুণী। পথে বাবার সঙ্গে কি নিয়ে যেন পুত্রের কথা কাটাকাটি হল। বাপ-বেটা দু'জন দুই পথ ধরলেন। নবাবজাদা এক পথে, অন্য পথে নবাব।

রাস্তায় এনায়েত সেলাম করে নবাবের সামনে এসে দাঁড়াল—হুজুর, আমরা ঘোড়ার কারবারী। ঘোড়া নিয়ে দক্ষিণে গিয়েছিলাম। ভূপাল হয়ে দেশে ফেরার মতলব।—আপনিও কি সে দিকেই যাচ্ছেন?

নবাব মাথা নাড়লেন। এনায়েত বলল, যদি আপত্তি না করেন

তবে আমরা আপনার সঙ্গে যেতে চাই। আপনি মান্য লোক, আপনি সঙ্গে থাকলে আমরা ভিন্‌দেশীরা অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

নবাব আপত্তি করলেন না। ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে মনটা বিষিয়ে ছিল। ভাবলেন, মন্দ কি? নতুন লোক সঙ্গে থাকলে কথাবার্তায় মেজাজটা একটু হাল্কা থাকবে।

ওরা এক সঙ্গে চলতে লাগল। পথে দিলখোলা নবাব তাঁর মনের কপাট খুলে দিলেন। তিনি কি করেন, কেমন রোজগার, কি অভ্যেস কিছুই গোপন করলেন না। এমনকি তাঁর সবজী খাঁ নামের কারণটি পর্যন্ত।

তিন দিন এনায়েত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, কিন্তু কিছুতেই আর সুবিধে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিবারই নবাব এমন কোন জায়গায় এসে ছাউনি ফেলেন যেখানে এনায়েত অসহায়।

কিন্তু আর নয়। চতুর্থ দিনে একটা বনের পাশ দিয়ে চলছিলেন ওঁরা। এনায়েত বলল, খান সাহেব, জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডামত। অনেকক্ষণ সবজী খাননি আপনি, একটু বিশ্রাম করবেন কি? আমরাও একটু প্রসাদ পেতে পারি!

সবজীর কথা শুনেই নবাবের গলা শুকিয়ে এল। তিনি বললেন, তা মন্দ বলনি। একটু জিরিয়েই নেওয়া যাক।

কার্পেট পাতা হল। ক্রীতদাসী মেয়েটি সবজী তৈরীর সরঞ্জাম নিয়ে এল। নবাব গা এলিয়ে বিশ্রামে বসলেন। ওদের মধ্যে তিনজন নবাবের ডাইনে বাঁয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। তারাও আজ প্রসাদ নেবে।

সব তৈরী। হঠাৎ বাদশাহী গলায় এনায়েত বলে উঠল, সাহেব খান, তামাকু লেও! সঙ্গে সঙ্গে নবাব উধাও। বাঁদী, সহিস, সেপাই—কারও কোন চিহ্ন নেই।

অনেক দিন পরে কাছাকাছি একটা বাজারে শুধু ঢাল পাওয়া

গিয়েছিল একটা। কারুকার্যখচিত সুন্দর একটা ঢাল। যে লোকটি বেচতে এনেছিল, সে দাম চেয়েছিল আট টাকা। শুনে দোকানী সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল লোকটির মুখের দিকে। পাশে একজন বলে উঠেছিল, বাঃ চমৎকার জিনিষ, অনেকটা সবজী খানের যেটা ছিল তার মত। ওঁদের কথার ফাঁকে লোকটি কখন মিলিয়ে গেছে সেদিকে কারও নজর ছিল না। অবশেষে ঢালটা যখন সত্যিই চেনা গেল, এনায়েত তখন নিজেও সবজী খানের মত আর-এক রহস্য—সে উধাও।

৩

সবজি খানকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কাউকেই পাওয়া যেত না। বছরে গড়ে চল্লিশ হাজার নিরুদ্দিষ্টের হিসেবটা মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। পরবর্তীকালে এনায়েতরা নিজেরাই বলেছে তাদের কারও তহবিলে আছে ন'শ একত্রিশটি প্রাণ, কারও ছ'শ চারটি, কারও পাঁচশ' আটটি, কারও চারশ' একুশটি। সবচেয়ে মন্দভাগ্য যে তারও স্মৃতির তালিকায় ছিল চব্বিশটি হারিয়ে যাওয়া মানুষের ঠিকানা। তাঁদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। খুঁজে পাওয়া যেত না।

খুঁজে পাওয়া যেত না এনায়েতকেও। রোসন জমাদার, রুস্তম খাঁ, এনায়েত, দুর্গা—সংখ্যায় ওরাও সেদিন অসংখ্য। কিন্তু তবুও কারও চোখে ধরা পড়ত না ওরা। কখনও না। কেননা, সেটা সহজ ছিল না। সাদা চোখে মানুষ স্বপ্নেও সে দৃশ্য ভাবতে পারে না।

সে রাত্রে হঠাৎ দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এমেলির। বীভৎস স্বপ্ন। চমকে উঠে তিনি ক্যাম্প-খাটটার ওপর বসে পড়েছিলেন। তারপর দু'হাতে চোখ রগড়ে তাকিয়েছিলেন তাঁবুর ফুল-কাটা দরজাটির দিকে, আধখোলা জানালার এক পাশে গুটান ঝালরওয়ালা মখমলের পর্দাটার দিকে।

কেউ কোথাও নেই। শিয়রে টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে। দরজার পাশে হিন্দুস্তানী আয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। বাইরে

লোকজনের আনাগোনা, কথাবার্তা; সিপাইরা রাত জেগে টহল দিচ্ছে। মিছিমিছি উইলিয়ামকে ডেকে পাঠাবার দরকার নেই। বেচারা হয়ত সবে একটু চোখ বুঁজেছেন। চাদরটা ভাল করে গায়ের ওপর টেনে দিয়ে এমেলি আবার বালিশে মাথাটা এলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তখনও জানেন না উইলিয়াম পরদিন ভোরেই তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছেন।

স্লীম্যান নিজেও তা ভাবতে পারেননি। সিলোদার সেই ভোরটি তাঁর জীবনেও এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। ১৮৩০ সনের কথা। জেলাধীপ তাঁর নিজের জেলা পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। সঙ্গে নববধূ এমেলি। সগর থেকে তিরিশ মাইল দূরে এক গাঁয়ে এসে সেদিনকার মত দিনের যাত্রা ভাঙতে হল। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। রাত্রে এতগুলো মানুষের ক্যাম্প গড়ে তুলতে অসুবিধে হবে। তাছাড়া এই এলাকা তাঁর সুপরিচিত। জায়গাটাও বেশ। রাস্তার এপারে বিরাট আম-বাগান, ওপারে গাঁ। গাঁয়ের নাম সিলোদা। এক নজর তাকালেই বোঝা যায় বর্ধিষ্ণু গ্রাম। শুধু রাত্তিরটা কেন, ইচ্ছে করলে আরও এক-আধটা দিন এখানে অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়। স্লীম্যান আদেশ দিলেন, এখানেই তাঁবু খাটাও।

দেখতে দেখতে আমবাগান আর-একটি গাঁ হয়ে উঠল। একপাশে এমেলির তাঁবু, আর এক পাশে সাহেবের নিজের। দুই তাঁবু ঘিরে আমলা-আমিন, সেপাই-খিদ্‌মদগারের সারি সারি আস্তানা। আপিস, হেঁসেল, আস্তাবল। দেখে দেখে এমেলি ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি জানেন, উইলিয়ামের ব্যবস্থা নিরন্ধ্র। তাঁর ক্যাম্পে দুঃস্বপ্নের কোন অবকাশ নেই। ক্লান্ত এমেলি পরক্ষণেই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

খবরটা দিয়েছিল ফিরিঙ্গীয়া। সবে ভোর হয়েছে। এমেলি তখনও বিছানায়। স্লীম্যান হাতমুখ ধুয়ে অভ্যাসমত কাগজপত্র নিয়ে

বসেছেন। এমন সময় হঠাৎ সেলাম করে সামনে এসে দাঁড়াল ফিরিঙ্গীয়া। সে আর-এক এনায়েত। নিপুণতম, দুর্ধর্ষতম এনায়েত। ফাঁসীর কাঠগড়া থেকে সাহেব নিজে কেড়ে রেখেছেন তাকে। এমন মানুষকে তিনি হারাতে রাজী নন—তার কাজ আছে। ফিরিঙ্গীয়া সেই থেকে স্লীম্যানের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

অসময়ে তাকে নিজের ক্যাম্পে আশা করেননি স্লীম্যান। তিনি একটু বিরক্ত হয়েই যেন অল্প কথায় এড়াতে চাইলেন তাকে, কি চাই?

—আজ্ঞে, আরও দু'পা কাছে এগিয়ে এল ফিরিঙ্গীয়া,—যদি অনুমতি করেন, তবে একটা কথা বলতে চাই হুজুর।

—বেশ!

—জায়গাটা এবার হুজুর আপনি খুব ভাল পছন্দ করেছেন। ফিরিঙ্গীয়ার গলায় রীতিমত তৃপ্তির আভাস। স্লীম্যান কিসের যেন গন্ধ পেলেন। তিনি ভ্রু কুঁচকালেন। হাতের কলমটি ধীরে ধীরে কলমদানীতে রেখে তিনি ঘুরে বসলেন। তারপর সোজা তাকালেন ওর চোখের দিকে—কি বলতে চাও তুমি?

—হুজুর, আপনি যে পণ্ডিত আর তাঁর ছ'জন লোকের কথা বলেছিলেন তারা এখানেই আছে হুজুর। তাছাড়া—ফিরিঙ্গীয়া বলে চলল—সেই হাবিলদার আর তাঁর চারজন সেপাই, গঙ্গাজল নিয়ে আসছিলেন চার বামুনঠাকুর, ওঁরা সবাই এখানেই আছেন; ওদের সঙ্গের জেনানাটিও!

—বলছ কি তুমি? চেঁচিয়ে উঠেছিলেন স্লীম্যান। তাঁর যতদূর মনে পড়ছে, পণ্ডিত আর তাঁর ছ'জন সহচরের দলটি হারিয়ে গিয়েছিল ১৮১৮ সনে। মানে, দশবছর আগে। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণে গঙ্গাজল বয়ে আনতে আনতে একটি নারী সহ নর্মদা উপত্যকার যে চারজন ব্রাহ্মণ উধাও হয়ে গিয়েছিলেন, তাও তখনকারই ঘটনা।

হাবিলদার এবং সিপাইদের ঘটনাটি তার বছর ছয় পরের, ১৮২৪ সনের!—হতেই পারে না, স্লীম্যান ধমকে উঠলেন—তুমি কি বলতে চাও এক যুগ আগে হারিয়ে যাওয়া পণ্ডিত আমার তাঁবুতেই আছে?

—হ্যাঁ, তাই আছে। অবিচল ফিরিঙ্গীয়া জবাব দিল, তবে হুজুর ঠিক তাঁবুতে নয়, তাঁবুর তলায়, মাটির নীচে।

—আমার তাঁবুর মাটির তলায় মানুষ আছে?

কার্পেটে জুতোর গোড়ালিটা ঠুকতে ঠুকতে আবার প্রশ্ন করেছিলেন স্লীম্যান—এই মাটির তলায়?

—হ্যাঁ হুজুর।

কৌতূহলী স্লীম্যান আর বসে থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সবে ভোর হয়েছে। আমবাগানের ডালে ডালে পাখীর কলরব। ভোরের হাওয়ায় বিন্ধ্যপর্বতের খবর। নীচে সবুজ ঘাসের মখমল। তাতে ছবির মত তাঁবুর শহর। আস্তাবলের সামনে সহিস ঘোড়ার দলাইমলাইয়ে ব্যস্ত। চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে স্লীম্যান বলে উঠলেন, তুমি কি বলতে চাও আমার ঘোড়াটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পায়ের নীচে হাবিলদার আর তার চার সঙ্গীর কবর? যেখানে এমেলি এখনও ঘুমোচ্ছে সেখানেই তাঁর খাটের তলায় পড়ে আছে গঙ্গাজলের ভাণ্ড নিয়ে চার ব্রাহ্মণ, এক ব্রাহ্মণী!

ফিরিঙ্গীয়া তখনও পাশেই দাঁড়িয়ে। সাহেবের সামনে থেকে সে এক মুঠো মাটি কুড়িয়ে নিয়ে কি যেন ভালভাবে পরখ করে' দেখল। তারপর সগর্বে উত্তর দিল, হ্যাঁ হুজুর। আপনি মাটি খুঁড়তে হুকুম দিন। যদি ওদের না পাওয়া যায় তবে মিছেই আমি আছি, আমাকে আপনি ফাঁসীকাঠেই ঝুলিয়ে দেবেন, আমি খুশী মনে রাজী।

তক্ষুনি সিপাইদের তলব করা হল। তারা গাঁ থেকে কোদাল আর

মানুষ নিয়ে এল। ফিরিঙ্গীয়ার নির্দেশ অনুযায়ী সবুজ ঘাসে কোদাল পড়ল। পাশে দাঁড়িয়ে গোটা ক্যাম্প।

ওরা পাঁচ ফুট খুঁড়ল। কিন্তু হাবিলদার বা তাঁর সেপাই চারজন—কারও কোন চিহ্ন নেই। স্লীম্যান ফিরিঙ্গীয়ার মুখের দিকে তাকালেন। নিষ্কম্প ফিরিঙ্গীয়া উত্তর দিল, হুজুর, জান কবুল, মেহনত করে আরও একটু খুঁড়তে হবে! স্লীম্যান কোদাল চালিয়ে যেতে ইঙ্গিত দিলেন।

অবশেষে সত্যিই মানুষের নিশানা পাওয়া গেল! প্রথমে ক'ফালি ছেঁড়া ন্যাকড়া, তারপর ক'টি উর্দির বোতাম। এবং তারপর একসঙ্গে পাশাপাশি পাঁচজন মানুষ। ফিরিঙ্গীয়া বলল, ওপাশেরটি জমাদার, এ পাশের চারজন সিপাই! বিস্ময়বিমূঢ় স্লীম্যান নাকে রুমাল গুঁজলেন—বহুৎ আচ্ছা, তুলে আন ওদের!

এমেলি ততক্ষণে নিশ্চয় উঠে পড়েছেন। স্লীম্যান একজন খিদ্‌মদগারকে পাঠালেন তাঁর তাঁবুতে। বললেন, মেমসাহ্বে কি করছেন একটু খবর নিয়ে এস।

সে ফিরে এসে জানাল, তিনি ছোটা হাজিরায় তাঁবুতে চলে গিয়েছেন। মানে ব্রেকফাস্টের টেবিলে। ব্রেকফাস্টের তাঁবুটি সেখান থেকে বেশ দূরে। স্লীম্যান নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, তবে এবার চল মেমসাহেবের তাঁবুতে।

ততোধিক নিশ্চিন্ত ফিরিঙ্গীয়া উত্তর দিল, সে আপনার মর্জি হুজুর।

ফিরিঙ্গীয়ার নির্দেশ মত এমেলির তাঁবুর দড়ি-দাড়া সব খোলা হল। মেঝের কার্পেট গুটান হল। তারপর তার আঙ্গুলে-টানা নিশানা ধরে আবার কোদাল চলল। খুঁড়তে খুঁড়তে ছ'ফুট মাটির তলা থেকে এবার বের হলেন বার বছর আগে হারিয়ে যাওয়া পণ্ডিত এবং তাঁর ছ'জন অনুচর। তারপর তার ক'হাত দূর থেকে সেই

গঙ্গাজলবাহী ব্রাহ্মণ চারজন! তাদের ভীড়ে পড়ে আছে একটি নাতিদীর্ঘ দেহের অবশেষ। সেটি ব্রাহ্মণীর।

—হোরিবল্! বিজয়ী ফিরিঙ্গীয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় যেন জ্বলে উঠলেন স্লীম্যান। শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ফিরিঙ্গীয়া, আরও আছে, দেখবেন হুজুর?

—না! তক্ষুনি স্থানত্যাগ করেছিলেন স্লীম্যান। ততক্ষণে খবর পেয়ে পাশের কোরাই গাঁ থেকে সিপাই সামন্ত নিয়ে হাজির হয়েছেন স্থানীয় থানাদার। হাতের ফর্দটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে, অবশিষ্টের দায়িত্ব তাঁর হেফাজতে ছুঁড়ে দিয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলের দিকে পা বাড়ালেন স্লীম্যান। এ দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে দেখা যায় না।—হোরিবল্!

—হোরিবল্! এমেলি যেন ওর মুখের অস্ফুট শব্দটাই স্পষ্ট করলেন। এসবের কিছুই তাঁর তখনও জানার কথা নয়। অপ্রস্তুত উইলিয়াম শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ভোর হতে না হতেই কোন্ আহাম্মক এসব কথা বলে গেল ওঁকে। তিনি নিঃশব্দে চামচটা হাতে তুলে নিলেন।

খেতে খেতেই এমেলি বীভৎস সেই স্বপ্নের কথা তুললেন, সে তুমি ভাবতে পারবে না, কি দৃশ্য!—হোরিবল্, বীভৎস।

—দেখবে তা? মনে মনে হেসে স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর তাঁবুর দিকে পা বাড়ালেন স্লীম্যান। বিস্মিত এমেলি বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে দেখলেন—কাল রাত্রে যেখানে তাঁর তাঁবু ছিল সে জায়গাটা কোন্ যাদুবলে যেন এখন শূন্য। কাছে এসে দেখা গেল—শূন্য নয়, সেখানে হা করে আছে মস্ত এক কবর। পাশে কাপড়ে ঢাকা সাতটি শব। কাল রাত্তিরে যারা তোমায় ভয় দেখিয়েছিল তারা এরা,—স্লীম্যানের ইঙ্গিতে সিপাইরা কঙ্কালগুলোর মুখের ওপর কাপড়টা ভাল করে টেনে দিয়েছিল।—এদের থেকে কোন ভয় নেই ডিয়ার, ওরা বারো বছর আগে মৃত!

—ইনক্রেডিবল্ ! চোখে রুমাল দিয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন এমেলি।—আমি যে স্বপ্নে ওদেরই দেখেছি !

—হ্যাঁ তাই। মুচকি হেসে স্ত্রীর হাত ধরে তাঁর নিজের তাঁবুতে ফিরে গিয়েছিলেন শ্লীম্যান। যেতে যেতে বলেছিলেন, আমি কিন্তু স্বপ্নেও কখনও এ দৃশ্য কল্পনা করতে পারিনি !

কেউ পারে না। নিখুঁত কবর। নিপুণ হাতে নিরন্ধ্র বন্দোবস্ত। শ্লীম্যান লিখছেন ঃ

১৮২২, '২৩, '২৪—এই তিন বছর আমি নরসিংপুর জেলায় ছিলাম। সে সময় এমন কোন চুরি, ডাকাতি, খুন বা রাহাজানি হয়নি যার খবর আমি না জানতাম। প্রতিটি অপরাধের খুঁটিনাটি খবর আমার কাছে পৌঁছাত। প্রত্যেকটি ঘটনা আমি নিজে মন দিয়ে পরখ করে দেখতাম। কিন্তু তবুও কোনদিন একবারের জন্যেও এ দৃশ্য কল্পনা করতে পারিনি। সেদিন যদি কেউ আমাকে বলত, আমার কাছারি থেকে মাত্র চারশ' গজ দূরে কুন্দেলি গাঁয়ে এমন মানুষ আছে যাদের হাতের ছোঁয়ায় প্রতি বছর শত শত পথিক অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে নিশ্চয় তাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিতাম আমি। কিংবা কেউ যদি আমাকে বলত, আমার আপিস থেকে মাত্র একদিনের পথ হাঁটলেই এমন একটি গাঁয়ে পৌঁছান যায় যেখানে মাটির তলায় হাজার হাজার হারিয়ে যাওয়া মানুষের বাস, তাহলেও নিশ্চয় তাকে নির্বোধ বলে বিদায় করে দিতাম আমি ! কিন্তু আশ্চর্য এই, আজ জানি এই দু'টি খবরই সত্য !

এ সত্য জানার আগে অনেককাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল শ্লীম্যানকে। ফিরিঙ্গীয়া সঙ্গে না থাকলে সিলোদা হয়ত চিরকাল তাঁর কাছে একটি সাধারণ গাঁ হয়েই বেঁচে থাকত। ডাইরীর পাতায় পথের ধারের আম্রকুঞ্জটি শুধু শান্ত-ছায়া আর ফুরফুরে হাওয়ার স্মৃতি

হয়েই নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। ছ'ফুট মাটির তলা থেকে কোনদিন আর আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যে দিনের আলোয় ফিরে আসত না হাবিলদার, পণ্ডিত কিংবা ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ চারজনের কঙ্কাল। সবুজ ঘাসের নিশ্চিন্ত আচ্ছাদনের তলায় চিরকালের জন্যেই লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যেতেন তাঁরা।

সবাই তাই থাকতেন। কখনো-সখনো শেয়াল কিংবা বেপরোয়া বাদলের ধারা প্রাণপণ চেষ্টায় রহস্য কিয়ৎ পরিমাণে লঘু করে আনত। কিন্তু দর্শকেরা তখনও অসহায়। তাড়াহুড়োয় এনায়েতরা যখন কম মনোযোগী তখনও তাদের চেনা দায়।

১৮২৯ সনের কথা। ক্যাপ্টেন বর্থউইক তখন মালবে পলিটিক্যাল এজেণ্ট। সহসা জরুরী খবর—রাতলাম স্টেটে একবার আসা আবশ্যক। ভীলেরা ক্ষেপে গেছে। সম্প্রতি তারা গোপনে পাঁচটি মানুষকে খুন করে রেখে গেছে। ঘটনা নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আগে সাহেবের একবার এখানে আসা দরকার।

তক্ষুনি ঘোড়ার পিঠে চাপলেন তরুণ বর্থউইক। সঙ্গে নিলেন স্লীম্যানের দেওয়া একটি তিলহাই—গুপ্তচর। রাতলামে পৌঁছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন তিনি। দেহগুলো যেখানে পাওয়া গেছে তার পাশেই বড় রাস্তা। রাস্তা থেকে অদূরে একটি আমবাগান। বর্থউইক স্লীম্যানের অন্যতম সহকর্মী, অনুচর। নাকে তিনি কবরের গন্ধ পেলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, স্থানীয় লোকেরা তবু বলেই চলেছে—এ নিশ্চয় ভীলদের কাণ্ড। আবার ক্ষেপে উঠেছে বন্যরা। সাহেবের উচিত এর যাহোক একটা কিছু বিহিত করা।

কারও কথায় কান না দিয়ে বর্থউইক জানতে চাইলেন, এ পথে কি দু'চার দিনের মধ্যে কোন তীর্থযাত্রীর দল হেঁটে গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, উত্তর দিলেন একজন, তবে দু'চার দিনের মধ্যে নয়, তীর্থ থেকে গুজরাতের দিকে দলটি গেছে তা আজ প্রায় এক হপ্তা হবে।

বর্থউইক মনে মনে হিসাব করলেন, খুব ধীরে সুস্থেও যদি ওরা হেঁটে থাকে তাহলেও সাতদিনে কমপক্ষে অন্তত একশ' মাইল এগিয়ে গেছে। স্থানীয় পুলিশ অফিসারদের দিকে ঘুরে তিনি হুকুম দিলেন, ভীলদের কথা ছেড়ে আপনারা এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ুন। তেমন কোন দল সামনে পেলে তাদের আটক করে ধরে নিয়ে আস্থন।

থানাদার মাথা চুলকাতে লাগলেন, হুজুর, আমরা সামান্য পুলিশ। তাছাড়া এখানে কোন ঘোড়সওয়ার সিপাইও নেই, এমতাবস্থায়—

বর্থউইক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন। তারপর খসখস করে তাতে হু'টি ছত্র লিখে দিয়ে বললেন, এই সরকারী নির্দেশ। এতে বলে দেওয়া হল, পথে যে কোন গ্রামে যে কোন তহশিলে আপনি সাহায্যপ্রার্থী হবেন, সেখানেই আপনাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হবে। নিন, আর দেরী করা ঠিক নয়।

পথে পথে খবর নিতে নিতে এগিয়ে চলেছেন ইনস্পেক্টার। কোথাও কোন পথিকের দেখা নেই। ছ'দিন চলার পর একটি গাঁয়ে এসে খবর পেলেন—তাঁর আগেই একটি মস্ত দল এই পথ দিয়ে হেঁটে চলে গেল। গ্রামটির নাম—দেখোলা। থানাদার হিসেব করে দেখলেন—তিনি বর্থউইক থেকে প্রায় দেড়শ' মাইল দূরে চলে এসেছেন। এখন আর ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার অর্থ হয় না। গ্রামের মোড়লের কাছে তিনি সাহায্যপ্রার্থী হলেন। বললেন, কোম্পানির আদেশ, আমাকে লোক দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

দেখোলা নামমাত্র গাঁ। মাত্র কয়েকঘর মানুষের বসত সেখানে। অসহায় মোড়ল হু'তিনজন তরুণের বেশী জোগাড় করতে পারলেন না। ইনস্পেক্টার তাদের নিয়েই পা বাড়ালেন সামনে। মনে মনে তিনি ঠিক করে ফেলেছেন—খুনখারাপির কথা তোলা উচিত হবে না। তিনি জানেন, এই জেলায় আফিংয়ের কারবারে একচেটিয়া অধিকার

সরকারের। তিনি তারই চোরা কারবারের অভিযোগ তুলে ওদের গ্রেফতার করবেন।

দলটা সামনে পড়া মাত্র ইনস্পেক্টার ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তারপর দলপতি বলে মনে হল যাকে, সেই মানুষটির দিকে হাত তুলে বললেন, সালাম।

—সালাম! উত্তর দিল উমরাও।

ইনস্পেক্টার এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমি আফিংয়ের দারোগা। তোমাদের কাছে চোরাই আফিং আছে। বুলওয়ারা থেকে ফৌজ কর্তৃপক্ষ তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, তোমাদের সেখানে ফিরে যেতে হবে!

ওরা এক সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল।—আমরা তীর্থযাত্রী হুজুর; আমাদের সঙ্গে আফিংয়ের কোন সম্পর্ক নাই। তাছাড়া, আমরা তো আপনার সামনেই। তালাস করে দেখুন। এই আমাদের তল্পিতল্পা, হাঁড়ি-কুঁড়ি; যদি কিছু পান তাহলে না হয় ধরে নিয়ে যাবেন, নয়ত মিছিমিছি কেন এই গরীবদের কষ্ট দেবেন!

ইনস্পেক্টার লোকগুলোর মুখের দিকে তাকালেন। গরীব সন্দেহ নেই। শতচ্ছিন্ন পোষাক, পায়ে কারও জুতো নেই। দেহে বিলাসের কোন ছাপ নেই। চোখে খুনীর বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। তবুও বর্থউইকের নির্দেশ। তিনি নিস্পৃহ গলায় বলে চললেন, দেখ, এটা কোম্পানির রাজত্ব। তোমরা যদি আমার কথায় রাজী না হও তবে কোম্পানির ঘোড়সওয়াররা এসে ধরে নিয়ে যাবে তোমাদের। তখন কি ভাল হবে? তার চেয়ে আমার কথা শোন। আফিং থাক আর নাই থাক, তোমরা তল্পিতল্পা নিয়ে আমার সঙ্গে চল। যদি কিছু না পাওয়া যায় তবে কোম্পানি মিছিমিছি কেন আটক করে রাখবে তোমাদের!

ওরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি যেন বলাবলি করল, তারপর একজন বলে উঠল, বেশ চলুন।

ইনস্পেক্টার ওদের নিয়ে পথে নামলেন। বুলওয়ারা সেখান থেকে দু'দিনের পথ। সঙ্গে মাত্র জনাকয় পুলিশ। অথচ ওদের বিরাট দল। থানাদার চিন্তিত। লোকগুলো যদি সত্যিই খুনী হয়!

সন্ধ্যা হল একটা গাঁয়ে এসে। থানাদার আস্তানা পাতলেন মোড়লের ঘরে। ওরা রাত কাটাল পুলিশের সঙ্গে বাইরে। কিন্তু আশ্চর্য, ভোরে দেখা গেল একটি মানুষও পালায়নি। সবাই তেমনি আছে। তেমনি হাসিখুশী, তেমনই নিশ্চিন্ত! দেখে ইনস্পেক্টারের মায়া হল। নেহাত বর্থউইকের আদেশ, নয়ত এদের এভাবে মিছিমিছি কষ্ট দিতেন না তিনি।

বুলওয়ারায় আগেই খবর পাঠান হয়েছিল। ওরা সেখানে পৌছানমাত্র বিরাট এক পুলিশবাহিনী এসে তাদের ঘিরে ফেলল। এবার শেষ পরীক্ষা। ঘোড়া থেকে নেমে ইনস্পেক্টার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ধীর গলায় বললেন, তোমরা আফিংয়ের চোরাকারবারী নও, তোমরা খুনী।

ওরা সকলে সমস্বরে আপত্তি জানাল।—সাহেব, তোমার ভুল হচ্ছে, আমরা তীর্থযাত্রী। তীর্থ করে গুজরাতে ফিরছি।

ইনস্পেক্টার আবার লোকগুলোর দিকে তাকালেন। ওদের চোখে মুখে কোন ভাবান্তর নেই। তিনদিন ধরে যেমন দেখছেন, তেমনি সরলপ্রাণ গ্রামবাসী। হঠাৎ তারা ঝঞ্ঝাটে পড়েছে, ফলে কারও কারও মুখে বিরক্তির ছাপ দেখা দিয়েছে, কিন্তু কোথাও আতঙ্ক বা উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। তবুও শেষ চেষ্টা করতে হবে। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ওসব বাজে কথা, আমি জানি দিন দশ আগে রাথলমে পাঁচজন মানুষকে খুন করে এসেছ তোমরা। তোমরা খুনী।

দলের একজন ধীর পায়ে এগিয়ে এল তাঁর দিকে।—সাহেব, মিছিমিছি কেন গরীবদের ওপর হামলা করছ? এই কাগজটা একবার

দেখ। লোকটি কোচর থেকে একফালি কাগজ বের করে ইনস্পেক্টারের মুখের সামনে তুলে ধরল।

বিস্মিত ইনস্পেক্টার দেখলেন, সেটি একটি অনুমতিপত্র। রাজ-সরকার থেকে ওদের তীর্থযাত্রী হিসেবে গোটা ভারত দেখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে কোম্পানির তরফ থেকে পথের আপদ-বিপদেও তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় লিখিত দলিল। নীচে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর স্বাক্ষর, শীলমোহর। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ইনস্পেক্টার ভাবনায় পড়লেন। সত্যি সত্যিই যদি ওরা খুনী না হয়! তাছাড়া এই কাগজটা দেখবার পরও ওদের আটকে রাখার কোন অধিকার আছে কিনা সেটাও বিবেচ্য। কিন্তু ছেড়ে দিলেই বা কি কৈফিয়ত দেবেন তিনি বর্থ উইককে। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ—দলটিকে যেখানেই পাবে ধরে নিয়ে আসবে। যাই হোক, সে আমার দায়িত্ব। ইনস্পেক্টার সে নির্দেশকে অমান্য করার সাহস পেলেন না। তিনি বললেন, এ কাগজটা মিথ্যে এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু বর্থ উইক সাহেবের নির্দেশ, তোমাদের জাওরা নিয়ে যেতে হবে। সাহেব সেখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন!

অগত্যা আর উপায় কি। ওরা জবাব দিল, বেশ তাই চল। তোমরা কোম্পানীর কর্মচারী, মহামান্য রাজবাহাদুর তোমরা, যেমন মর্জি করবে তাই হবে। আমরা যাচ্ছি সাহেব, কিন্তু কথা দাও, যদি আমাদের কাছে সেখানেও কিছু না পাও তবে এমনি আর একটা কাগজ লিখে দেবে। দিনকাল যা পড়েছে বোধহয় দুইদফা পারমিট থাকলেই শেষ অবধি ঠিকানায় পৌছান যাবে। বল সাহেব, দেবে?

—নিশ্চয়। বর্থ উইক যদি তোমাদের ছেড়ে দেন, তবে আর তোমাদের পারমিট দিতে ভয় কি? তাছাড়া তার দরকারও হবে না। বর্থ উইকের নামটি যদি মনে রাখতে পার তাহলেই যথেষ্ট। খুনের

দায়ে অন্তত তারপর আর কেউ কখনও তোমাদের আটকাবে না! নাও, আর দেরী নয়, চল।

জওরা থেকে আর ফেরা হয়নি ওদের। কেননা, বর্থউইক দ্বিতীয় স্লীম্যান। তিনি যখন জাল ফেলেন তখন সে নির্ভুল তাক, তাতে কখনও ভুল মানুষ ধরা পড়ে না। কিন্তু তা হলেও ওরা যে এত সহজে খুনী প্রমাণিত হয়ে গেল তার পেছনে শুধু বর্থউইক নন, আরও একজন ছিল। সে ওদেরই দলের একজন মানুষ। জওরার পথে সে রণভঙ্গ দিয়েছিল। ইনস্পেক্টারের কানে কানে বলেছিল, সাহেব, তোমার অনুমান ঠিক। আমরা সত্যিই খুনী।

যদি এই কথাটি জানা না থাকত তাহলে শুধু ক'টি কবরের জোরে সত্যি সত্যিই ওদের অপরাধ প্রমাণ করা যেত কিনা বর্থউইক নিজেও তা জানেন না। কেননা, মানুষগুলো দেখতে যেমন নির্দোষ, তেমনি তাদের সঙ্গের তল্পিতল্পাগুলোও। কোথাও কোন হাতিয়ার নেই। কোন চোরাই ধন নেই। দেহে যেমন তাদের তীর্থযাত্রীর বেশ, তেমনি তাদের পথচলার আয়োজনেও। নিজে স্বীকার না করলে এনায়েত এক অবিশ্বাস্য কাহিনী।

কখনও কখনও অবশ্য লুঠের মালও সঙ্গে থাকত। কিন্তু এনায়েতরা তখনও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কেননা, হিন্দুস্তান এক বিচিত্র দেশ। সেখানে পথে পথে যেমন অসংখ্য মানুষ হারিয়ে যায়, তেমনি অসহায় পথিকের বন্ধুও অনেক।

শুধু বন্ধু নয়, সেবার ওরা বান্ধবীও পেয়েছিল দু'জনা। গত শতকের দ্বিতীয় দশকের কাহিনী। নিজামবাহাদুরের এক পদস্থ কর্মচারী নাগপুর থেকে তাঁর দেশের বাড়ীতে চলেছেন। দূরের পথ। জব্বলপুর হয়ে যেতে হবে। সঙ্গে তাঁর এক পুত্র, দুই কন্যা এবং আরও দুটি তরুণ। মেয়ে দু'টি অবিবাহিতা তরুণী। কথা আছে, জব্বলপুরে গিয়ে তাদের

বিয়ে হবে। তরুণ হু'টি বর। বাবা তাদের পছন্দ করে নিজের ঘরে নিয়ে চলেছেন। সেখানেই ধুমধাম করে বিয়ে দেওয়া তাঁর মতলব। পথে ওদের দেখাশুনা করার জন্য সঙ্গে তিনি চারজন ভৃত্যও নিয়েছেন।

চলতে চলতে পথে একদল পথিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তারপর যথারীতি ক্রমে আলাপ এবং সৌহার্দ্য। ওঁরা একসঙ্গে চলতে লাগলেন।

ক'দিন পরে এক গ্রামে এসে আস্তানা গাড়লেন ওঁরা। দরবারী ভদ্রলোক আশ্রয় নিলেন মোড়লের বাড়ীতে, ওরা গাঁয়ের এক কোণে পথের ধারে নিজেদের তাঁবুতে। সে রাত্তিরে গাঁয়ের সেই কোণটিতে আগুন লাগল। একটি বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাত্রে ভাল ঘুম হল না। ভদ্রলোক ভোরেই গাঁ ছাড়তে মনস্থ করলেন।

কিন্তু পথে নেমে দেখা গেল তার সঙ্গীরা নেই। উদ্বিগ্ন ভদ্রলোক খবরাখবর করে জানলেন—চৌকিদার ওদের থানায় ধরে নিয়ে গেছে। রাত্রে ওরাই নাকি গাঁয়ে আগুন লাগিয়েছে। ভদ্রলোক বললেন, বেশ করেছে। চল তবে এবার এগোন যাক। কিন্তু মেয়ে হু'টি নড়বে না। ক'দিনে দলের কারও কারও সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে। কি চমৎকার গল্প বলত লোকগুলো! কি চমৎকার গান গাইত! তারা কিছুতেই ওদের এভাবে পুলিশের হাতে ফেলে দিয়ে যাবে না।

আহুরে মেয়ে। উপায়ান্তরহীন ভদ্রলোক অগত্যা চললেন থানার দিকে। থানাদার তাঁকে দেখে সালাম করে উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোক বললেন, কেন মিছিমিছি আটক করে রেখেছ ওদের। আজ ক'দিন একসঙ্গে চলছি, কিন্তু একবারও তো মনে হয়নি ওরা ডাকু! তাছাড়া, আমিও মানুষ নিয়েই নাড়াচাড়া করি!

—আপনি কি বলছেন ওরা নির্দোষ পথিক মাত্র?

—হ্যাঁ তাই।

মেয়ে হু'টিও মাথা নাড়ল।—কি বলব দারোগা সাহেব, যা চমৎকার গান গায়!

মেয়ে হু'টির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন থানাদার। তারপর পাশের চৌকিদারটির দিকে ফিরে হুকুম দিয়েছিলেন, ওদের ছেড়ে দাও!

তাই দেওয়া হল। তল্লাসী হল না, জিজ্ঞাসাবাদ হল না, মানুষগুলো ছাড়া পেয়ে গেল। অথচ থানায় সেদিনই খবর এসেছে, নাগপুর থেকে জব্বলপুরের পথে তিন জন পথিক হারিয়ে গেছে। তারা ব্যবসায়ী। সঙ্গে দামী রেশমী কাপড় ছিল। আগুনের কারণ হিসেবে নয়, থানাদার সে খবর পেয়েই আটক করেছিলেন ওদের। কিন্তু রাখা গেল না। মেয়ে হু'টির চোখের দিকে তাকিয়ে বিনা তল্লাসীতেই মানুষগুলোকে ছেড়ে দিতে হল।

দলছাড়া বন্ধুদের দলে ফিরে পেয়ে পুরানো রাজকর্মচারী সপরিবারে আবার জব্বলপুরের দিকে যাত্রা সুরু করলেন। তিনি এখন আনন্দিত পথিক। কেননা, মেয়ে হু'টির মুখে হাসি ফুটেছে। তাছাড়া, তাঁর নিজের খাতিরও বেড়েছে।

জব্বলপুরে এসে আবার নতুন ঝামেলা। দলপতি ভদ্রলোককে ধরে পড়লেন, আমাদের মনে হচ্ছে পুলিশ এখানেও গোলমাল বাঁধাবে। আপনাকে এবারও দয়া করে একটু সাহায্য করতে হবে!

কথা শুনে মেয়ে হু'টিও আলোচনায় যোগ দিল। আমরা থাকতে তোমাদের ভয় কি? কি নিয়ে গোলমালটা বাঁধাবে পুলিশ তাই শুনি! এবার তো আর কোথাও আগুন লাগেনি!

দলপতি হাওয়ায় বিপদের গন্ধ পেয়েছে। সে বলল, আগুনের কথা নয় দিদিমণি, আমাদের সঙ্গে অনেক জিনিষপত্র, হয়ত কাস্টমস চৌকির লোকেরা তাই দেখবার নাম করে আরও হু'দিন আটকে রাখবে।

—আমি থাকতে তাও কি কখনও হয়? উত্তর দিলেন নিজামের গর্বিত ওমরাহ।—তোমাদের মালগুলো আমাদের সঙ্গে দিয়ে দাও দেখি!

তাই হল। কাস্টমস চৌকির পুলিশও নাগপুর থেকে খবর পেয়ে গেছে। তারা সতর্ক হয়েই ছিল। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। দলটি এল। কিন্তু তাদের হাত-পা খালি; লুঠের মাল বলে সন্দেহ করা যেতে পারে, সঙ্গে তাদের তেমন কিছু জিনিষ নেই। ওরা নিরাপদে চৌকি পার হয়ে চলে গেল।

একটু পরেই চৌকিতে এলেন নিজাম বাহাদুরের পুরানো কর্মচারী। পরিচয় দিতে হল না। চেহারা, বেশবাস সব দেখে চৌকির দারোগা সেলাম ঠুকে তাঁর পথ ছেড়ে দিলেন। সঙ্গের লটবহর তল্লাসীরও প্রশ্ন ওঠে না। খানদানী মানুষ। দূর পথের যাত্রী, সঙ্গে জিনিষপত্র তো থাকবেই। তাছাড়া দারোগা দেখলেন, দু'টি তরুণী মেয়ে বড় বড় দু'টি পুটুলীর ওপর বসে আছে। ওদের উঠতে বলা বেইজ্জতি কথা হবে! বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি যাত্রীদের ছেড়ে দিলেন।

রেশমের গাঁট দু'টি সামনে ছুঁড়ে দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল দু'টি মেয়ে,—দেখলে তো, তোমাদের সাত রাজার ধন মাণিক কেমন নিয়ে এলাম! এবার বল আমরা কাজের কিনা!

ওরা বলল, সে কথা আর বলতে? ভাগ্যিস আপনারা ছিলেন! গাঁট দু'টি দু'জনের পিঠে তুলে দিতে দিতে দলপতি বলেছিল, বেঁচে থাকলে মা-জান, তোমরা রাজরাণী হবে, বাদশার পাট বিবি, চাই কি সুলতানা।

ওরা তা হতে পারেনি। তামাম হিন্দুস্তানের কোন হারেমে নিজামের অতি প্রিয় ওমরাহের ঘরের সেই মেয়ে দু'টিকে কোনদিন আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাদের স্নেহান্ধ বাবা, নিজাম দরবারের

গর্বিত সেই ওমরাহটি, তাঁর পুত্র, ভৃত্য চারজন, কাউকে না। এমন কি যে ছেলে ছু'টির সঙ্গে ফুটফুটে সেই মেয়ে ছু'টির ক'দিন বাদে সাদী হওয়ার কথা, তাদেরও না। ওঁরা সবাই চিরকালের মত হারিয়ে গিয়েছিলেন। দিনের পর দিন সেই অপরিচিত সহযাত্রীদের নিয়ে এক সঙ্গে কুড়ি দিন পথে ছিলেন ওঁরা। ছুশ' মাইল পথে প্রতিদিন তাঁরা একই জায়গায় থেকেছেন। নিজেদের খাবার থেকে সহযাত্রীদের খাইয়েছেন, ওদের বিপদে মানুষের ধর্ম মেনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু তবুও একুশ দিনের দিন আর খুঁজে পাওয়া যায়নি ওঁদের। কেননা, সরলপ্রাণ গ্রাম্য পথিক হিসেবে দরবারী বাবা যাদের নিজের তাঁবুর স্নেহচ্ছায়ায় ডেকে বসতে দিয়েছিলেন, তারা আসলে তা ছিল না। মেয়ে ছু'টি জানত না, ভালবাসার ভান করলেও ওরা হৃদয়হীন মানুষ ; ইতিহাসের হিংস্রতম, নিপুণতম খুনী—ওরা ঠগী।

৪

ওরা ঠগী। ওরা খুনী।

সেদিনের ভারতে খুনীর অভাব ছিল না। উনবিংশ শতকের সূচনাক্ষণে হিন্দুস্তান এক তমসাচ্ছন্ন দেশ। তার ঘরে ঘরে খুন, পথে পথে খুন। মুঘলদের গৌরব-সূর্য অস্তমিত। দিল্লির সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সাম্রাজ্য ঘিরে অন্ধকার নেমেছে। এখানে ওখানে বিন্দুর মত কুঠিগুলোতে ইংরেজের আলো জ্বলছে। কখন কাদের ফুৎকারে তা নিভে যাবে তারা নিজেরাও তা জানে না। গোটা দেশে অনিশ্চয়তা, অরাজকতা, হতাশা। পুরানো শাসনব্যবস্থা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। তার জায়গায় নতুন কোন ব্যবস্থা তখনও শেকড় বিস্তার করতে পারেনি। চারদিকে নৈরাজ্য। ছিন্ন খণ্ড দেশে অনেক রাজা। কিন্তু কারও পতাকায় স্থায়িত্বের কোন আশ্বাস নেই। প্রজা খাজনা দেয় না। জবরদস্তি করে যে যা আদায় করতে পারে তাই সর্বস্ব। লুঠ তাই তখন ধর্ম।

পরাজিত সৈন্যরা লুঠ করছে। রাজপুরুষেরা লুঠ করছে। এমনকি নবাগত ইংরেজ পর্যন্ত লুঠে নেমেছে। তারা রাজত্ব কেড়ে নিচ্ছে। স্থানীয় সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে তছনছ করে দিচ্ছে। রাজকোষ শুষে নিচ্ছে। অসহায় দরিদ্র ভবিষ্যতে আস্থা হারিয়ে দেশজোড়া অন্ধকারের দিকে পা বাড়াচ্ছে। তারা নায়ক খুঁজছে। এমন নায়ক যে এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মতই বীভৎস, নির্মম। ভিনসেণ্ট

স্মিথ লিখেছেন—ভূমিহীন এবং জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া মানুষের এই বেপরোয়া নায়ক সন্ধানই সেদিনে ভারতের অন্তরের কাহিনী।

সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মীয় আচার-আচরণেও এই নৈরাশ্য সেদিন স্পষ্ট। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। তার মধ্যে শত শিখায় সতীদাহের চিতা জ্বলছে। শিশু হত্যা, দাস ব্যবসা, সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি শত পথে বিভ্রান্ত মানুষ মুক্তির পথ খুঁজছে। এমনকি, বিপুল আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার সামনে থাকতেও সাধু সন্ন্যাসীরা ধর্মের নামে হাতিয়ার তুলে নিচ্ছে। বর্গীদের মত, পিণ্ডারীদের মত—'নাগা সন্ন্যাসী', 'বৈরাগী', 'গোসাঁই', 'দাদুপন্থী', বাংলার 'সন্ন্যাসী'—সেদিন নাকি অনেক সাধক দলের হাতে শাস্ত্রের বদলে শস্ত্র। ইতিপূর্বে তা ছিল না। পরেও না। এ শুধু সেদিনেরই ইতিহাস যখন বর্তমান-ই একমাত্র কাল। ওরা তখন কেউ সিন্ধিয়ার বাহিনীভুক্ত, কেউ জয়পুরের। কেউ বা নিজেরাই নিরন্ধ্র অন্ধকারে দুর্ধর্ষ পথিক দল। ঠগী তাদেরই সহযাত্রী—তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে নিপুণের দল। ঠগী সেই অন্ধকার যুগের সর্বোত্তম প্রতীক। তার সঙ্গে সব খুনীরই সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তবুও সে তুলনাহীন।

ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিলেন, নির্ভয়ে বলে যাও।

বৃদ্ধ ফকির বলতে আরম্ভ করল ঃ শহর থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে রাস্তার ধারে আমার কুঁড়ে। ছেলেকে নিয়ে আমি সেখানেই থাকতাম। আশপাশের গাঁয়ের লোকেরা ভিক্ষে দিত। তাছাড়া পথিকেরাও কখনও কখনও কিছু দিতেন। তাতেই আমাদের বাপ-বেটার কোনমতে দিন চলে যেত। দু'সপ্তাহ আগের কথা। সেদিন নমাজ সেরে আমি আমার দরজার সামনে বসে আছি। পাশে আমার

ছেলে। ছেলের জন্যে বহু কষ্টে একখানা কম্বল কিনেছি। সেটা আমগাছের ডালে ঝুলছে। এমন সময় এক ভিন্‌দেশী পথিক এসে হাজির। সঙ্গে তার স্ত্রী এবং একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটি আমার ছেলের চেয়ে কিছু বড় হবে, মেয়েটি কিছু ছোট। ওরা আমার কুঁড়ের সামনে গাছতলায় বসে রুটি বানিয়ে খেল। খাওয়া হয়ে গেলে বৌটি আমাকে কিছু আটা দিল। তাতে দুটো রুটি হয়ে যায়। আমি রুটি দুটো বানিয়ে ছেলেকে নিয়ে খেতে বসলাম। নিজের খুব ভুখ ছিল না। তাই আধখানা মাত্র খেয়ে বাকীটুকু ছেলেকে দিয়ে দিলাম। ওর ভুখ ছিল। পুরো দেড়খানা রুটিই খেয়ে নিল। খাওয়া শেষ হতে না হতেই ছেলে আমার হাই তুলল। দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

তখনও সন্ধ্যে হয়নি। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠে আমি দেখতে পেলাম, একঘর জলের মধ্যে আমি পড়ে আছি। ঘরের এককোণে ছেলেটা ধুকছে। কোনমতে আমি গড়াতে গড়াতে তার কাছে গেলাম। মাথাটা কোলে টেনে নিলাম। কিন্তু দেখতে দেখতে তার নাভিশ্বাস উঠল। সে চলে গেল। পরে শুনেছিলাম, গাঁয়ের এক ধোপা বউ এদিক দিয়ে যেতে যেতে আমার অবস্থা দেখে মাথায় জল দিয়ে গিয়েছিল। সে বুঝে গিয়েছিল ছেলেটা বাঁচবে না।

ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করলেন, তারপর ?

—তারপর আর কি হুজুর !—লোকটি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।—আমার ছেলেটা চলে গেল। আমার যখন হুঁস হয়েছে তখন সন্ধ্যা। রাতটা কি করে কেটে গেল কিছুই জানি না। পরদিন ভোরে আবার যখন জ্ঞান হল তখন দেখি, ঘরে আমার কেউ নেই। বাইরে চাপ চাপ রক্ত। মনে পড়ল, ছেলেটা আমার মরে গেছে। মরা ছেলে আমার কোলেই ছিল। তবে এই রক্ত কোথা থেকে এল, আমার ছেলেই বা কোথায় গেল ?

গাছতলায় সেই লোকটি তখনও ছিল। সে বলল, ছেলেকে তোমার নেকড়ে খেয়ে নিয়েছে। দেখবে এস, চল। বনের ধারে সত্যিই আমি হাড়গোড় দেখতে পেলাম। কাঁদতে কাঁদতে তাই কুড়িয়ে নিয়ে দরগায় এনে মাটি দিলাম। কি থেকে যে কি হল, কিছুই আমি বুঝতে পেলাম না। তিন দিন হুজুর আমার ভাল হুঁস ছিল না।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, এই কি তোমার একমাত্র ছেলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই ছেলে যখন তিন মাসের তখনই ওর মা মারা যায়। আমি গরীব মানুষ। নিজের জমিজমা কিছু নেই। খেটে খাব তেমন গতরও নেই। বৌকে মাটি দিয়ে সেই কবরের পাশেই একটা দরগা করে ছেলেকে নিয়ে বাসা বেঁধেছিলাম। আশা ছিল, একদিন ছেলে বড় হবে, বাপের দুঃখ ঘুচাবে। কিন্তু তা আর হল না।

বাধা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করলেন, সেই লোকগুলোর কি হল ?

—তারা চলে গেল।

—কেমন দেখতে ছিল লোকগুলো ?

—পুরুষটি বেশ লম্বা-চওড়া। গায়ের রং ফর্সা। আমার অনুমান হুজুর, কাঁদতে কাঁদতেই উত্তর দিল ফকির, বয়স তাঁর পঁয়ত্রিশের বেশী হবে না।

—আর মেয়েটির ?

—তার সামনের দাঁত দু'টি উঁচু, বয়স বছর তিরিশ।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, তোমার কম্বলটা কোথায় ?

—সে কি আর আছে হুজুর ! আর থেকেই বা হবে কি ? ছেলেই চলে গেল, কম্বলে আর কি কাজ আমার !

—সে কথা নয়। ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্নটাকে আরও স্পষ্ট করলেন, গাছের ডালে কম্বলটা কি ছিল ?

—না।

সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত শোনা গেল বিচক্ষণ সাহেবের কণ্ঠে। পাশে উপবিষ্ট পুলিশ অফিসারটির দিকে ঘুরে তিনি বললেন, ঠগী নয়, ধুতুরিয়া! নতুন কম্বলের লোভে খুন করেছে।

পথে পথে তখন অনেক খুনী। ধুতুরিয়ারাও হত্যাকারী। পথিকের বেশে তারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। অচেনা পথিকের সঙ্গে আলাপ করে, ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব জমায়। তারপর সুযোগ বুঝে তাদের খাবারের সঙ্গে মেশায় অথবা হুকোর তামাকে। অসহায় পথিক দল ছটফট করতে করতে প্রাণ হারায়। ওরা তাদের জিনিষপত্র লুটে নিয়ে পালিয়ে যায়। সাধারণত ধুতরার বীজে তৈরী বিষ প্রয়োগ করে কাজ সারত বলে ওদের নাম ছিল—ধুতুরিয়া। স্লীম্যান লিখেছেন—সংখ্যায় এই হত্যাকারীরা হাজার হাজার। ভারতে তখন এমন কোন জনপথ নেই যেখানে ওরা ছিল না। কি বোম্বাই-মাদ্রাজ, কি সুদূর বাংলা—ওরা সেদিন সর্বত্র।

ধুতুরিয়ারা ঠগীদের মতই নিষ্ঠুর, ঠগীদের মতই ধূর্ত। কিন্তু তবুও ওরা ঠগী নয়,—ঠগী স্বতন্ত্র।

সেবার (১৮৪৮) কানপুরে একটি, দল ধরা পড়েছে। অপরাধ: নরহত্যা। পথের ধারে এক ঘেসুরে মরে পড়ে আছে। লক্ষণ দেখে মনে হল নিশ্চয় কোন ধুতুরিয়ার কাজ। কিন্তু ধুতুরিয়া সামান্য একজন ঘেসুরেকে হত্যা করবে কিসের লোভে? চিন্তিত পুলিশ সন্ধানে নামল। ঘাটাঘাটি করতে করতে খবর পাওয়া গেল, ক'দিন আগে এই পথে একদল বাজীকর হেঁটে গেছে।

—বাজীকর? কি খেলা দেখায় তারা? পুলিশ জানতে চাইল।

—আজ্ঞে সে এক অদ্ভুত খেলা। ওরা বাজী ধরে। বাজী ধরে একটা দড়িকে ভাঁজ করে মাটিতে রাখে। তারপর দর্শকদের হাতে একটা কাঠি দিয়ে বলে, যেখানে খুসী লাগাও, দেখবে কাঠিতে দড়ি

আটকাচ্ছে না। যদি আটকায় তবে পাঁচ রুপেয়া! যদি না আটকায়, তবে কত দেবে বল?

সাহেবের মনে পড়ল—কানপুরের শহরতলীতেও পথের ধারে এই দড়ির খেলা দেখেছেন। পুলিশ তৎক্ষণাৎ বাজীকরের দলের সন্ধানে বেরিয়ে গেল।

একটি দল ধরা পড়ল। ক্রমে আরও। জানা গেল ওরাই হত্যাকারী। যাদের দড়ির খেলায় বশ করতে পারে না, তাদের বিষ খাওয়ায়। এই তাদের নেশা, পেশা।

আগ্রার তৎকালীন অ্যাসিসটেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট জে. গ্রাহাম সাহেবের ভাষায়ঃ ওরা নিষ্ঠুরতম খুনী। ওদের কোন ধর্ম নেই, কোন রীতিনীতি নেই, যে কোন উপায়ে পয়সা রোজগারই ওদের একমাত্র ফিকির। ওরা পয়সার জন্যে যাকে-তাকে খুন করতে পারে এবং যখন-তখন।

কিন্তু তবুও ওরা সাচ্চা ঠগী নয়, নাম তাদের তুসমাবাজ ঠগ।

তুসমাবাজরাও ভ্রাম্যমাণ খুনী। তাদের প্রথম আবির্ভাব ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। জনক—ক্রেয়াগ নামে কানপুরবাসী জনৈক ইংরেজ সৈনিক। দেশময় তখন ঠগীর হাওয়া। ক্রেয়াগ কোম্পানির কর্মচারী ছিল না। সে স্বাধীন সৈনিক। হঠাৎ তার বাসনা হল সেও ঠগী হবে, ঠগীর দল গড়বে। গুটি তিন দিশি শিষ্য জোগাড় হয়ে গেল। সাহেব কাজে নামল।

দেখতে দেখতে ক্রেয়াগ সাহেবের শিষ্যে উত্তর ভারত ছেয়ে গেল। তারা দিনে দুপুরে দল বেঁধে সদর রাস্তায় দড়ির খেলা দেখায়। দড়ির ফাঁস তৈরী করে বাজী ধরে পথিককে দিয়ে সেখানে কাঠি ধরায়। লাঠি বা কাঠি যদি ফাঁসে আটকাল তবে যাদুকর হারল, যদি ফাঁস ফাঁকি বলে প্রমাণিত হয় তবে সৌখিন দর্শক ঠকল। এ তামাসাই তুসমাবাজী। সাহেবরা বলতেন, প্রিকিং দি গার্টার।

তুসমাবাজ কখনও ঠকে না। সে ঠগী, পথিককে সব সময় ঠকায়। যদি দেখা যায় কেউ বাজীতে কেবলই জিতে যাচ্ছে, তবে তুসমাবাজ তাকে বিষ প্রয়োগে হারায়। অদ্ভুত দল। সংখ্যায়ও বিপুল। ১৮৪৮ সনে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সময় এক কানপুরেই তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ জন। কিন্তু তবুও তারা একজনও রোসন জমাদার, এনায়েত, ফিরিঙ্গীয়া বা তুর্গা নয়। সাচ্চা ঠগীর সঙ্গে তুসমাবাজের আকাশ-জমিন ফারাক।

১৮৩৩ সনের নভেম্বরের কথা। দিল্লির পাদ্রী সাহেব মিঃ এভারেস্ট সেদিনও ভোরে রোজকার মত ঘোড়ার পিঠে হাওয়া খেতে বের হয়েছেন। যমুনা তীরে এসে সহসা তার নজরে পড়ল, কারা যেন বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সাহেব কাছে এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখেন, পাশাপাশি পাঁচটি মানুষ মরে পড়ে আছে। তিনজন তাদের পুরুষ, তুইজন স্ত্রীলোক। এভারেস্ট কোনদিকে না তাকিয়ে ঘোড়া ছুটালেন ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের দিকে। দিল্লি তখনও পুরোপুরি কোম্পানির হাতে আসেনি। তবে দরবারী আমীর-ওমরাহের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু ইংরেজ রাজপুরুষও আছেন। তাঁরা ধীরে ধীরে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন। সুতরাং, খবর পাওয়ামাত্র অ্যাসিসটেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট লরেন্স সদলবলে ছুটলেন যমুনার দিকে। সঙ্গে তাঁর একজন পাকা ঠগী।

মৃতদেহগুলো ভাল করে পরীক্ষা করা হল। সাহেব পুরানো দাগীর মুখের দিকে তাকালেন, কি বলতে চাও তুমি?

—আজ্ঞে, এ কোন সাচ্চা ঠগীর কাজ নয়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল রাজস্বাক্ষী।—দেখছেন না গলার ফাঁসগুলো পর্যন্ত খোলেনি! তাছাড়া, কোন ঠগী এভাবে মরা ফেলে রেখে পালায়? আমার ধারণা সাহেব, ওরা ঠগী নয়।

লরেন্স কথাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর আশপাশের লোকেদের কাছে জানতে চাইলেন, হালে এ পথে কি কোন নতুন মানুষের দল দেখেছ কেউ ?

একজন বলল, আজ্ঞে হুজুর। কালকেই একদল বাউরী এই পথে গেল। সাহেব ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সেই পুরানো দাগী আর ক'জন সিপাই নিয়ে তক্ষুনি একজন হিন্দুস্তানী পুলিশ অফিসার ফরাসগঞ্জের পথে বের হয়ে গেলেন।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। ওঁরা তখনও ফরাসগঞ্জ থেকে দূরে। বনপথ ধরে ওরা শহরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। চলতে চলতে হঠাৎ কানে এল আর্তনাদ। কে যেন সাহায্যের জন্যে চিৎকার করছে। অফিসার কান পাতলেন। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আর্তনাদটা ভেসে আসছে রাস্তার ধারের ঝোপগুলো থেকেই। তিনি পাশের ঝোপটায় লাফিয়ে পড়লেন। পেছনে পেছনে সিপাইরা।

লোকটি ধরা পড়ল। দেখা গেল তার কোলে ফুটফুটে একটি ছোট্ট মেয়ে। এতক্ষণ সে-ই কাঁদছিল। স্তম্ভিত অফিসার তাকে নিজের কোলে টেনে নিলেন। ডাকুর দায়িত্ব নিল তাঁর সঙ্গের সিপাইরা।

সেই ছোট্ট মেয়েটিই হাত ধরে ওদের নিয়ে গিয়েছিল অদূরে একটি আস্তানায়। পুলিশ সেখানে আরও আটজন মানুষের সন্ধান পেয়েছিল। সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছিল দু'জন মায়ের মৃতদেহ এবং নানা বয়সের ছয়টি জীবন্ত শিশু। তাদের অধিকাংশের বয়স দু' থেকে তিন বছর, এবং একজনকে বাদ দিলে সবাই তারা মেয়ে।

ছেলেটির বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। সুতরাং, রহস্য ভেদ করতে বিশেষ অসুবিধে হল না। তার মুখেই পুরো ঘটনাটা শোনা গেল।

ওরা গরীব বাপ-মায়ের সন্তান। দেশে দুর্দিন পড়েছে। বাবা তাই ঠিক করেছেন দোয়াব ছেড়ে অন্য কোথাও কাজের সন্ধান করতে

হবে। এমন কোথাও যেতে হবে যেখানে ছেলেমেয়েদের মুখে দু'-বেলা দু'মুঠি অন্ন জোটে। গাঁ ছেড়ে সপরিবারে তিনি পথে নামলেন। সঙ্গে গাঁয়ের আরও ক'টি গরীব পরিবার।

পথে এদের সঙ্গে আলাপ হল। আলাপ থেকে অন্তরঙ্গতা। ওরা বলল, কুর্নলে চল, সেখানে কাজ আছে। তাছাড়া কাজ দেবার লোক যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে আমাদের জানাশোনা আছে।

দিল্লির পথে ওরা দল বেঁধে কুর্নলের দিকে যাত্রা করল। পথে বন্ধুরা হঠাৎ দুশমনের চেহারা নিল। তারা খুনী হল। বাপ-মাদের মেরে যমুনার ধারে ফেলে রেখে ফরাসগঞ্জে পালিয়ে এল। এ দু'জন মাকে হত্যা করা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। যে মেয়েটি কাঁদছিল একজন তারই মা।

দোয়াব এলাকার পুলিশের কর্তা লেফট্যানেণ্ট মিলস্ সাহেবের বিরামহীন চেষ্টায় গোটা দল ধরা পড়ল। দেখা গেল তাদের আস্তানায় শুধু পুরুষ নয়, মেয়েরাও আছে।

একজন তাদের রুক্মিণী। সে দলপতি রূপলার সহধর্মিণী। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, কি করে সে এই দলে এল, গরবিনী রুক্মিণী তখন তার নিজের সঞ্চয় কচিকাঁচা শিশুগুলোকে দেখিয়ে বলেছিল, এদেরই পথে!

ওর নিজের বাপ-মা খুন হয়েছিল দিল্লিতে। অন্য ভাইবোনেরা অনেকদিন হাটে বিকিয়ে গেছে। রূপলা নিজের জন্যে রেখে দিয়েছিল রুক্মিণীকে। বলেছিল, তোর বাপ-মা পালিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় আশী টাকায় তোকে আমার কাছে বেচে দিয়ে গেছে। আজ ছ' সাত বছর সে তার সঙ্গে আছে। কুর্নলেও ছিল। রূপলা যখন বাপ-মায়েদের খুন করে সে তখন বাচ্চাগুলোকে আগলায়!

রুক্মিণীর একটি সতীনও ধরা পড়েছিল তার সঙ্গে। তার নাম রাধা। একই জবাব পাওয়া গিয়েছিল তার মুখে, আমিও একই পথে এসেছি।

—কোথায় হত্যা করা হয়েছিল তোমার মা-বাবাকে ? জিজ্ঞেস করেছিলেন লেঃ মিলস্। রাধা উত্তর দিয়েছিল, বুন্দেলশরের ডানকুরি গাঁয়ের কাছে।

—কত জন খুনী ছিল সেই দলে ?

—চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন।

—তুমি কি নিজের চোখে তোমার মা-বাবাকে খুন হতে দেখেছ ?

—না। ওদের হত্যা করা হয়েছিল রাত্রে। আমি এবং আমার ছোট দু'টি ভাইকে ওরা রেখে গিয়েছিল দলের মেয়েদের হেফাজতে।

—তারপর ?

—তারপর, দিন কয়েক পরে একদল বেদের কাছে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল বিক্রি করতে। ওরা আমার উচিত দাম দিতে রাজী হয়নি। তাই সাগলা জমাদার নিজেই রেখে দিল আমাকে।

—তোমার ভাইদের কি হল ? তারা এখন কোথায় আছে ?

—সে আমি আজও জানি না।

—এই নয়া সোয়ামীর সঙ্গে ঘর করার পর থেকে বরাবরই তুমি তার সঙ্গে সঙ্গে থাক ?

—হ্যাঁ। অন্তত তিন-চার দফা তো ছিলাম।

—মাস কয় আগে তোমার স্বামী জনলীতে একজন গরীব ফকিরানীকে হত্যা করেছে। তুমি তা জানতে। কিন্তু তবুও তুমি তখন তার বাচ্চা দু'টিকে আগলে ছিলে, নয় কি ? তোমার নিজের মা-বাবাকে যারা খুন করেছে তাদের সঙ্গে এভাবে ঘুরে বেড়াতে, খুন দেখতে, বাপ-মায়ের কোল থেকে শিশু ছিনিয়ে আনতে কষ্ট হয় না তোমার ? আবেগে এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছিলেন বিস্ময়াভিভূত বিদেশী প্রশ্নকারী। রাধা সংক্ষেপে উত্তর সেরেছিল, কি করব বলুন, হাজার হোক রূপলা আমার সোয়ামী !

খুনের নায়ক রূপলাকে জিজ্ঞেস করা হল, রাধাকে কি করে বৌ করলে তুমি? সাগলা জমাদার তো তাকে বিয়ে দিয়েছিল—খুশল্লার সঙ্গে।

—ঠিক বাত্ হুজুর! কিন্তু হলে কি হয়, খুশল্লার এই বৌটাকে আমার খুব পছন্দ। তাই বলে বলে ওকে নিজের ঘরে নিয়ে এলাম। রাধা এখন আমার জেনানা। সে আমার সঙ্গেই থাকে। কুর্নলে ছিল, থানেশ্বরেও।

রূপলাকে প্রশ্ন করে শুধু থানেশ্বর নয়, আরও ক'টি হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়া গিয়েছিল। জানা গিয়েছিল—বহুদূরবিস্তৃত শাখা-প্রশাখাসহ ওরাও একটি বিশেষ সম্প্রদায়। তাদের নায়কের নাম—ক্ষেমা। নিবাস—আলোয়ার স্টেট। শুধু রূপলা নয়—সবাই বলে, ক্ষেমা এক বিস্ময়কর ফকির, তার নানা অলৌকিক ক্ষমতা।

কিন্তু কোন মন্ত্রবলেই মিলস্‌কে এড়ান গেল না। অবশেষে দল-পিতা ক্ষেমাও ধরা পড়ল। তার মুখ থেকেই জানা গিয়েছিল, ওরা ফাঁস্যুড়ে হলেও ঠগী নয়। ওরা 'মেকফানসা'। 'মেক' মানে পেরেক বা এমন কিছু যাতে কাউকে ঝুলান যায়, 'ফানসা' মানে ফাঁস, যা ঝোলায়।

ক্ষেমা বলে, তার এই অদ্ভুত খুনী দলের আবির্ভাব ভারতপুরে যখন অবরোধ সুরু হয় তখন। অর্থাৎ ১৮২৬ সন। ওরা সেদিনই ঠগী থেকে ছেলেধরা ঠগ হয়েছিল। এখনও তারা তাই আছে। ঠগীদের সঙ্গে তাদের এখনও অনেক ফারাক। তাদের নিজস্ব দেবী আছে, নিজস্ব ভাষা আছে, হত্যার রীতিনীতিও তাদের একান্ত আপন।

ওরা ছোট ছেলেদের বলে 'জনকুলা' বা 'খোনতুরা', বাচ্চা মেয়েদের বলে 'জনকুলি' বা 'খোনতুরি'। পথিক ওদের ভাষায় 'খোর', পথিকদল 'তাইওয়া'। ঘোড়াকে ওরা বলে 'বুগীলা', গরুকে 'রানকুরী', টাকাকে 'গুণা' বা 'কার্‌রা', মোহরকে 'থান' বা 'খোর', গলার হারকে 'তাগলী'।

‘এক’ ওদের কাছে একই, কিন্তু তুই ‘তুরু’, তিন ‘তুরু’, চার ‘চৌরু’ এবং ইত্যাদি।

ওদের দেবীও ভবানী বা কালী। ওদের হাতিয়ারও ফাঁস। কিন্তু তবুও ঠগীদের মত ওরা তত আচারনিষ্ঠ নয়। ওরা দলের সবাইকে হত্যা করে শিশুদের বাঁচিয়ে রাখে। কারণ ওরা জেনে গেছে, এই হতভাগ্য দেশে মানুষ যেমন অঢেল, মানুষের চাহিদাও তেমনি। বিশেষ করে মেয়েদের। কেননা, দেশে অন্ধকার মানেই দিকে দিকে বিলাসের পাককুণ্ড। সেখানে রাত্রি আর দিনের কোন ফারাক নেই। রূপলা, ক্ষেমা এবং অন্যরা নিজেরাই বলেছে—কি উত্তরে কি দক্ষিণে, মোটামুটি দেখতে ভাল যে কোন বাচ্চা মেয়ের বদলে আশী থেকে একশ’ টাকা অনায়াসে পাওয়া যাবে। তাও নিজেদের হাট অবধি ছুটতে হবে না। পথে পথে ব্রিনজাররা ঘুরছে, সেই বেদেরাই হাতে নগদ গুঁজে দিয়ে যখন-তখন বোঝা হাল্কা করে দিয়ে যাবে!

তাছাড়া ম্যাকফানসাদের অন্য ঝামেলাও কম। তাদের কবর খুঁড়তে হয় না। সাধারণত তারা নদীনালার ধারেই খুন করে দেহগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। কাছেভিতে নদী না থাকলে কোনমতে মোটামুটি একটা কিছু দিয়ে চাপা দিয়ে সরে পড়ে। ওরা সাচ্চা ঠগী নয়, অপব্যয় করার মত সময় তাদের হাতে নেই!

প্রায় একই সময়ের কাহিনী। ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হঠাৎ খবর পেলেন, ঢাকা থেকে ফরিদপুরে আসবার পথে তু’জন পথিক হারিয়ে গেছেন। তাদের একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান। তারা নদীপথে ঢাকা ছেড়ে ছিলেন। সঙ্গে তাদের পনের টাকা ছিল। এবং যে নৌকোটিতে তারা আসছিলেন তাতে আরও তু’জন যাত্রী ছিল। তখন জুলাই মাস।

ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখলেন। তু’জনের

উদ্যোগে দুই জেলাতেই খোঁজাখুঁজি সুরু হল। কিন্তু যাত্রীদের কোন সন্ধান নেই।

পুরো জুলাই গেল, আগষ্ট গেল, সেপ্টেম্বরে ফরিদপুরের পুলিশ ভোলানাথ নামে একটি মানুষকে ধরে এনে হাজির করল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। বললে, হুজুর, এই আপনার সেই আসামী।

ম্যাজিস্ট্রেট কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে রাজী নন। কিন্তু ভোলানাথ নিজেই অপরাধ স্বীকার করল। সে বলল, সাহেব, তুমি অবিশ্বাস করছ বটে, কিন্তু আমিই সেই খুনী। গত মাঘ মাসের কথা। দু'জন তামাকের কারবারীকে নিয়ে নৌকো করে আমি এবং আমার আরও জনাকয় বন্ধু রংপুরে যাচ্ছিলাম। পথে কারবারীদের আমরা খুন করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। কত পেয়েছিলাম জান? চল্লিশ টাকা। বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞেস কর স্বরূপকে।

—স্বরূপ আবার কে?

—তাও জান না? বিস্মিত ভোলানাথ সে খবরটাও দিয়েছিল। বলেছিল, আমার নিকট-আত্মীয়, আমরা একই গাঁয়ে থাকি।

তাকে ধরে আনা হল। সে বলল, আজ্ঞে হুজুর, ঢাকার ব্যাপারটায় ভোলানাথ ছিল না, তার জন্যে দায়ী আমি।

—কেমন?

স্বরূপ বলে চলল, ওঁরা তো ফরিদপুর যাবেন বলে ঢাকায় আমার নৌকো কেরায়া করলেন, আমরাও যথানিয়ম 'বদর' 'বদর' করে নৌকো জলে ভাসালাম। ঘণ্টা দুই চলার পর নৌকো এসে ঠেকল চোরের চরে। ওঁরাও সেখানেই ঠেকলেন। কাজ সেরে আমরা সেদিনই আবার ঢাকা ফিরে এলাম। তারপর সেখান থেকে নারায়ণগঞ্জ।

—নৌকোয় যে আরও দু'জন ছিল? তাদের কি করলে? জানতে চাইলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

—আজ্ঞে, সেই দুই বামুনঠাকুর যাত্রী নন, তারা আমাদেরই

দলের লোক। যাত্রীদের যাতে কোন রকম সন্দেহ না হতে পারে সে কারণেই ওদের বামুন সাজিয়ে গলুইয়ে বসিয়ে রেখেছিলাম!

স্বরূপের কাছ থেকে আরও জানা গেল, তাদের মাত্র একখানা নৌকোই ছিল না। সঙ্গে আরও একটা পানসি ছিল। তাতে ছিল আরও পাঁচজন খুনী। পুলিশের চেষ্টায় ফরিদপুরের ঘাটেই ধরা পড়ল তাদের চারজন।

তারা প্রথমে ঢাকার ঘটনা একেবারেই অস্বীকার করে বসল। প্রশ্নে প্রশ্নে অবশেষে একজন ভেঙ্গে পড়ল। সে মুখ খুলল। সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই। নৌকো থেকেই হারান মানুষ দু'টির পোষাক বের হল। সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হল দু'গাছি পৈতে। সাহেব প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কি জাত?

স্বরূপ উত্তর দিল, আজ্ঞে হুজুর, আমরা চণ্ডাল।

—তবে তোমাদের নৌকোয় বামুনের পৈতে কেন?

—আজ্ঞে, সে কথা তো আগেই বলেছি। এ না হলে কি এই সব মাঝিমাল্লাকে কখনও বামুন সাজান যায়?

স্বরূপের জবানবন্দী থেকে আরও একটি নাম পাওয়া গেল। সে বলল, আমাদের মধ্যে সেরা খুনী সুবল দাম। তাকে ধরতে পারলে ঢাকা ফরিদপুরের আরও কিছু কিছু খবর পেতে পারেন।

খুঁজেপেতে তাকেও বের করা হল। সুবল বলল, হুজুর, ঢাকার কথা আমি কিছুই জানি না। আমি বরং ময়মনসিংহের তাঁতী দু'জনের কথা বলতে পারি।

—বেশ, তাই বল।

সুবল বলে চলল, গেল জ্যৈষ্ঠের কথা। তিনখানা নৌকো নিয়ে আমরা ময়মনসিংহ গেছি। দু'জন তাঁতী নৌকোয় এল কাপড় বেচতে। আমাদের লোকই তাদের ডেকে এনেছিল। সবাই মিলে দরদস্তুর করছে, আমি ডাঙায় গেছি একটু ঘুরে আসতে। ফিরে এসে

দেখি কাপড়ের গাঁট তু'টি ঠিকই আছে, কিন্তু তাঁতী তু'জন নেই।

—কি হল তারা?

—কি আর হবে? খুন হল।

—তারপর?

—তারপর আমরা রংপুর চলে গেলাম। সেখান থেকে ফেরার সময় পথে দেখা হয়ে গেল একদল তামাক কারবারীর সঙ্গে। নৌকো বোঝাই তামাক নিয়ে তারা সিরাজগঞ্জ যাচ্ছে। দলে পাঁচজন। তু'দিন জলে জলে এক সঙ্গে চললাম আমরা। তৃতীয় দিনে নৌকো থামিয়ে ওদের নেমন্তন্ন করা হল আমাদের নৌকোয়। সন্ধ্যায় হরি সংকীর্তন, একসঙ্গে গান হবে। ওরা এল। গোল হয়ে আমরা ওদের ঘিরে বসলাম। গান সুরু হল। তারপর এক সময় আসল হুকুম জারী হল। তারপর দেহগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে ওদের নৌকোটা সঙ্গে নিয়ে আবার 'বদর' 'বদর' করে যাত্রা সুরু হল। কিছুদূর এসে ওদের নৌকোর মালপত্র সব বোঝাই করা হল আমাদের নৌকোয়।

—সে নৌকোটি কি হল?

—সেটি সেখানেই ডুবিয়ে দিয়ে আমরা নারায়ণগঞ্জে চলে এলাম। তারপর তামাকের বস্তাগুলো সেখানে বিক্রি করে যে যার ঘরে চলে গেলাম।

—বাঃ চমৎকার! মন্তব্য করেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

জবানবন্দীগুলো শুনলেই বোঝা যায়, ভোলানাথ, স্বরূপ বা সুবল বিচ্ছিন্ন কোন খুনী নয়। ওরা সু-সংগঠিত দল। শুধু পূর্ববঙ্গের নদী-নালায় নয়, অন্যত্রও সেদিন তাদের অবাধ আনাগোনা। ঠগীদের মতই ওরা একটি স্বয়ংনির্ভর সম্প্রদায়।

আচারে আচরণেও তু' দলে অনেক মিল। ফলে বেকার বসে

থাকবার মত পরিস্থিতি দেখা দিলে মাঝে মাঝে ডাঙার ঠগীও তাদের দলে ভিড়ত, স্বাদ বদল করত।

তাদের একজনের জবানবন্দী :

প্রায় চৌদ্দ বছর আগেকার কথা। আমরা বাইশ জনের একটি দল ছাপরা থেকে মুর্শিদাবাদ চলেছি। সুবন জমাদার আমাদের নায়ক। সে রাজপুত ছিল। দলের দু'জন—খোদাবক্স আর আলি ইয়ার—জাতে মুসলমান। ওরা মাঝে মাঝে জলেও নামত। থেকে থেকে ওরা আমাদের সে পথে উস্কে দিচ্ছিল। ভাগ্যও ভাল বলতে হবে। রাজমহলে এসে সত্যিসত্যিই একদল 'পাঙ্গু'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তীর্থযাত্রীর বেশে তারা ঘাটের দিকে চলেছে। সুবন জমাদার ওদের দেখেই চিনে ফেলল। আলি ইয়ার এবং খোদাবক্স কানে কানে বলল, তারা এদের সঙ্গেই আগে কাজ করেছে। লোকগুলো গোটা পাঁচ যাত্রী নিয়ে ঘাটের দিকে যাচ্ছে। একসঙ্গে চলবে বলে রাস্তা থেকে তাদের জোগাড় করে এনেছে। খোদাবক্সকে দেখেই তারা থমকে দাঁড়াল। কথাবার্তা হল। স্থির হল, সুবন জমাদার, আমি এবং ধোদ্রা কুর্মি—এই তিনজন আমরা ওদের সঙ্গে যাব। তিনজনেই জলের পথে নতুন। ভালোয় ভালোয় সেরে আসতে পারলে অনেক কিছু শিখে নিয়ে আসা যাবে!

রাজমহলেই তিনজন নৌকোয় চাপলাম। যাত্রী পাঁচজন আগেই উঠেছে। তারা একদিকে আরাম করে গুছিয়ে বসেছে। আমরা এবং নৌকোর খুনীরা অন্যদিকে। ওদের সকলেরই মাঝিমাল্লার বেশ। কেউ কেউ ছাউনির ওপরেও আছে। দু'জন ডাঙায়। তারা গুণ টানছে।

নৌকো চলেছে। কিছুদূর গিয়েই পথে একটি ফিনিস পড়ল। তারপর পর পর দু'খানা বজরা। আমরা চুপচাপ বসে আছি। ওরা পেছনে না পড়া অবধি কিছু করা ঠিক নয়। বড় মাঝির নির্দেশে

নৌকো থামান হল। এদিকে যাত্রীরা উসখুস করছে। তারা বলছে, মাঝি, দেরী করলে কি করে হবে? আমাদের সময়ে পৌঁছাতে হবে।

মাঝি জবাব দিল, কি করব বলুন। মানুষ তো, কতক্ষণ আর একটানা গুণ টানতে পারে! একটু বিশ্রাম করতে দিন, একটানে নিয়ে যাবে। মাঝি তল্পিতল্পা খুলে খাবার নিয়ে বসে গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। এদিকে ফিনিসটিও অনেক দূর চলে গেছে। আমাদের নৌকো আবার জলে ভাসল। কিছুদূর যাওয়ার পরই ছইয়ের ওপর থেকে সঙ্কেত দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের পেছনে যারা বসেছিল তারা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামনে থেকে পাঁচজন গলায় 'আঙ্গুছা' পরিয়ে দিল। জলে তাই নিয়ম। ফাঁসটা সামনের দিক থেকেই আটকান হয়। ওরা মানুষটাকে পেছনের দিকে ঠেলে, অন্য ঠগীরা ঠেলে সামনের দিকে।

যা হোক, কাজ শেষ হয়ে গেল। হাঁটু দিয়ে চেপে শিরদাঁড়াগুলো ভেঙ্গে দেহগুলো তক্ষুনি জলে ফেলে দেওয়া হল। ওরা ছুরি ব্যবহার করে না। ঘাড় আর পিঠটা ভাল করে ভেঙ্গেই জলে ফেলে দেয়। তা ফেলার জন্যে নৌকোর পেছন দিকে দুটো তক্তা ওরা আলগা করেই রাখে।

এদিকে নৌকো কিন্তু তখনও চলছেই চলছে। যারা গুণ টানছিল তারা তখনও গুণ টানছে। ক'ক্রোশ চলে সকলে মিলে হিসেব-নিকেশে বসল। দেখা গেল, পাঁচ জনকে খুন করে সবশুদ্ধ আমাদের আয় হয়েছে দু'শ টাকার মত। সুবন জমাদার বলল, তার দলে উনত্রিশ জন লোক আছে। আমি জানি, আমরা তেইশ জন। তাহলেও কিছু বললাম না। ওরা তো আর ঠগী নয়, ওদের ফাঁকি দিলে দোষ হয় না।

ছয় জনের ভাগ বেশী পাওয়া গেল। তাই নিয়ে খুশী মনে আমরা

সে রাত্তিরেই আবার নৌকো ছেড়ে ডাঙায় উঠে এলাম। দলের অন্যরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাদের নিয়ে আমরা গঙ্গার ধার দিয়ে মোরমাকিয়া ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখান থেকে চার ক্রোশ দূরে আবার দেখা হয়ে গেল আর একদল 'পাঙ্গু'র সঙ্গে। নৌকোয় তাদের তিনজন যাত্রী। এবারও ওরা ডাকল। কিন্তু আমি আর গেলাম না। সুবন জমাদার অন্য দু'জনকে নিয়ে নৌকোয় উঠল।

মোরাতুন নামে আর এক ঠগীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন স্লীম্যান, আচ্ছা, তুমি তো অনেকবার 'পাঙ্গু'দের সঙ্গে নদীতে গেছ, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওদের আর তোমাদের কি একই দেবী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমাদের সঙ্গে ওদের কি কোন পার্থক্য নেই?

—তা আছে বৈকি! উত্তর দিয়েছিল মোরাতুন।—ওদের কারবার নদীতে, আমাদের ডাঙায়। আমাদের নিয়ম কবর, ওদের নিয়ম বিসর্জন। ওদের রক্তপাত নিষিদ্ধ। ওরা যদি যাত্রার সময় রক্ত দেখে তবে আবার নতুন করে যাত্রা করতে হয়। আমরা খুনের আদেশ দিই 'ঝিরণী' দিয়ে, ওরা দেয় পাটাতনে তিনবার বৈঠা ঠুকে।

—তোমাদের ভাষা আর ওদের ভাষা কি এক?

—আলবৎ না। আমাদের বুলি ওরা একবর্ণও বুঝতে পারে না, আমরাও ওদের বুলি বুঝি না।

স্লীম্যান বক্তিয়ার নামে আর একজন ঠগীকে ডাকালেন—তোমারও তো মাঝে মধ্যে জলে যাওয়ার অভ্যেস ছিল শুনেছি। আচ্ছা, তুমি বল তো ওদের কি নামে ডাকা হয়।

—আজ্ঞে আমরা ডাকতাম পাঙ্গু বলে।

—কোথায় থাকে ওরা?

—আমি যতদূর জানি হুজুর, ওদের নিবাস বাংলাদেশের বর্ধমান জেলায়। তাছাড়া বীরভুম, বাঁকুড়া, সিউরী, কালনা-কাটোয়াতেও অনেকে থাকে।

কথাটা মিথ্যে নয়। কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছিল জলের ঠগীদের সবচেয়ে বড় আড্ডাখানা বর্ধমান। অবশ্য সেখানে তাদের 'পাঙ্গু' বা 'ভাঙ্গু' বলা হত না। নাম ছিল তাদের 'ভাগিনা'। তারা নৌকো নিয়ে এদিকে কলকাতা থেকে ওদিকে বেনারস, এমনকি কানপুর পর্যন্ত শিকার খুঁজে বেড়াত। তাদের নৌকোগুলো ছিল ভাড়াটে পানসির মত। লোক চলাচলের ঘাটে নোঙর করে জনাকয় ঠগ তার সামনে যাত্রী সেজে বসে থাকত। সত্যিকারের যাত্রীরা তাদের দেখে নৌকোটির দিকে আকৃষ্ট হত। দলের কিছু লোক যাত্রী বেশে ডাঙায়ও ওঁৎ পাতত। টোপ হয়ে তারা যাত্রীদের কৌশলে নৌকোয় ডেকে আনত। 'বদর' 'বদর' করে নৌকো ঘাট ছাড়ত। তারপর সুবিধেমত জায়গায় পৌঁছান মাত্র ছৈয়ের ওপর বসা মানুষগুলো ইঙ্গিত দিত। হালে বসা মানুষটি পাটাতনে তিনবার বৈঠা ঠেকাত। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। ভাগিনাদের মধ্যে কড়া নিয়ম ছিল, কখনও যেন একবিন্দু রাক্তপাত না হয়।

ফলে ১৮৩৬ সন পর্যন্ত গঙ্গায় বিস্তর মৃতদেহ পাওয়া গেলেও ভাগিনাদের অস্তিত্ব কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু একজন ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। এক বছরের মধ্যেই আদালতের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল একশ' একষট্টি জন। নাম পাওয়া গিয়েছিল আরও আটত্রিশ জনের। তখনই জানা গিয়েছিল, শুধু পূর্ববঙ্গে নয়, এই গঙ্গায় ঠগীনৌকো আছে আঠারখানা এবং তার প্রত্যেকটিতে আছে গড়ে চৌদ্দজন করে 'ভাগিনা'।

ঠগী 'ভাগিনা' নয়, 'ম্যাকফানসা' নয়, 'ঠ্যাঙ্গাড়ে' নয়, 'ধুতুরিয়া' নয়,—সে ঠগীই।

৫

উপকরণ অতি সামান্য। একফালি হলুদ কাপড়।

ঢাল নয়, তলোয়ার নয়, বোমা-পিস্তল কামান-বন্দুক—কোন আগ্নেয়াস্ত্র নয়, একমাত্র হাতিয়ার সেই হলুদ রঙের রুমালটি। রুমাল নয়, ওরা বলত—পেলহু। কিংবা—সিক্কা।

খুলে রাখলে মনে হবে যেন কোন পাগড়ী খুলে রাখা হয়েছে, অথবা 'সাস',—কোমরবন্ধনী হিসেবে ব্যবহৃত কোন কাপড়। দু'ভাঁজে ভাঁজ করার পর সেটি দৈর্ঘে মাত্র তিরিশ ইঞ্চি। আঠার ইঞ্চি দূরে একটি গিঁট। গিঁটের প্রান্তে একটি রুপোর টাকা বাঁধা। নয়ত একটি তামার ডবল পয়সা। হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে মেপে মেপে অতি যত্নসহকারে ওরা যখন সেটি তৈরী করে, তখন দেখলে কিছুই বোঝা যাবে না। একমাত্র এনায়েত ধরা পড়ার পর খুব মনোযোগ দিয়ে পরখ করলে তবেই জানা যাবে ওর হাঁটুটা ছিল শত শত মানুষের গলার বিকল্প। রুমালটা আসলে একটা ফাঁস। প্রান্তে বাঁধা সিঁদুর মাখান টাকাটা তাকেই আরও নির্ভুল, আরও নিটোল করার জন্য।

কোমরে সেই 'নির্দোষ' হাতিয়ার গুঁজে ছিন্ন বেশে নগ্ন পায়ে পথে নামত—রোসন জমাদার, রুস্তম খাঁ, এনায়েত, দুর্গা—ইতিহাসের নৃশংসতম, বিচক্ষণতম হত্যাকারীর দল। সঙ্গে তাদের নানা বয়সের নানা চেহারার অসংখ্য অনুচর।

চলতে চলতে ওরা গল্প করত। দেশ-দেশান্তরের নানা গল্প। গান গাইত। ভক্তির গান, ভালবাসার গান, আনন্দের গান। গাছতলায় বসে মাঝে মাঝে ওরা বিশ্রাম করত। তামাক খেত, সুখদুঃখের আলোচনা করত। কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাসত, কখনও চোখে জলের ঢল নামাত। দূরের পথিক গুটি গুটি এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াতেন। তারপর নিজের অজান্তেই একসময় বসে পড়তেন। এমন সঙ্গীকে এড়ান যায় না।

সঙ্গী হিসেবে যেমন চমৎকার, মানুষ হিসেবেও তেমনি। চেহারায় সকলেই সনাতন ভারতীয়। সেই শান্ত চোখ, খাড়া নাক। মুখে মেহেদি মাখা দাড়ি, গায়ে কামিজ, মাথায় পাগড়ী। ভারতের আর পাঁচজন গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই তাদের। বরং কারও কারও চেহারায় রীতিমত আভিজাত্যের ছাপ। যেমন টেলারের নায়ক আমীর আলি। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি উঁচু মানুষটি যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় না যে তার এই গর্বিত দেহ আর প্রশান্ত বদনমণ্ডলের পেছনে আছে সাতশ' খুনের ইতিহাস। অথচ আমীর আলি নিজেই তা বলেছিল। মাথার পাগড়ীটা ধীরে ধীরে খুলে চওড়া কপালটা সাহেবের সামনে বাড়িয়ে ধরেছিল। তারপর পাগড়ীটা আবার মাথায় জড়াতে জড়াতে বলেছিল, যে দাগাটা দেখলেন হুজুর, সেটাই আমার চিনাস। প্রথম জীবনে একবার বেয়াকুফের মত ধরা পড়েছিলাম। ঝালোনের রাজাবাহাদুর কপালটা দাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমি দাগী।

সেকথা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কারণ, কথক আমীর আলি নিজেই। কিন্তু বাইরে থেকে অতি নিকট প্রতিবেশীরও জানবার উপায় নেই ওরা কে। সেই ছোট ছোট গাঁ। গাঁয়ের এককোণে ছোট ছোট কুটির। শান্তির নীড়। বছরভর ওরা স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে সংসার করত। কেউ কেউ মাঠে ঘাটে কাজ করত। কেউ কাছারি

কুঠিতে। এমনকি কেউ কেউ ফৌজে পর্যন্ত। গৃহস্থ হিসেবে সবাই তারা সমান শান্তিপ্রিয়। তারা ভিখারীকে ভিক্ষে দেয়, জমিদারকে খাজনা দেয়, উৎসবে আনন্দ করে, শোকের দিনে গলা ছেড়ে কাঁদে।

গোটা বছর ওরা স্বাভাবিক মানুষ, সাধারণ গৃহস্থ। কিন্তু বর্ষা শেষে দিনক্ষণ দেখে শরতের ভোরে যখন ঘর ছেড়ে পথে নামল তখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। ওদের হাসি তখন হাসি নয়, কান্না কান্না নয়। ওরা তখন ভিন্ন জগতের মানুষ—ওরা খুনী।

বাড়ীর মেয়েরা সে খবর জানত। তারা সাত দিন পাড়াপ্রতিবেশী এড়িয়ে চলত। অষ্টম দিনে কেউ খবর করলে বলত, বিদেশ গেছে। কাজের ধান্ধায় দেশান্তরী হয়েছে। ছোটরাও তাই জানত। বাবা বাইরে গেছে। শীত শেষ হলেই তাদের জন্যে অনেক কিছু নিয়ে ঘরে ফিরবে!

বাবা যতদিন না ফিরছে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ততদিন মায়ের। ঠগী বৌ তখন নীরবে সংসার আগলায়। স্বামীর পেশা সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা নয়, বলতে গেলে সবই তার জানা। কেননা, সেও ঠগীর ঘরেরই মেয়ে। তার অনেক দায়িত্ব। এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম মূলতানী ঠগের স্ত্রীরা। তারা ততখানি সৌভাগ্যবতী ছিল না। স্বামীরা কখনও তাদের কাছে আসল খবর বলত না। অবশ্য অন্য ঠগীদের মধ্যেও কেউ কেউ অনেক সময় স্ত্রীর কাছে নিজের জীবন গোপন রাখত। কিন্তু সে একান্তভাবেই ব্যক্তিগত ব্যাপার। সাচ্চা ঠগীর পক্ষে আপনজনের কাছে মনের কথা গোপন রাখার কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি কোন ঠগী ইচ্ছে করলে তাকে সঙ্গে নিয়েও পথে বের হতে পারে। বারুণী নামে এক ঠগীবৌ ছিল। সে নাকি তাই করত। সাক্ষ্যপ্রমাণে জানা গেছে, নরহত্যার সময়েও সে স্বামীর পাশেপাশে থাকত, দরকার হলে সাহায্য করত। দক্ষিণ ভারতে

আর একটি মেয়ে ছিল, সে নিজে একটি দল পুষত। সেটা সহজ কথা নয়। কারণ, খানদানী ঘরের লোক না হলে প্রথমত কেউ দলপতি বা জমাদার হতে পারত না। দ্বিতীয়ত, জমাদারের শুধু দল গড়ার মত ব্যক্তিত্ব থাকলেই চলবে না। যাত্রা সুরু করার আগে তাকে দলের প্রত্যেকের ঘরে দু'একমাসের আগাম খোরপোষ রেখে যেতে হবে!

পথে নামবার আগে আরও কিছু কিছু কৃত্য আছে। প্রথমত একটি কোদাল তৈরী করতে হবে। সেটি তৈরী করতে হবে কামার-বাড়ীর ঝাঁপ বন্ধ করে নিজেদের চোখের সামনে। যেদিন খুশী কামার ভাইয়ের দুয়ারে হাজির হলেই চলবে না, দিনটা শুভদিন হওয়া চাই। ঠগীর পাঁজিতে তার জন্যে সপ্তাহে মাত্র তিনটে দিন নির্দিষ্ট—মঙ্গল, বুধ এবং শুক্র। যদি অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে এই তিনদিনের যে কোন একদিন কামারের ঘরে যেতে হবে। তারপর ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে তাকে কাজে লাগাতে হবে। নজর রাখতে হবে, কামার যেন কোদাল গড়তে গড়তে অন্য কিছুতে হাত না দেয়। তাহলেই সব গেল। নতুন করে আবার একদিন চেষ্টা করতে হবে।

কামারের কাজ ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় কর্তব্য শুভদিনে, শুভক্ষণে কোদালটিকে মন্ত্রপূত করা। সে অনুষ্ঠানেও অনেক আইনকানুন, বিধিনিষেধ।

প্রথমে ঘরের মেঝেতে একটি গর্ত খুঁড়তে হবে। নতুন কোদালে নয়, অন্য কিছুতে। তারপর অতি সঙ্গোপনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে সুরু হবে অনুষ্ঠান। সেখানে ঠগী ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। একজন গর্তের ওপর কোদালটি ধরে থাকবে। অন্য একজন ধীরে ধীরে জল ঢেলে যত্নসহকারে সেটি ধোয়াবে। জলের পর ধুতে হবে

চিনি-জলে, তারপর ঘোলে এবং অবশেষে মদে। ইতিমধ্যে ঘুঁটে এবং আমকাঠে এক অগ্নিকুণ্ডও তৈরী হয়েছে। সাতটি সিঁদুরের ফোটায় সাজিয়ে সেই সদ্যস্নাত কোদালকে এবার সাতবার আগুনে সেঁকে অগ্নিশুদ্ধ করা হবে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব আরও গুরুতর। এবার সেই কোদাল দিয়ে একটি নারকেল ভাঙতে হবে। পশ্চিমদিকে মুখ করে পুরোহিত তথা এই পবিত্র অনুষ্ঠানের নায়ক বসে আছে। হাতে তার একটি পিতলের রেকাবী, তাতে শ্বেতচন্দন, চিনি ইত্যাদি নানা উপচারের মধ্যে শায়িত পবিত্র কোদাল। তার সামনে মাটিতে একটি ছোবড়া ছাড়ান গোটা নারকেল রাখা হয়েছে। কোদালের গোড়ালিটা দিয়ে এক ঘায়ে সেটি ভেঙ্গে দু'টুকরো করতে হবে।

লোকটি ধীরে ধীরে কোদালটি হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে উঠে যাবে। দলের অন্যরা পশ্চিমদিকে মুখ করে সার হয়ে বসে আছে। সে তাদের দিকে ঘুরে অনুমতি চাইবে—ভাঙব ?

—হ্যাঁ ! সবাই সমস্বরে জবাব দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে নারকেলে কোদালের ঘা পড়বে। নির্ভুল লক্ষ্যে নিশ্চিত আঘাত। নারকেলটি ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল। সকলে জয়ধ্বনি করে উঠল—জয় ভবানী ! এবার শাঁসটুকু সেখানে বসেই প্রসাদ হিসেবে খেয়ে নিতে হবে। বাকী যা থাকবে সব কুড়িয়ে সেই গর্তটিতে ফেলতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, কিছুই যেন মাটিতে পড়ে না থাকে। কেননা, তাহলে অন্যরা পায়ে মাড়াবে, দেবীর অসম্মান হবে।

যদি কোন কারণে এক ঘায়ে নারকেলটি ভাঙ্গা না যায় তাহলে অনুষ্ঠান সেদিনকার মত সেখানেই শেষ। বুঝতে হবে কোথাও ত্রুটি রয়ে গেছে। দেবী তাই পুজো গ্রহণে অসম্মত হচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আবার আর একদিন নতুন করে চেষ্টা করতে হবে। অনুষ্ঠান যদি

নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে যায় তবে একটি পরিচ্ছন্ন কাপড়ে জড়িয়ে কোদালটি আবার সকলের সামনে স্থাপন করা হবে। এবারও তার মুখ থাকবে পশ্চিমদিকে। সকলে মনে মনে তাকে প্রণাম জানাবে। তারপর দলের মনোনীত বিশেষ একজনের হাতে সেটি তুলে দেওয়া হবে। এবার থেকে এই মন্ত্রপূত কোদালের সব দায়-দায়িত্ব তার। কাজটা যে কোন ঠগীর কাছে অত্যন্ত সম্মানের। কেননা, দলের জীবনে রুমালের মতই এই অস্ত্র জরুরী। রুমাল যদি ওদের সিক্কা বা প্রতীক হয়, তবে কোদাল ওদের নিশান। আজ থেকে নাম তার 'মাহি' অথবা 'কাস্‌সি',—কক্ষনো সেটি আর কোদাল নয়। ওরা প্রতি যাত্রায় সেটি নতুন করে গড়ে, নতুন করে তাতে প্রাণসঞ্চার করে। তাই নিয়ম।

ছোট্ট কোদাল। লম্বায় ছ' থেকে আট ইঞ্চি, ওজন তু' থেকে আড়াই সের। কোন হাতল নেই। প্রতিবার দরকারের সময় ওরা নতুন করে হাতল লাগিয়ে নেয়, কাজ শেষ হয়ে গেলেই সে হাতল ফেলে দিয়ে ধুয়ে মুছে আবার বহনকারীর হাতে ফিরিয়ে দেয়। এ কোদাল সম্পর্কে তার অনেক কর্তব্য। পথে বের হবার আগে তাকে সেটি অতি সংগোপনে মাটির তলায় লুকিয়ে রাখতে হবে। এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে কোন মানুষ বা জন্তুর ছায়া না পড়ে। যাত্রার আগের দিন সেটি তুলতে হবে।

পথেও নানা নিয়ম। সেখানেও কোদাল সেই বিশেষ মানুষটিরই হেফাজতে। সে তাকে সযত্নে মাটির তলায় লুকিয়ে রাখে, প্রতি সপ্তম দিনে ভক্তি ভরে পুজো করে। কেননা, মন্ত্রসিদ্ধ কোদালের অনেক গুণ। প্রথমত, কোদাল দলের পথ নির্দেশক। দল পরদিন ভোরে যে দিকে চলবে বলে ঠিক করেছে কোদালটিকে সেদিক মুখ করেই মাটির নীচে রাখা হয়েছে। ভোরে উঠে বহনকারী নজর করবে কোদালের মুখ ঠিক সেদিকেই আছে কি না।

যদি কোদাল রাত্তিরে নিজে নিজে দিক পরিবর্তন করে থাকে তবে বুঝতে হবে তাদেরও পথ পরিবর্তন আবশ্যক। কোদালের মুখ যেদিকে দেখা গেছে ওরা এবার সেদিকেই পা বাড়াবে। দ্বিতীয়ত, এ কোদাল দলের রক্ষক। দলের কেউ মিথ্যা বলছে কি না তার শেষ পরীক্ষা কোদাল। লোকটিকে তার ওপর হাত রেখে শপথ করতে হবে। এ পরীক্ষার সময় হাতের কাছে আসল কোদালটি না পাওয়া গেলে ন্যাকড়ায় অথবা মাটিতে তার একটি প্রতীক তৈরী করে তাকে মন্ত্রসিদ্ধ করে নিলেও চলবে। লোকটি যদি মিথ্যে বলে তবে ছ'দিনের মধ্যে সে মারা যাবে, অথবা কোন বিপর্যয়ে পড়বে—এমন সংকটে যা মৃত্যুরই সামিল। তৃতীয়ত, এ কোদাল দলের ভাগ্যনিয়ামক। পথে যদি কখনও বহনকারীর হাত থেকে সেটি মাটিতে পড়ে যায় তবে ওরা জানবে এক বছরের মধ্যে তারা একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহযাত্রী হারাতে চলেছে। আজ যে তাদের হয়ে দলের নিশান বইছে এক বছরের মধ্যে তার মৃত্যু হবে। আর যদি তা না হয়, তবে দলের অপমৃত্যু। ওরা হয় কোথাও ধরা পড়বে, না হয় অন্য কোন বিপাকে পড়বে। চতুর্থত, এ কোদালের ব্যবহারিক গুণ। ঠগীর কোদালের বৈশিষ্ট্য এই, সে যখন মাটি কাটে তখন কোন শব্দ হয় না। হলেও যেটুকু হয় ঠগী ছাড়া তা আর কেউ শুনতে পায় না। সর্বশেষ, এ কোদাল যাদুকর। যেখানেই রাখা যাক তাকে বহনকারী যদি ডাকে তবে নিঃশব্দে সে তার হাতে উঠে আসবে। এমনকি কুয়োর তলায় রাখলে সেখান থেকে পর্যন্ত !

—তোমরা কি কেউ তা দেখেছ? সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন

—ঠিক নিজের চোখে দেখিনি বটে, তবে ঘটনাটা সত্য বলে জানবে সাহেব। ডাক শুনে 'কাস্‌সি' উঠে আসছে এ দৃশ্য আমরা

কেউ দেখিনি হয়ত, কিন্তু আমরা প্রত্যেকে দেখেছি রাত্তিরে যে 'কাস্‌সি' কুয়োর জলে ফেলে রাখা হয়েছিল সকালে সে নিজেই ডাঙায় উঠে এসেছে। এমনকি একই কুয়োয় নানা দলের কাস্‌সি রাখা হলেও তারা নিজ নিজ দল চিনে নিজের মানুষের হাতে চলে যাচ্ছে।

শুনে সাহেব হেসেছিলেন। আজ হয়ত আমরাও হেসে উঠব। কিন্তু তাহলেও বিশ্বাসের এই কাহিনীগুলো শোনা দরকার। কেননা, নয়ত ঠগীদের বোঝা যাবে না।

যাত্রার আগে আরও একটি অনুষ্ঠানের রেওয়াজ ছিল ওদের মধ্যে। সেদিন দেবীর নামে একটি পাঁঠা কাটতে হবে। নিখুঁত কালো অথবা সাদা পাঁঠা। সেটিকে স্নান করিয়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে বেঁধে রাখা হবে। যদি দেখা যায় উৎসর্গিত প্রাণীটি শরীর কাঁপিয়ে জল ঝাড়ছে তবে মনে করতে হবে দেবী প্রসন্ন আছেন। সেটিকে কাটা চলবে। আর যদি পাঁঠাটি তা না করে তবে মনে করতে হবে দেবী তাকে নিচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে সাদা ভাতেই ওদের ভোজ সারতে হবে।

এই ভোজ হবে কোদাল-অনুষ্ঠানের মতই কোন রুদ্ধদ্বার কক্ষে। সেখানে বাইরের লোক তো বটেই, সব ঠগীরও বসবার অধিকার নেই। চুন আর হলুদ দিয়ে ঘরের মেঝেয় একটি চৌকো ছক কাটা হয়েছে। তার ওপর মাপে মাপে একটি পরিচ্ছন্ন কাপড় বিছিয়ে স্তূপ করে রান্না করা ভাত সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তার শীর্ষে নারকেলমালায় একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপটির বৈশিষ্ট্য এই, তাতে দু'টি পলতে, কিন্তু চারটি শিখা। পলতের দু'টি প্রান্তই জ্বলছে। সামনে ভাতের পাহাড়ের চাদরের ওপর রাখা হয়েছে পবিত্র-কোদাল। সেখানেই ভোজ বসবে। দৈবাৎ যদি কোন

বাইরের লোক এই প্রদীপ দেখে ফেলে, কিংবা যদি কোন কারণে হঠাৎ চাদরটিতে আগুন ধরে যায় তবে বছর ঘুরে আসার আগেই দলপতির মৃত্যু অবধারিত। ওরা তাই ভোজের দিনে অত্যন্ত সতর্ক। দেবী যদি পাঁঠাটি অনুমোদন করে থাকেন তবে তারা তার মাংসেই ভোজ করবে। ভোজশেষে ঘরের মেঝেতে সেই ছক ধরে একটি গর্ত করা হবে। শুধু মুণ্ডুটি বাদ দিয়ে পাঁঠার নাড়িভুঁড়ি চামড়া হাড়গোড় সব সেই গর্তে ফেলতে হবে। যারা প্রসাদ পেল তারা সেখানেই হাত মুখ ধোবে। তারপর গর্তটিকে বুজিয়ে লেপে পুছে সব চিহ্ন মুছে দিয়ে তুয়ার খুলবে।

সব কৃত্য শেষ হল। দল এবার যাত্রা করল। অনেক সময় পরিবার পরিজনদের দেখাশুনার জন্যে দলের তু' একজনকে গাঁয়ে রেখে যাওয়া হত। তারাও তাদের প্রাপ্য ভাগ পেত। অনেক সময় ছোট ছেলেদেরও সঙ্গে নেওয়া হত। কেননা, দেখাতেও শিক্ষা। তাছাড়া, আরও একটা সুবিধে আছে। ছেলেটা সঙ্গে থাকলে বাড়তি একটা ভাগ পাওয়া যাবে।

তবে তার চেয়েও বাবার মনে জরুরী চিন্তা ছেলের ভবিষ্যৎ। ছেলে বড় হচ্ছে, স্নেহাতুর পিতা চিন্তিত। তার জীবৎকালেই ছেলেটাকে পথ ধরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। নয়ত পরে কি হবে কে জানে ? জমাদারের বেটা হয়ত দলে একটু ঠাঁই পাওয়ার জন্যে এর-তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবে। সেটা মরা বাপের পক্ষে নিশ্চয় গৌরবের ঘটনা হবে না। কোন বাবাই তা মনে মনে কামনা করে না। ঠগীরাও না। তারাও পিতা।

ওরা তাই ছোট ছেলেদেরও সঙ্গে নিত। সাধারণত নিয়ম ছিল একমাত্র সাবালকদেরই সহযাত্রী হিসেবে সঙ্গে নেওয়া চলবে। কিন্তু কেউ সে নিয়ম বড় একটা মানত না। বারো তের বছরের

ছেলেদেরও তারা সঙ্গে নিতে ইতস্তত করে না। অবশ্য প্রথম যাত্রাতেই তারা সব বিদ্যা রপ্ত করে ঘরে ফিরতে পারত না। প্রথমবার তাকে শুধু দলে রাখা হত মাত্র। খুনের কিছুই সে জানতে পারত না, জানতে দেওয়া হত না। শুধু দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবার নেশাটা মনে ধরিয়ে দিয়েই ঘরের ছেলেকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হত ঘরে। ওরা সেই বয়সেই পথকে ভালবাসতে শিখত। কেননা, প্রথম যাত্রায় যত দৈহিক শ্রম, তার চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ। ছোটদের কক্ষনো ওরা নিজেদের সঙ্গে পায়ে হাঁটাত না। তারা ঘোড়ার পিঠে থাকত। তাছাড়া, ফেরার পথে তাদের সঙ্গে থাকত নানা উপহার। অবশ্য তারই ভাগের পয়সায় কিনে দেওয়া। কিন্তু ছেলে সে খবর জানত না। বাবা এবং তার বন্ধুদের দেওয়া জিনিষগুলোই তার কাছে এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। ঘুরে ঘুরেই মাকে সে তা দেখায়।

দ্বিতীয় যাত্রায় স্বভাবতই ওদের জ্ঞানের পরিধি আরও একটু বাড়ে, ওরা জানতে পারে তার বাবা লুঠ করে, কিংবা হয়ত বা ডাকাতি। কেউ কেউ বাতাসে খুনের গন্ধও পায়। কিন্তু নিজের চোখে খুন দেখার সৌভাগ্য আসে আরও পরে—তৃতীয় যাত্রায়। নিজের হাতে রুমাল তুলে নেবার গৌরব যদি পেতে চায় কেউ তবে তাকে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু কাল।

শুধু বংশ পরিচয়ই যথেষ্ট নয়, তার আগে ঠগীর ছেলেকে তার সাহসিকতা এবং নিষ্ঠারও কিছু কিছু পরিচয় দিতে হয়। যদি দেখা যায় ছেলেটি সত্যিই সাহসী এবং বিশ্বস্ত তবে দলপতি একটা দিন স্থির করবে। সেদিন কোন একজনকে গুরু মেনে তার কাছ থেকে দীক্ষা নিতে হবে।

মনোনীত ঠগী সেদিন স্নান করে একটি কোরা কাপড় পরে গুরুর হাত ধরে আস্তানা ছেড়ে চলে যাবে। সঙ্গে যাবে দলপতি এবং

দলের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা। বাইরে এসে গুরু উর্ধ্বলোকের দিকে দু'হাত তুলে বলবে, মা ভবানী! তুমি তোমার এই নতুন দাসকে গ্রহণ কর। তুমি প্রসন্ন হও, তাকে আশীর্বাদ কর।

ওরা ভবানীর উত্তরের জন্যে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। এমন সময় গাছের ডাল থেকে অদূরে কোথাও যদি কোন প্যাঁচা ডেকে ওঠে তবে গুরু চেঁচিয়ে উঠবে—জয় ভবানী! ভবানী মাঈ কি জয়! মা প্রার্থনা শুনেছেন, তিনি তোমাকে গ্রহণ করেছেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব—শপথ গ্রহণ। আস্তানায় ফিরে আসার পর ছেলেটির হাতে মন্ত্রপূত কোদালটি তুলে দিয়ে এক টুকরো কাপড়ে সেটি ঢেকে দেওয়া হবে। তারপর তাকে বলা হবে শপথ নিতে। সে যে গোপনীয়তা রক্ষা করবে, আদর্শনিষ্ঠ থাকবে এবং দলের স্বার্থ রক্ষা করবে, হাতে কোদাল রেখে গুরুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাই তাকে বলতে হবে। ছেলেটি যদি মুসলমানের ছেলে হয় তবে আবার তাকে কোরাণ হাতে নিয়ে একই প্রতিজ্ঞা শোনাতে হবে। হিন্দুর ছেলে হলে গঙ্গাজল ছুঁয়ে।

প্রতিজ্ঞা-পর্ব শেষে প্রসাদ গ্রহণ। গুরু এবার তার হাতে একটুকরো মন্ত্রপূত গুড় তুলে দেবে। তা মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে নতুন স্বাদ আসবে, একটি সুস্থ সমর্থ তরুণের অভিষেক সম্পূর্ণ হবে, সে ঠগী হয়ে যাবে। এবার বাকী শুধু হাতে-কলমে খুনের দীক্ষা।

শিক্ষা আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। দলের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে মনে মনে খুন বহুদিন রপ্ত হয়ে গেছে। শুধু মনে নয়, চোখেও। নানা ভূমিকায় নানা ভাবে সে তাতে অংশও নিয়েছে। বাকী ছিল শুধু নিজের হাতে রুমাল নেওয়া। এবার হাতে তাই তুলে দেওয়া হচ্ছে।

হয়ত তৎক্ষণাৎ কোন সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে অবশ্যই দু'চার দিন অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া, নতুন শিকারীর হাতে যে কোন

শিকার তুলে দেওয়া যায় না। তার আগে কিছু কিছু বিবেচনার বিষয় আছে। যাত্রীরা যেখানে দলে খুব বড় বা বলবান সেখানে তাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। যাকে লক্ষ্য করে তাকে ছাড়া হবে সে মানুষটি যদি তুলনায় বেশী জোয়ান বলে মনে হয় তবে সেক্ষেত্রেও তাড়াহুড়ো করে বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। তার চেয়ে গুরু অনেক বেশী বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে, যদি সে কোন বৃদ্ধ, দুর্বল বা নিঃসঙ্গ পথিকের অপেক্ষায় আরও ক'দিন সময় চায়।

সেদিন গুরু তার নতুন শিষ্যকে নিয়ে কোন নির্জন বৃক্ষতলে এসে দাঁড়াবে। অদূরে আস্তানার সামনে আর একটি গাছের নীচে বসে আছে দলের অন্যরা। তাদের ঠিক মাঝখানটিতে বসে একজন বলহীন নিঃসঙ্গ দূরের যাত্রী। হয়ত তিনি বিদেশে কাজ সেরে ঘরে ফিরছেন, হয়ত বা কোন দূর দেশে থাকে তাঁর ছেলে বা মেয়ে, বৃদ্ধ তাকে দেখতে চলেছেন। ওরা তাঁকে ঘিরে বসে গল্প করছে, তামাক খাচ্ছে। গুরু শিষ্য অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ কা কা করতে করতে একটা কাক ওদের মাথার ওপরে ডাল বদল করল। সঙ্গে সঙ্গে অনুচ্চ গলায় গুরু চেঁচিয়ে উঠলেন—জয় ভবানী!

বোঝা গেল ভবানীর অনুমতি আছে। সুতরাং আর দেরী নয়, গুরু নিঃশব্দে রুমালটা বের করে দু'ভাগে ভাঁজ করল। মনোযোগ দিয়ে তাতে একটা গিঁঠ গড়ে তুলল। তারপর রুমালের এক প্রান্তে একটা রুপোর টাকা বেঁধে রুমালটা শিষ্যের হাতে তুলে দিল। শিষ্য ধীরে ধীরে শিকারের দিকে এগিয়ে গেল।

দলের অন্যরা এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় ছিল। একজন 'ঝিরণী' দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা নিয়ে খুনী ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের ওপর। আজ তাকে কাঁপলে চলবে না, ভাবলে চলবে না। আজ তার পরীক্ষার দিন। মুহূর্তে বৃদ্ধের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী রুমালটি হাতে নিয়ে আবার

গুরুর সামনে এসে দাঁড়াল। সে গুরুকে প্রণাম করল। তারপর
ধীরে ধীরে রুমালের কোণ থেকে টাকাটি খুলে তার হাতে দিল।

এ টাকায় ভোজ হবে। গুড়ের ভোজ।

—এভাবে খুন করতে, এই কাঁচা বয়সে খুন দেখতে ভয় পেতে না
তোমরা? জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ফিরিঙ্গীয়াকে। ফিরিঙ্গীয়া উত্তর
দিয়েছিল, না, দ্বিতীয় বা তৃতীয় যাত্রায় সাধারণত কেউ ভয় পেত না।
অবশ্য খারহোরার কথা স্বতন্ত্র।

—খারহোরা আবার কে? ঘটনাটা শোনার জন্যেই আবার প্রশ্ন
করেছিলেন বিদেশী রাজপুরুষ।

—সে প্রায় বারো বছর আগেকার কথা, ফিরিঙ্গীয়া বলে চলল,
সেবার আমন সুবাদার আমাদের দলের সঙ্গে ওমরাওয়ের চৌদ্দ বছরের
ভাই খারহোরাকেও নিয়েছিল। জীবনে ঠগীর বাচ্চার সেই প্রথম
বাইরে বের হওয়া। আমন সুবাদার তার দায়িত্ব দিয়েছিল তার
নিজের ছেলে হারসুকার ওপর। সে ওর সমবয়সী হলেও এরই মধ্যে
তিন তিনবার আমাদের দুনিয়া ঘুরে ফিরে দেখে গেছে। বাপের
হুকুম মত বন্ধুকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে সে তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে

চলতে চলতে পথে পাঁচজন শিখের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঠিক
হল পরদিন ভোরেই 'ঝিরনী' দেওয়া হবে। হারসুকাকে বলে দেওয়া
হল, সে যেন খারহোরাকে সঙ্গে নিয়ে পেছনের দিকে থাকে। এমন
জায়গায়, যেখান থেকে কিছুই দেখা যাবে না, বড়জোর কিছু কিছু
কথাবার্তা শোনা যাবে।

কে জানে ছেলেটির মনে কি করে সন্দেহ ঢুকল, সে চঞ্চল হয়ে
উঠল। 'ঝিরনী' কানে আসা মাত্র সে হারসুকাকে পেছনে ফেলে
ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে আমাদের সামনে এসে হাজির। আমরা
তখন নিজেদের কাজে মত্ত। সে দৃশ্য দেখে ছেলেটি ভয়ে থরথর
করে কাঁপতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়ার পিঠ থেকে

মাটিতে পড়ে গেল। আমরা ছুটে গিয়ে ওকে ধরলাম। কিন্তু ততক্ষণে ছেলে প্রলাপ বকতে স্থরু করেছে। সে কাঁপছে আর বিড় বিড় করে কি যেন সব বকছে। কেউ তাকে ছুঁলে বা কিছু বোঝাতে গেলে তার কাঁপুনি আরও বেড়ে যায়, সে গলা চড়িয়ে প্রলাপ বকে।

আমন আর আমি ওকে নিয়ে বসে রইলাম। নানাভাবে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খারহোরার কিছুই যেন কানে পৌঁছাল না। তার প্রলাপের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে লাগল। সন্ধ্যার আগেই সে চিরকালের মত আমাদের দল ছেড়ে চলে গেল। আঃ, একটা ছেলের মত ছেলে ছিল খারহোরা!—বলতে বলতে ফিরিঙ্গীয়ার চোখ ভরে জল এল। সে হাতের উল্টো দিকটায় চোখ মুছতে মুছতে বলল, প্রথম যাত্রায় বহু ছেলেকে ভয় পেতে দেখেছি হুজুর, কিন্তু ঠগীর বাচ্চা কখনও খুনে এমন ভয় পায় তা খারহোরাকে না দেখলে আমি কোনদিন বিশ্বাস করতে পারতাম না। ছেলেটা যেন ওর মধ্যে ছিল না। একদম মায়া নেই বেটার, আমাদের কাঁদিয়ে সে চলে গেল।

—আর তার বন্ধু?

—সে আর কি করবে? হারস্থকা তার এই দোস্তকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসত। সে আর দলে থাকতে পারল না। সেদিনই দল ছেড়ে পালিয়ে গেল। এখন সে বৈরাগী। বিবাগীর বেশে নানা দেশ ঘুরে নর্মদার ধারে এক মন্দির গড়েছে, সেখানেই সে থাকে।

আকাশজোড়া কালো মেঘে এমন রুপালী রেখাও মাঝে মাঝে দেখা যেত বটে, কিন্তু সে দৈবাৎ। সেটা ওদের জীবনের নিয়ম নয়। চিরকালের পিতার মতই ঠগী বাপও আপন সন্তানকে ভালবাসত। স্বামী ভালবাসত স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে; ছেলেমেয়ে মা-বাবাকে। কিন্তু সে তাদের আপন জগতে। সেখানে ওরা আনন্দে হাসে, দুঃখে কাঁদে; মানুষ মানুষকে ভালবাসে, ভয় পায়, ঘৃণা করে। কিন্তু সে মানবিক

প্রবৃত্তিসমূহ কখনও অচেনা পথের মানুষের জন্যে নয়। সেখানে পঞ্চ শিখের লুণ্ঠিত দেহ দেখে মূর্ছা যাওয়া চৌদ্দ বছরের বালকের পক্ষে স্বাভাবিক জীবন নয়। বন্ধুর জন্যে বিবাগী হয়ে দেশান্তরী হয়ে যাওয়াও প্রতি দিনের ঘটনা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী স্বাভাবিক, অনেক বেশী সত্য পথের অবশিষ্ট ইতিহাস, যেখানে ওরা পিতা-পুত্র, ভাই-বন্ধু, সবাই খুনের নামে আনন্দিত পথিক, অন্তরঙ্গ সহযাত্রী।

দল পথে নামল।

বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর প্রথম সাতদিন ওদের মুখের দিকে তাকালে মনে হবে যেন কোন সাধক দল। আলুথালু বেশ, এলো-পাথারি ছাঁদহীন গোঁফ দাড়ি, ক্লান্ত চোখমুখ। সাতদিন তাদের মাছ-মাংস বারণ, ক্ষুর কাঁচি হাতে নেওয়া বারণ। তারা শুধু ডাল-তরকারি খাবে, আর গুড়। তাও বাড়ী থেকে বের হওয়ার পরক্ষণেই যদি কারও মাথা থেকে পাগড়ী পড়ে যায়, কিংবা অসাবধানে কারও পাগড়ীতে আগুন ধরে যায়, তবে গোটা দলকে আবার ঘরে ফিরতে হবে; সাতদিন ঘরে থেকে আবার নতুন করে যাত্রা করতে হবে।

পথে নানা রকমের বিধিনিষেধ। যাত্রার আগে একজন পথের মোড়ে গিয়ে দাঁড়াবে। যদি তখন কোন টিকটিকি 'টিক' 'টিক' করে ওঠে কিংবা পথের বাঁ দিকে কোন জ্যান্ত গাছের ডালে বসে কাক ডেকে ওঠে, কিংবা ডাইনে ডালে ঘুঘু অথবা যদি কোন বাঘ চোখে পড়ে যায় তবে যাত্রা শুভ। শুধু শুভ নয়, ঠগী জানবে দুয়ার থেকে অদূরেই মনের মত শিকার মিলবে।

আর যদি দেখা যায় সামনে সাপ কিংবা খরগোস রাস্তা পার হচ্ছে, মরা ডালে বসে কাক ডাকছে অথবা প্যাঁচা, তবে যাত্রা অশুভ। সে ক্ষেত্রে ঠগী মনের মানচিত্রে রাস্তা বদল করবে, সে অন্য রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াবে। সেখানে যদি দেখা যায় কোন গাধা শুয়ে

শুয়ে গান গাইছে, কোন শেয়াল জোড়া বেঁধে ডাইনে থেকে বাঁয়ে অথবা বাঁয়ে থেকে ডাইনে রাস্তা পার হচ্ছে, তাহলে তাকে প্রাণীজগত ছেড়ে অন্য কোন উপায়ে পথ-নির্দেশ খুঁজতে হবে। কোথাও কোথাও সে কাজে ঠগীরা জুয়াখেলার ঘুঁটির মত এক ধরনের ঘুঁটি ব্যবহার করত। চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে তারা ঘুঁটিগুলোকে একটা কৌটোয় ভরে নাড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিত। তারপর তার নিশানা গুনে পথ ধরত।

তবে যতদূর মনে হয়, সর্বত্র এ ব্যবস্থা চালু ছিল না। সাধারণ-ভাবে পশু পাখী ইত্যাদির আচরণই ছিল ঠগীর গণক ঠাকুর, পাঁজি-পুঁথি। সেখানে শুভ-অশুভের বিরাট ফর্দ। শুভ ঃ ডাইনে থেকে বাঁয়ে চলেছে এমন কোন নিঃসঙ্গ শেয়াল, ডাইনে দাঁড়িয়ে গান গাইছে এমন কোন গাধা ইত্যাদি। অশুভ ঃ পরিবারে কারও জন্ম, মৃত্যু বা বিবাহ হচ্ছে এমন দিনে ঘর ছাড়া, অকালে বর্ষা নামা, বাড়ী থেকে বের হয়েই কোন কুকুরের মুখে নিজেদের বলি দেওয়া পাঁঠার মুণ্ডুটি আবিষ্কার করা ইত্যাদি।

এছাড়াও অনেক নির্দেশ আছে ঠগীর বচনে। যথা ঃ—

'রাতে বোলে তিতওয়ারা
দিন কো বোলে শিয়ার,
তুজ চৌলি ওয়া দেশরা,
নৌহিন পুরী আচানুক ধা।'

অর্থাৎ রাতে যদি ঘুঘু ডাকে কিংবা দিনে শেয়াল, তবে হে ঠগী, ত্বরিৎ সে মুল্লুক ছেড়ে যাও, নয়ত সমূহ বিপদ।

—তোমরা কি এসব বচনের সত্যাসত্য পরখ করে দেখেছ? জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এক ঠগীকে। ১৮৩০ সনের ৭ই অক্টোবর গভর্ণমেণ্ট গেজেটে জনৈক পত্রলেখকের জবানীতে তার উত্তরটা ছাপা হয়েছিল। ফেনি পার্কাস তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে সে ঘটনাটি আবার উল্লেখ

করেছেন। জনৈক প্রবীণ ঠগী সেখানে তার নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে পথে পথ-সঙ্কেত অমান্য করা প্রসঙ্গে বলছে, তার মর্ম :

ওর জোয়ান বয়সের কথা। সেবার ওরা পঞ্চাশ জনের একটি দল ইন্দোর থেকে ওজিয়া চলেছে। পথে যেখানটায় এসে সন্ধ্যে হল সেখানে কতকগুলো খেজুর গাছ ছাড়া আর কিছু নেই। ওরা সেখানেই যে যার বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। রাত তখন দুটো এমন সময় দলের একজনের কানে এল খেজুরের পাতায় বসে ঘুঘু ডাকছে। সে তক্ষুনি সবাইকে ডেকে তুলে ফেলল। রাতে ঘুঘু! ভয়ে ওদের প্রত্যেকের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তাহলেও বসে চিন্তা করার সময় নেই, দলপতি হুকুম দিল, এক্ষুনি এ জায়গা ছাড়তে হবে!

কোথায় গেল ঘুম, কোথায় বিশ্রাম! মাঝ রাত্তিরেই ওরা আবার পথে নামল। কিন্তু লাভ হল না। রাত ভোর হওয়ার আগেই ঘুঘুর বচন ফলে গেল। একদল ঘোড়সওয়ার ওজিয়া থেকে ইন্দোরের দিকে যাচ্ছিল। পলায়মান ঠগীর দল তাদের নজরে পড়ে গেল। কিছুতেই তাদের ফাঁকি দেওয়া গেল না। ঘোড়সওয়ারেরা ওদের ধরে আবার ইন্দোর নিয়ে গেল।

দিন কয় আগে ওরা সেখান থেকে এসেছে। আসবার পথে জনাকয় মানুষকে খুনও করেছে। তখন জানা ছিল না যাঁদের ওরা খুন করে এসেছে তাঁদের দলপতিটি আর কেউ নন, তিনি স্বয়ং হোলকার পরিবারের এক গুরুদেব। বাদবাকী মানুষগুলো তারই অনুচরবর্গ। গুরুর নিরুদ্দেশের কথা কানে আসা মাত্র হোলকার চারদিকে ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছেন, যেখান থেকে পার, খুনীদের ধরে আনতে হবে। তারা পথে পথে যাকেই পাচ্ছে তাকেই ধরে নিয়ে রাজ সরকারে হাজির করছে! সেদিক থেকে ভয়ের কিছু ছিল না, ওরাও অনায়াসে শেষ পর্যন্ত নির্দোষী সেজেই থেকে যেতে পারত।—কিন্তু রাতে ঘুঘুর

ডাক! তা আর হল না, ওরা হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। আর ধরাও পড়ল এক অদ্ভুত উপায়ে।

গুরুদেবের লটবহরে অন্যান্য জিনিষের মধ্যে একটি পোষা তোতাও ছিল। সাধারণত কোন ঠগীর এসব জিনিষে লোভ হয় না। কিন্তু কপালে মরণ লিখেছে, তোতাটা দলপতির মনে ধরে গেল। খাঁচাটা এক পাশে সরিয়ে রাখল।

সেই থেকে পাখিটা তার কাছে কাছেই থাকত। আদর করে জমাদার তাকে খাওয়াত, নিজের বুলি শেখাবার চেষ্টা করত। কিন্তু তোতা যেন বোবা। সে কিছুতেই মুখ খোলে না। জমাদার বলত—খুলবে, খুলবে; দুটো দিন যেতে দাও!

খুলল বটে, কিন্তু সে একেবারে সেই হোলকারের দরবারে গিয়ে। তার চেঁচামেচি দেখে ওরা স্তম্ভিত। বাড়ীর মেয়েরা পাখিটাকে চিনে ফেলল। তারা সমস্বরে বলল, গুরুদেবের পাখি! ব্যস হয়ে গেল! হোলকারের আদেশে জমাদারসহ দলের পঁয়ত্রিশ জনকে সেদিনই কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হল!

তারপরও কি বলা চলে রাতে ঘুঘুর ডাক বিফলে যায়?

একই কাহিনী শোনা গিয়েছিল নাসির জমাদারের মুখে। স্লীম্যান তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের তো পথে অনেক নিয়ম। আচ্ছা, এমন ঘটনা কি মনে পড়ে যখন নিয়ম মাননি বলে তোমাদের কোন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে?

—হ্যাঁ হুজুর! উত্তর দিয়েছিল নাসির। জেনারেল ডভেটন সাহেব তখন ঝালনায় ফৌজ নিয়ে লড়াই করতে এসেছেন। আমরা সতেরজনের একটি দল তাঁর সিরকির দিকে চলেছি। হঠাৎ দেখি আমাদের সামনা দিয়ে একটা খরগোস চেঁচাতে চেঁচাতে রাস্তা পার হচ্ছে। আমরা একবার ভাবলাম রুখে যাই, আর একবার ভাবলাম, দূর, তার চেয়ে একবার দেখাই যাক না কি হয়। কি বলব হুজুর,

এত তাড়াতাড়ি তা দেখতে হবে তখন সে কথা ভাবতেও পারিনি। পরদিন সকালেই আমাদের সতের জনের গোটা দলটি ধরা পড়ে গেল। ভাগ্যিস, দলে কারও সঙ্গে বামাল ছিল না! জিনিষপত্র সব অন্য আর এক দলের সঙ্গে ছিল। তারা অন্য পথে যাচ্ছিল। তাহলেও, ধরা পড়ার ঝামেলা কি কম! আমি বলতে পারি হুজুর, এই ঝামেলা আমাদের পোহাতে হত না, যদি খরগোস দেখে আমরা পিছিয়ে যেতাম!

ঠগী শুধু খুনী নয়, ঠগী এক বিচিত্র বিশ্বাসও। ওদের চারদিক দেখেশুনে পথে নামতে হয়, চোখ-কান খোলা রেখে পথ চলতে হয়।

৬

দিনের পর দিন ওরা হাঁটছে। মাসের পর মাস।

হাঁটতে হাঁটতে ছোট ছোট দলে ভেঙ্গে পড়ছে। একদল চলে যাচ্ছে ডাইনে, একদল বাঁয়ে। কেউ পূবে, কেউ পশ্চিমে। কেউ ঘোড়ার পিঠে, কেউ পায়ে পায়ে। টুকরো টুকরো এক-একটি দল যেন এক-একটি মাকড়সা। আপন মনে জাল বুনে চলেছে। সে জালের কোন সুতোয় একটি মাছি পড়লেও গোটা জাল আন্দোলিত হয়ে উঠবে।

অবশ্য শিকারের সময়ও কিছু কিছু নিয়ম মেনে চলতে হত ওদের। ঠগীরা খুনী হলেও তারা বিশ্বাসহীন 'ম্যাকফানসা' নয়। তাদের রীতিনীতি সুসংগঠিত যে কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতই সুনির্দিষ্ট। নিষ্ঠুরতম খুনীরও তা অমান্য করার কোন অধিকার নেই।

ওদের সুবর্ণযুগে নিয়ম ছিল, নর্মদার উত্তর থেকে পশ্চিমে সিন্ধু এবং উত্তরে যমুনার মধ্যবর্তী যে বিশাল হিন্দুস্তান, সেখানে নিজ থেকে জালে এসে ধরা দিলেও কায়স্থ, ফকির, কামার, কুমোর, ছুতোর মিস্ত্রী, গানের ওস্তাদ, নাচের মাস্টার বা গৃহপালিত গরু-মোষ নিয়ে রাস্তা হাঁটছে এমন কোন পথিককে হত্যা করা চলবে না। তার চেয়েও আদিতে জরুরী নির্দেশ ছিল স্ত্রীলোক অবধ্য।

কিন্তু পরবর্তীকালে ঠগীরা এত সব মানত না। বিশেষ করে দক্ষিণী ঠগীরা। যুগের আবিলতা সেদিন তাদের পথের আচারেও।

সরকারী হিসেব থেকে জানা যায়, ১৮২৬-২৭ সনে মালবে এবং রাজপুতানায় ওদের হাতে মোট দু'শ এগার জন প্রাণ দেন। তাদের মধ্যে ছ'জন ছিলেন নারী। পরের বছর বেরার, খান্দেশ এবং গুজরাটে মারা গিয়েছিলেন তিন শ' একাশি জন; তাদের মধ্যে নারী ছিলেন একুশ জন। তার পরের বছর (১৮২৮-২৯) মালবে এবং খান্দেশে আবার প্রাণ দিয়েছিলেন দু'শ বত্রিশ জন; তাদের দলেও ছ'জন ছিলেন নারী। তার পরের বছরগুলোতেও গোয়ালিয়রে, বুন্দেলখণ্ডে, বরোদায় এবং গুজরাটে নিহতদের তালিকায় নারীর সংখ্যা ছিল যথেষ্ট।

হিসেবটা সামনে রেখেই জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বিখ্যাত ঠগ দলপতি ফিরিঙ্গীয়াকে।—তবে না তোমরা হিন্দুস্তানী ঠগীরা জেনানাদের ওপর হাত তোল না!

—আজ্ঞে, সেই তো আমাদের কাল হল। ফিরিঙ্গীয়া লজ্জায় ঘাড় হেঁট করেছিল,—কালীবিবিকে ফাঁস দিলাম তো আমাদের দিন ফুরোতে স্থরু করল।

—কে সেই কালীবিবি?

—সাহেব, কালীবিবি ছিলেন হায়দ্রাবাদের এক খানদানী ঘরের জেনানা। দেখতেও নাকি খুবই খাপস্থরত ছিলেন তিনি। একটা জড়ির চাদর সঙ্গে নিয়ে এলিকপুর থেকে হায়দ্রাবাদে যাচ্ছিলেন তিনি। যাওয়ার কথা ছিল তাঁর নবাব দৌলা খাঁয়ের বাড়ি। দৌলা খাঁ হায়দ্রাবাদের সালবৎ খাঁর ভাই। বিবির সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল তিনিই জানতেন। মাত্র দু'দিন আগে তিনি মারা গিয়েছেন। খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিবি ছুটলেন তাঁর কুঠির দিকে। মনে ইচ্ছে ছিল, আপন মানুষের কবরে নিজের এই চাদরখানা দিয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসবেন। কিন্তু তা আর হল না। সমসের খাঁ আর গোলাপ খাঁ চাদরের লোভে পথে খুন করে বসল ওঁকে।

—তাতে কি তক্ষুনি কিছু অমঙ্গল হল ?

—না সাহেব। পাঁচ বছর কিছু হল না। আমরা ভাবলাম, বোধহয় এখন এইটেই নিয়ম হয়েছে। কালে কালে সব আইনই তো কিছু কিছু বদলায়। আমরাও তাই নেমে পড়লাম, আর সেই হল, সাহেব, আমাদের কাল।

সাহেব ধমকে উঠলেন, তোমরা তো আরও নীচ। দক্ষিণীরা নারী হত্যা করে, কিন্তু তোমরা তো শুনেছি সুন্দরী মেয়েদের পর্যন্ত খাতির কর না।

—আলবৎ না! আপত্তি জানাল ফিরিঙ্গীয়া।—সাহেব, তুমি ভাবতেও পারবে না। আমন সর্দার আর আমি কি গোলাপ হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি। তিনিও ছিলেন খানদানী জেনানা, পেশোয়া বাজীরাওয়ের খাস বাগিচার ফুল। সে আজ প্রায় তের বছর আগেকার কথা। ফিরিঙ্গীয়া বলে চলেছে, আমরা দেড়শ' ঠগের একটি দল রাজপুতানার মধ্য দিয়ে চলেছি। চলতে চলতে হঠাৎ সামনে এক ঝালরওয়ালা পাল্কী। সঙ্গে জনাকয় দাসদাসী। দেখে আমাদের আনন্দ আর ধরে না। পোড়া দেশে তাহলে মেঘও আছে!

মেঘ নয় সাহেব, সে তোমায় কি বলব!—ফিরিঙ্গীয়ার চোখগুলো বলতে বলতে জ্বলে উঠেছিল,—ঝালর যখন উঠল তখন দেখা গেল মখমলের আড়ালে লুকিয়ে আছে আগুন। সে আগুনে চোখ পড়লে যে কোন মরদ ছাই হয়ে যায়! আমন আর আমি এগিয়ে গিয়ে সালাম জানালাম। বিবি হাসলেন। সে হাসিতে যেন গুড় মাখান। ধীরে ধীরে আলাপও হল। তিনি পুনা থাকেন। এই পথে কানপুর চলেছেন। সেখানে মাস কয় থেকে আবার পেশোয়ার দরবারে ফিরে আসবেন। আমরা মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, গায়ে তাঁর যা জেওরপাতি রয়েছে তার দাম হবে কমপক্ষে লাখ টাকা।

সঙ্গের মালপত্র যা আছে তাতে পাওয়া যাবে আরও আধ লাখ টাকা! কিন্তু সাহেব, শুনলে অবাক হয়ে যাবে, তবুও এই ফিরিঙ্গীয়ার গলায় কিছুতেই ঝিরণী উঠল না।

পুরো তিন দিন তিন রাত্তির আমাদের হাতের মুঠোয় ছিল ওঁর পাল্কী। আমন বলেছে, আর দেরী করে লাভ কি? আমি উত্তর দিয়েছি, সবুর, আর একটা দিন। তিন দিন পরে আমনকে আর ফাঁকি দেওয়া গেল না। সে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার বল দেখি। আমি বললাম, সাচ্ বলব? এই জেনানাটিকে আমি দিল দিয়ে ফেলেছি। আমন বলল, আমিও।—বিশ্বাস করবে না সাহেব, সেদিনই আমরা পথ বদল করেছিলাম। দেড়লাখ টাকার জিনিষ হাতে পেয়েও অন্য পথে পা বাড়িয়েছিলাম। কেন জান? শুধু ছু'টি চোখের জন্যে। এমন মিষ্টি মুখ জীবনে আর কখনও চোখে দেখিনি। এমন মিঠে বুলিও আর কখনও শুনিনি।

সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন ফিরিঙ্গীয়ার মুখের দিকে। শত শত খুনের ইতিহাস যার হাতে তার বুকের আড়ালে তা হলে এমন মনও থাকতে পারে? থাকে? তিনি আবার প্রশ্ন তুললেন, মোগলানীকেও তো তুমি ভালবেসেছিলে, কিন্তু কই, তাকে তো তুমি ছেড়ে দাওনি!

—সে তুমি বুঝবে না সাহেব, মোগলানী যে মরল সে তার নসিব। আমারও। তাছাড়া, আমি ওকে মারিনি। মেরেছে মুসলমানেরা। এই মাদার বক্স আর তার দলের লোকেরা। আমি সঙ্গে ছিলাম মাত্র।

—সে কথা কি ঠিক?

—হ্যাঁ, হুজুর। উত্তর দিল আর একজন ঠগী। তার নাম তুর্গা। সে বলল, আগের ঘটনা আমার জানা নেই হুজুর, তবে লালসোন্তে যা হয়েছে সবই আমার চোখের সামনে। ফিরিঙ্গীয়া নীরব। তার সামনে দাঁড়িয়ে তুর্গা বলে চলল:

আমরা লালসোন্তে এসে দেখি ফিরিঙ্গীয়া সেখানে সদলবলে হাজির। সঙ্গে তার এক পরমাসুন্দরী কন্যা। ফিরিঙ্গীয়া বলল, মোগলানী। দেখেই বোঝা যায় বড় ঘরের মেয়ে। নিজে চলেছে পাল্কীতে। সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে আর এক জেনানা। তাঁর পার্শ্বচারিকা। সে অবশ্য তরুণী নয়, বুড়ি। কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, পথে সে এই প্রথম নয়। মোগলানীকে নিয়ে মাঝে মাঝেই তাকে এমনি ঘর ছেড়ে বের হতে হয়। মনিব তার রাজধানীতে রাজধানীতেই ঘুরে বেড়ায়। এই বুড়ি ছাড়াও বিলাসিনীর সঙ্গে ছিল ছ'জন পাল্কী-বেহারা আর একজন ভৃত্য। ফিরিঙ্গীয়াকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, দিন ঠিক হয়েছে? ফিরিঙ্গীয়া উত্তর দিল, না, বোধহয় দরকার হবে না।

লালসোন্ত থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সোন্ত পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তখনও ফিরিঙ্গীয়ার সেই এক কথা, না, বোধহয় দরকার হবে না। আমিও একই কথা বললাম। মেয়েটির বয়স কম। তাছাড়া, সঙ্গে রূপ ছাড়া আর বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হয় না। এত বড় দল, জনপ্রতি দুটো টাকাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ! ওকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। কিন্তু ফিরিঙ্গীয়ার মাথায় কি খেলল সে-ই জানে। পরের দিন সন্ধ্যায় দক্ষিণীদের দেখা মাত্র সে 'বিয়াল' পছন্দ করতে লোক পাঠিয়ে দিল। হুকুম পেয়ে আমাদেরও তৈরী হতে হল। আমরা ভোর হওয়ার আগেই ওদের নিয়ে সেদিকে যাত্রা করলাম। কিন্তু অন্ধকারে ঠাওর করতে পারলাম না 'বিয়াল' যাওয়ার রাস্তা কোনদিকে, কোথায় ওরা জায়গা ঠিক করেছে। বাধ্য হয়েই মোগলানীর পাল্কী থামাতে হল। ওঁকে বললাম, মনে হচ্ছে, পথ ভুল করে ফেলেছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমরা ততক্ষণে রাস্তাটা একবার দেখে নিই। তাই না শুনে মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল। সে কাঁদতে সুরু করল। রেগে গিয়ে গালাগালি

করতে লাগল। কখনও বলছে, তোমরা ডাকাত, টাকার লোভে পথ ভুলিয়ে অসহায় মেয়েকে অন্ধকারে নিয়ে এসেছ। তোমরা আমাকে খুন করতে চাও। কখনও বলছে, তোমরা নরপশু, একাকী পেয়ে সুন্দরী নারীর ধর্মহরণ করতে চাও। সে কি কান্না! আমি ফিরিঙ্গীয়াকে গিয়ে বললাম, ভাই এই ব্যাপার, তোমার একবার ঐ পাল্কীর কাছে যাওয়া দরকার। মেয়েটি ভয় পেয়ে গেছে, কিছুতেই তাকে প্রবোধ দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ফিরিঙ্গীয়া যেন পাথর। কিছুতেই তাকে নড়ান গেল না। সেখানে বসে থেকেই সে হুকুম দিল, তাহলে এখানেই 'ঝিরণী' দিয়ে দাও! আমরা তাই করলাম। পুরো দলটিকে সেখানেই মাটি দিয়ে দিলাম।

—কত পেয়েছিলে?

—জিনিষপত্র সব মিলিয়ে শ' ছয়েক টাকা।

—তার জন্যে এমন একটি অসহায় রূপসীর প্রাণ হরণ করলে তোমরা?

দুর্গা জবাব দিল, সে দোষ আমাদের নয় সাহেব, তার জন্যে পুরোপুরি দায়ী ফিরিঙ্গীয়া।

—কেন তুমি এমন কাজ করলে? নীরব ফিরিঙ্গীয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন সাহেব।

—আগেই বলেছি সাহেব, সে আমার কপাল। ধীরে ধীরে জবাব দিল ফিরিঙ্গীয়া।—মোগলানী যে মরল সে তাঁরও কপালের লিখন।

—কেমন?

—বার বার আমি ওঁকে বলেছি, আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন না বিবিসাব। আপনি আপনার নিজের পথে চলে যান। মুসলমানরা তো এল সোস্তে। তার বহু আগে লালসোস্তে এসেই আমি ওঁকে বলেছিলাম, এবার আমার অন্য পথে যেতে হবে। সেখানে আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকবে। কি উত্তর দিয়েছিল জেনানাটি জান

সাহেব ? বলেছিল, বন্ধু ? আমি কি তোমার কেউ নয়। কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল মেয়েটি আমাকে ভালবেসে ফেলেছে। ডেকে ডেকে কথা বলত আমার সঙ্গে। বলত, তোমার যত সব বাজে লোকের সঙ্গে সঙ্গ। তুমি আমার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চল। কখনও ডেকে নিয়ে খেতে দিত আমাকে। কখনও পাল্কীর সামনে বসিয়ে বলত, গল্প বল। বুড়ি মাঝে মাঝে আপত্তি তুলত। বলত, হাজার হোক, পথের মানুষ। এতটা মাখামাখি ভাল নয়। মোগলানী বলত, গোটা দুনিয়াই তো সড়ক। কে এখানে চিরকাল থাকতে এসেছে ? বুড়ি কি বলেছে, সে কি উত্তর দিয়েছে, মোগলানী সবই আমাকে বলত। বলে খিল খিল করে হাসত। আমার ভয় হত। এক এক সময় মনে হত, আমিও বোধহয় ভালবেসে ফেলেছি ওঁকে। এখনও সময় আছে, আমার সাবধান হওয়া দরকার। লালসোস্তে এসে তাই আমি বললাম, বিবিসাহেবা, বিদায়। এই বান্দাকে এ কয়দিনে যা আপনি দিয়েছেন এক জনমের পক্ষে তা যথেষ্ট। আজ আমাকে ছাড়তে হবে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয় আমাদের আবার দেখা হবে। শুনে প্রথমে তিনি চুপ করে রইলেন। আমি দেখলাম তাঁর দীঘির মত চোখ দু'টি জলে টলটল করছে। তিনি বললেন, তা অসম্ভব। তোমাকে আমার সঙ্গে আগ্রা অবধি যেতেই হবে। যদি না যাও তবে আমি ঝঞ্ঝাট বাঁধাব।

—আগ্রা ?

—হ্যাঁ হুজুর। সেখানেই নাকি তাঁর ঘর। তিনি বললেন, দলবল সঙ্গী-সাথী বিদায় দাও। আমার সঙ্গে ঘরে চল। সেখানে আমরা সুখে থাকব। তোমারও কষ্ট হবে না। আমি বললাম, কিন্তু আমাকে যে ওদের সঙ্গে যেতেই হবে।—আমি তোমাকে যেতে দেব না। বলতে বলতে পাল্কী থেকে নেমে এসেছিলেন মোগলানী। নেমে আমার হাতটা চেপে ধরেছিলেন। আমি সামলে নিয়ে

বলেছিলাম, আচ্ছা, সে দেখা যাবে। সে রাত্তিরেই হুজুর, দুর্গাকে আমি বলেছিলাম 'ঝিরণী' দিতে। আমি ভেবে দেখেছিলাম, তাছাড়া উপায় নেই। যেভাবে দু'জনই আমরা এগিয়ে চলেছি তাতে আমিও হয়ত শেষ পর্যন্ত আগ্রা অবধি না গিয়ে আর পারব না।

—না হয় তাই যেতে! মন্তব্য করেছিলেন সাহেব।

—কিন্তু সে কি করে হয়? ফিরিঙ্গীয়া জাবাব দিল, মোগলানী মুসলমান, আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ। ওঁর সঙ্গে আমি ঘর করি কি করে? শুধু দিল নয়, ধর্ম বলেও তো একটা কথা আছে! চারদিক ভেবে তাই বললাম, দিয়ে দাও 'ঝিরণী'। ভগবান যদি করেন তো একদিন নিশ্চয় ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে! ভালোবাসা খাঁটি হলে মরণের পরেও তো তা হয়!

এ কাহিনী ব্যতিক্রম। কারণ, নায়ক ফিরিঙ্গীয়া এক বিচিত্র ব্যক্তিত্ব। অন্যদের সঙ্গে এসব রোমান্টিকতার কোন সম্পর্ক নেই। তারা খুন করতে বের হয়েছে, সুযোগ পেলেই খুন করবে। হোক না সে সুন্দরী অথবা রূপহীন; ধনী অথবা গরীব! একমাত্র বিবেচ্য দেবীর মত আছে কি নেই। কাক ডাকছে অথবা ডাকছে না। টিকটিকি 'টিক''টিক' করল কি করল না।

—ধর, এমন একজন লোককে তোমরা হাতে পেয়েছ যাকে দেখলেই বোঝা যায়, সঙ্গে তার কিছুই নেই। অথচ চারদিকে লক্ষণ সব খুনের অনুকূল। সেক্ষেত্রে তোমরা কি করবে? জিজ্ঞেস করেছিলেন স্লীম্যান,—লোকটিকে তোমরা ছেড়ে দেবে?

—ছেড়ে দেব? কভি নেহি! কভি নেহি! মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল দুর্গা। অন্য আর একটি দলের দলপতি নাসির সায় দিয়েছিল তার সঙ্গে,—ছেড়ে দেব কি করে সাহেব? সুলক্ষণ মানেই ঠগীর কাছে দেবীর আদেশ। লক্ষণ ঠিক আছে মানে খুন হতেই তিনি ওদের আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এমতাবস্থায় তাদের ছেড়ে

দেওয়ার অর্থ দেবীকে অমান্য করা। তাহলে কি তিনি আর কখনও আমাদের হাতে মানুষ তুলে দেবেন ?

ফিরিঙ্গীয়া আপত্তি জানাল। সে বলল, নাসির ঠিক বলেনি হুজুর। আমি অনেক সময় নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, গরীব পথিকদের ছেড়ে দিলে, পরে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। একই লক্ষণ তখন আঙ্গুল দিয়ে ভাল শিকার দেখিয়ে দেয়।

এনায়েত বলল, হক কথা। দেবী যা বলে পাঠিয়েছেন তা তো আর মিথ্যে হতে পারে না। তাঁর আদেশের গুণাগুণ থেকেই যাবে, তার কম-বেশী হওয়ার উপায় নেই, তা আমরা তক্ষুনি মানি আর নাই মানি। তবে আমারও মনে হয় গরীবদের ছেড়ে দিলে আখেরে ঠগীর সুবিধেই হয়।

সাহেব খাঁ আর এক দলপতি। সে বলে উঠল, কক্ষনো না। এসব তোমরা হিন্দুস্তানী ঠগেদের বাত্ কি বাত্। সাচ্চা ঠগের কানুনে বলে, পয়সা আছে কিনা বিচার করে কাউকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ দেবীকে অমান্য করা। তাতে পুরো যাত্রাটাই বিফল হতে বাধ্য। তোমরা যদি তারপর অনেক টাকাও পাও, তাহলে দেখবে শেষ পর্যন্ত সে টাকাও ভোগে লাগছে না। দেবীকে অমান্য করলে তার ফল তোমাদের পক্ষে কিছুতেই ভাল হতে পারে না।

—আমারও সেই কথা, সাহেব খাঁকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে এল মুরলী ; হাতে অচেনা মানুষ রয়েছে, সামনে শুভ লক্ষণ, এমতাবস্থায় কেউ কি কখনও কোন যাত্রীকে ছেড়ে দিতে পারে ? তাহলে, আমি হলপ করে বলতে পারি, সে দলের অমঙ্গল হতে বাধ্য। শুভলক্ষণ মানেই, কে না জানে, তা দেবীর হুকুম। ঠগী যদি হও তবে তা তামিল করতেই হবে !

সমর্থন পেয়ে এবার আরও প্রবল হয়ে উঠল নাসির।—আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমরা এই উদ্ভট যুক্তি কোথায় পেলে ? দেবীকে

অমান্য করবে, অথচ ফের দেবীর কাছ থেকে আরও ভাল ফল পাবে, তা কি কখনও হয়? আমরা দক্ষিণীরা তা কখনও ভাবতেও পারি না। আমাদের বাপ ঠাকুরদারা কখনও এমন আহাম্মক ছিল না।

দপ করে জ্বলে উঠল ফিরিঙ্গীয়া, তাহলে তোমরা বলতে চাও, যা বোঝ সব তোমরা তেলিঙ্গনাওয়ালারা! আমাদের মুরনাঈ আর সিন্দৌসির ঠগীদের বাপ-দাদারা কিছুই শেখায়নি!

না না, ঠিক সে কথা নয়,—এক সঙ্গে জবাব দিল নাসির আর সাহেব খাঁ,—আমরা শুধু বলতে চাই তোমরা বিচারে ভুল করছ। আমরা দক্ষিণীরা অন্তত মনে করি, দেবী আমাদের সামনে পথে যা দিলেন সবই গ্রহণ করার জন্যে; আমরা তা গ্রহণ করতে বাধ্য!

সুতরাং কেউ কেউ দৈবাৎ কখনও কোন ফিরিঙ্গীয়া অথবা এনায়েতের হাতে পড়লে ছাড়া পেত বটে, কিন্তু লক্ষণ যেখানে অনুকূল সেখানে অন্যদের একমাত্র ভবিষ্যৎ ছিল মৃত্যু। তা সে দলে যত মানুষই থাক কিংবা সময় যতই লাগুক।

যদি দেখা যায় পথচারীরা দলে বেশী ভারী তবে বিচক্ষণ দলপতি সেই মাকড়সার জালটিতে হাত রাখবে, নিঃশব্দে একটি সুতো ধরে টানবে। রাত ভোর হতে না হতেই দেখা যাবে নতুন পথের বাঁকে আপন মনে চলেছে আরও একদল পথিক। ক্রমে তাদের সঙ্গে আলাপ হবে, দল আরও বড় হবে। দু'দিন পরে দেখা যাবে বাঁয়ের পথ ধরে আসছে আরও একদল আগন্তুক। দল এবার আরও বড় হল। তিন দিন পরে হয়ত আরও বড় হবে। তখন কোন এক রাতে নিঝুম পৃথিবী কাঁপিয়ে 'ঝিরণী' উঠবে,—সাহেব খান, তামাকু লেও!

তাও হত। সেবার একত্রিশ জন পুরুষ, সাতজন মহিলা এবং দু'টি মেয়েকে খুন করতে ওরা এক সঙ্গে মিলে ছিল তিনশ' ষাট জন ঠগ। অবশ্য মিলেও ছিল একেবারে কম নয়, প্রায় সাতাশ হাজার

টাকা! ওরা সে ঘটনার নাম দিয়েছিল—'চালিশরুয়া', অর্থাৎ, চল্লিশ মানুষ নিয়ে কারবার।

বন্দে আলি মুন্সী এবং তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা প্রায় এই ধরনেরই একটি কারবার। দলে স্ত্রীলোক ছিল, শিশু ছিল। কিন্তু তবুও কাউকে ছাড়তে রাজী হয়নি ওরা। কারণ, লক্ষণ ভাল ছিল। দলের অন্যতম নায়ক ছত্তারের জবানবন্দী অনুযায়ী সে হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ :

মুন্সীর দলের সঙ্গে আমাদের দেখা নাগপুর আর জব্বলপুরের মাঝামাঝি চাপড়া নামে একটা জায়গায়। সেখান থেকে একসঙ্গে চলতে চলতে আমরা এসে হাজির হলাম লাকনাদোনে। সেখানে গিয়ে শোনা গেল, পরদিন ভোরেই একদল হিন্দুস্তানী সেপাই ওখানে আসছে। তাদের নিয়ে আসছেন গোরা সাহেবরা। শুনে আমরা একটু ঘাবড়ে গেলাম। কারণ, ওরা এলে মুন্সী নিশ্চয় আর আমাদের দলের সঙ্গে থাকবেন না, ওদের সঙ্গেই চলতে চাইবেন। মানী লোক, তাছাড়া সাহেব-সুবাদের সঙ্গে চলে অভ্যেসও আছে। আমরা তক্ষুনি স্থির করে ফেললাম, আর দেরী নয়, আজ রাত্তিরেই যা হোক সব শেষ করে ফেলতে হবে।

ততক্ষণে সেপাইদের কিছু কিছু তাঁবু সেখানে পৌঁছে গেছে। পাশেই গাঁ। আমরা মুন্সীকে নিয়ে গাঁয়ের দিক ঘেঁষে আছি। ওরা তাঁবু খাটাতে আরম্ভ করল আমাদের সামনের দিকে। অর্থাৎ আমাদের একদিকে গাঁ, অন্যদিকে সেপাইদের তাঁবু; মাঝখানে আমরা। তা হোক, এরই মধ্যে যে ভাবে পারা যায় কাজ সারতে হবে!

সন্ধ্যে হতে না হতেই নূর খান আর তার বেটা সাদি খান দলের ক'জনকে নিয়ে চলল মুন্সীর তাঁবুর দিকে। ওদের হাতে সেতার। ওরা ভাল সেতার বাজাতে পারত। তাছাড়া, এরই মধ্যে আমরা জেনে ফেলেছি, মুন্সীর জেনানা গানবাজনা খুব ভালবাসে!

ওরা গিয়ে গানবাজনা সুরু করল। আমরা গিয়ে মুন্সীকে ঘিরে বসলাম। মুন্সীর কোমরে একটা তলোয়ার ছিল। আমরা জিনিষটা একটু দেখব বলে কথায় কথায় তাঁর কাছ থেকে সেটি চেয়ে নিলাম। মুন্সীর জেনানা এবং ছেলেমেয়েরা সবাই তখন তাঁবুর ভেতরে মশগুল হয়ে বসে সেতার শুনছে। হঠাৎ একজন 'ঝিরণী' দিয়ে উঠল। মুন্সী মুহূর্তে যেন আমাদের মতলব জেনে গেলেন। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—খুন! তারপর আমাদের ঠেলে ফেলে দিয়ে তাঁবুর দিকে দে ছুট। কিন্তু আমরা দলে ভারী। এক পায়ের বেশী আর এগোন হল না তাঁর। আমরা তাঁকে ধরে ফেললাম। একজন তাঁর গলায় ফাঁস পরিয়ে দিল। কিন্তু সেই ধস্তাধস্তির শব্দে তাঁর জেনানার গানের নেশা কেটে গেছে। তিনি কোলে একটা বাচ্চা নিয়েই ছুটে বেরিয়ে এলেন বাইরে। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন—খুন! গুলাব খান এক ঝটকায় তাঁর গলায় ফাঁস পরিয়ে দিল। বাচ্চা মেয়েটা মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়েছিল। গুলাব তাকে কুড়িয়ে নিজের কোলে তুলে নিল।

মুন্সীর সইসেরা দিন শেষে ঘোড়ার দলাইমলাইয়ে ব্যস্ত ছিল। তারা ভয়ে ঘোড়ার পেটের তলায় পালিয়ে সেখান থেকে চেঁচাতে লাগল—খুন! খুন! তাদেরও ধরে ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হল।

সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমরাই তো বললে, অদূরে খালাসীরা ফৌজের জন্যে তাঁবু খাটাচ্ছিল। তাদের চোখের সামনে এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, আর তারা কিছু টের পেল না?

—কি করে পাবে? আমরা যখন ঝিরণী দিচ্ছি তখন দলের অন্যরা গলা ছেড়ে গান গাইছে। তাছাড়া দুটো ঘোড়াও তখন ইচ্ছে করেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ক'জন আবার চেঁচামেচি করতে করতে তাদের পিছু পিছু ছুটাছুটি করছিল। এই তালগোলে খুনের খবর অন্যরা পাবে কি করে?

—মুন্সীর সেই কোলের মেয়েটিকে কি করলে ?

ছত্তার জবাব দিল, গুলাব খানের ইচ্ছা ছিল সে মেয়েটিকে নিজের কাছে রাখে, প্রতিপালন করে। কিন্তু ধান্নি খান বলল, দেখ গুলাব, কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না। এমন ফুটফুটে মেয়ে সঙ্গে থাকলে নর্মদা এলাকা পার হতে গিয়ে নির্ঘাৎ ধরা পড়বে। গুলাব তাই শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকেও কবরে দিয়ে দিলে।

—জ্যান্ত মেয়েটাকে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এভাবে মানুষ মারতে কষ্ট হয় না তোমাদের ?

—আজ্ঞে না, ওদের তো মারবার জন্যেই দেবী আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। হুজুর, আমরা নিমিত্ত মাত্র। ওরা যদি না-ই মরবে তবে কেন তখন গাছের ডালে কাক ডাকে, একাকী শেয়াল ডাইনে থেকে বাঁয়ে পার হয় !

এই আশ্চর্য বিশ্বাসকেই ধর্ম জেনে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে খুনী দল। হাসছে, গান গাইছে, সেতার বাজাচ্ছে, শরতের নীল আকাশের নীচে উনুন জ্বালিয়ে পাশে বসে রুটি সেঁকছে, বিড় বিড় কথা বলছে।

ওরা যখন কথা বলে তখন সে সম্পূর্ণ এক নতুন ভাষা। তা হিন্দী নয়, উর্দু নয়, আরবী-ফার্সী, তামিল-তেলেগু—কোন ভাষার সঙ্গে কোন মিল নেই তার। এমনকি 'ম্যাকফানসা' বা জলের ঠগী 'ভাগিনা'দের ভাষার সঙ্গেও না। ঠগীর ভাষা সম্পুর্ণ আলাদা। সে বুলির নাম—রামসী (Ramasee)। তার শব্দভাণ্ডার এমন যে তা দিয়ে রীতিমত একখানা প্রমাণ আকারের অভিধান হয়ে যায়।

সাচ্চা 'বোরা' বা 'আউলা' যে, অর্থাৎ যে পাকা ঠগী সে মুখের বুলি শুনেই বলে দেবে সামনে যে দলটি আসছে তারা ঠগ, কিংবা 'বিট্টো' বা 'কুজ', অর্থাৎ ঠগ নয়। ঠগ হলে সম্বোধনেই চেনা যাবে।

সাচ্চা ঠগী অপরিচিত ঠগী দেখলেই বলে উঠবে—'আউলে খান, সালাম'। নয়ত—'আউলে ভাই, রাম রাম!'

'বোরা'দের ভাষায় তাদের বিচরণক্ষেত্রের নাম—'বাগ' বা 'ফুল', রুমালধারী খুনীর নাম—'ভুকোত' বা 'ভুরতোত'। যেখানে খুন করা হয় সে জায়গার নাম—'বিয়াল' বা 'বিল'। জালে পছন্দসই দল এসে পড়ামাত্র একজন চলে যাবে 'বিল' পছন্দ করতে। যাওয়ার আগে দলপতি বলবে—'যা, কুত্তোরি মাঞ্জ লেও'—বাসনটা পরিষ্কার করে নিয়ে এস। অর্থাৎ জায়গাটা ঠিক করে এস। নাম তার—'বিলহো'। তার রিপোর্ট পাওয়ার পর সেখানে ছুটবে—'লুগহা', অর্থাৎ কবর খোঁড়ার লোক। ক'টা কবর লাগবে সে হিসেব সে জেনেই গেছে। দশ মাইল, চাই কি কুড়ি মাইল দূরে বসে নিঃশব্দে সে কবর খুঁড়ছে। কবর দু'রকমের হতে পারে। 'কুরওয়া' বা চৌকো, 'গব্বা' বা গোলাকার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে লোক বেশী হলে মাঝখানে একটুকরো মাটি সাক্ষী রেখে গোলাকার কবরই যুৎসই, অনেকদিন টেঁকে।

ওদিকে যখন কবর তৈরী হচ্ছে ইতিমধ্যে এদিকে তখন শিকার আর শিকারীরা বন্ধু হয়ে গেছে। যদি দেখা যায় দলটি বেশ 'চিসা', অর্থাৎ সম্পন্ন তবে তো আর কথাই নেই। 'সোথা'রা তখুনি তাদের আশপাশে ঘোরাফেরা আরম্ভ করবে। তাদের কাজ দলটিকে নিজেদের বন্ধুত্বের পরিধিতে আনা। 'চান্দুরা', অর্থাৎ দক্ষ ঠগীরা একাজে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবে। 'সোথা'র দায়িত্ব যেমন পথিকদের বিশ্বাস উৎপাদন, এদের দায়িত্ব তেমনি মনোরঞ্জন। যাত্রীরা 'লুটকুনিয়া' বা গরীব হলেও আদর-আপ্যায়নে কোন ত্রুটি ঘটবে না। 'খারু'দের কাছে, অর্থাৎ ঠগী দলের কাছে পথে সবাই সমান। সেখানে 'ফাঙ্ক' বা মূল্যহীন জিনিষেরও যথেষ্ট কদর।

এদিকে সময় যত এগিয়ে আসবে একদল ততই পেছনে পড়তে

থাকবে। ওরা 'তিলহাই' বা গুপ্তচর; পেছনে 'ডনকি' 'রনকি' বা পুলিশ লেগেছে কিনা তা নজর রাখাই হবে তাদের কাজ।

বধ্যভূমিতে এসেও ওরা সুযোগের অপেক্ষা করবে। পছন্দসই জায়গায় 'থাপ' পাতবে, মানে তাঁবু ফেলবে। আশেপাশে 'তুপ্পুল' বা গলিপথ আছে কিনা তার খোঁজ খবর নেবে। দেখতে হবে জায়গাটা 'নিসার' (নিরাপদ) না 'টিক্কুর', (বিপদসঙ্কুল)। সব খবরাখবর শেষে রাতে একসঙ্গে ভোজ হবে। ভোজের পর গল্পগুজব। দলে যদি 'নাউরিয়া' বা নবাগত কোন নাবালক থাকে তবে তাকে সেখান থেকে একটু দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কাঁচা চোখে খুন দেখা ঠিক নয়।

সময় ঘনিয়ে এল। হয়ত কোন কোন পথিক তখনও দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'সোথা'র মুখে গল্প শুনছে। এমন সময় 'সোথা' তার পাশে-বসা মানুষটিকে অনুচ্চগলায় আদেশ দেবে—'চুকা দেনা'! অথবা—'থিবাই দেনা'! অর্থাৎ, ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওদের বসিয়ে দাও। ওরা বসলেন। পাশে এরাও। দু'দিকে দু'জন, পেছনে একজন; মাঝখানে পথিক। গল্প এগিয়ে চলেছে। পথিকদের চোখ ভেঙ্গে ঘুম নামছে। এমন সময় শোনা গেল কে একজন বলছে—'পান কা রুমাল লেও!' পথিক হয়ত ভাবলেন—পানের রুমালই চাওয়া হল। তিনি তখনও জানেন না আদেশ হয়েছে—রুমাল ঠিক কর। তারপরই দ্বিতীয় আদেশ—'তামাকু লেও'! ঘুমের মানুষকে খুন করা নিষিদ্ধ। সুতরাং, পথচারীরা ঘুমিয়ে থাকলে একজন চেঁচিয়ে উঠবে—'সাপ! সাপ!' নয়ত 'বিচ্ছু! বিচ্ছু!' ওরা ধড়ফড় করে উঠে বসেই আবার ঢলে পড়বেন ঘুমের কোলে। এবার চিরকালের মত। 'ভুকোত' চোখের নিমেষে ফাঁস পরিয়ে দেবে তার গলায়। পাশে উপবিষ্টদের একজন পায়ে ধাক্কা দিয়ে ধরাশায়ী করে দেবে তাকে। তার নাম—

'চুমিয়া'। একজন হাত ছুটো চেপে থাকবে। তার নাম—'চুমোসিয়া' বা 'সামসিয়া'। ব্যাপারটা কি হচ্ছে বুঝতে না বুঝতে অসহায় পথিক শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে। 'ভুকোত' বিজয় উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠবে—'বাজিত খান !' অর্থাৎ কাজ শেষ। দলপতি বলবে—'এই বিচালী দেখো !' অর্থাৎ 'বাহ্‌রা' বা মৃতদেহগুলোর ব্যবস্থা কর। দেখবে যেন 'জিওয়ালু' বা জ্যান্ত মানুষ না থেকে যায়।

একদল তক্ষুনি দেহগুলো বহন করে কবরের দিকে যাত্রা করবে। তারা 'ভোজা'। আর একদল হাঁটুগুলোকে ভেঙ্গে থুতনির সঙ্গে মিলিয়ে তারা দেহগুলো কবরে রাখবে! পেটে, বুকে ছুরি চালিয়ে কবরকে পাকা করবে। তাদের নাম—'কুথাওয়া'। মৃতদেহ যাতে ফুলে উঠে কবর ভেঙ্গে বেরিয়ে না আসে তার ব্যবস্থা করাই ওদের কাজ। ওরা যখন সে কাজে মত্ত, দূরে পথের বাঁকে দু'জন তখন চারদিকে নজর রাখতে ব্যস্ত। বিপদের কিছু দেখলেই তারা একফালি সাদা ন্যাকড়া নাড়াবে। অন্ধকারে সে কাপড় দেখে অন্যরা জানবে বিপদ আসছে। 'ফুরকদেনা' তারই খবর দিচ্ছে।

যদি শেষ পর্যন্ত সে ধরনের কিছু না ঘটে তবে হাতে হাতে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মুহূর্তে খুনের সব চিহ্ন মিলিয়ে যাবে। একজনকে বলা হবে—'ফুরজানা !' সে তৎক্ষণাৎ জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলবে। কবরের ওপর দেখতে দেখতে ওদের ভোজসভা বসে যাবে।

গুড়ের ভোজ। কিন্তু ঠগীরা বলে সে বস্তু গুড় নয়, অমৃত। সকলের তাতে অধিকার নেই। একমাত্র 'স্থন' বা সাচ্চা ঠগীর বাচ্চা যারা এবং নিজ হাতে যারা খুন করেছে তাদেরই সে গুড় মুখে দেওয়ার অধিকার আছে। বাকীরাও পেত বটে, তবে সে মন্ত্রপূত গুড় নয়, তাদের জন্যে কিছু গুড় আগেই একপাশে সরিয়ে রাখা হত!

—এভাবে খুনের পরই নিরপরাধ মানুষের কবরে বসে ভোজ খেতে কষ্ট হত না তোমাদের ?

—না। উত্তর দিয়েছিল ফিরিঙ্গীয়া। কখনও কখনও আমাদের মনে যে দুঃখ না হত তা নয়, কিন্তু তুপোনির ঐ গুড় সব ভুলিয়ে দিত আমাদের! সে গুড় একবার যে মুখে দিয়েছে তার কাছে দুনিয়া অন্যরকম। আমি বলছি সাহেব, তুমি পরখ করে দেখতে পার। যত বিদ্যেবুদ্ধিই থাকুক আর যত ধনদৌলতই থাকুক, এই গুড় একবার যে খাবে সে তৎক্ষণাৎ ঠগী হয়ে যাবে। ঘোড়াকে খাওয়াও, দেখবে তার স্বভাব একদম অন্যরকম হয়ে গেছে।

—দূর, তাও কি কখনও হয়?

—হয়। সেই কবে ছেলেবেলায় বাপ মুখে তুপোনির গুড় তুলে দিয়েছিল, আজও তার স্বাদ জিভে লেগে আছে। যদি আরও হাজার বছর বেঁচে থাকি তাহলেও আমাকে চিরকাল ঠগীই থাকতে হবে!

ভোজসভা শেষ হল। কবরের ওপর বিছানা বিছিয়ে সে রাত্তির গোটাদল ওখানেই ঘুমোল। রাত্রে 'তিলহাই' খবর নিয়ে এল সামনেই আর একটি দল পশ্চিমের পথে চলেছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সবাই পশ্চিমেই যাবে কিনা বলা শক্ত। দলপতি নিজের দল চার ভাগে ভেঙ্গে ফেলল। কুম হল, ভোরের আগেই চার দল চারদিকে বেরিয়ে পড়বে। একজনকে কোন দলেই দেওয়া হল না। সে 'মাউলি'। তার হাতে গাঁয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে। কেননা, ওরা কবে ফিরতে পারে কে জানে! ছেলেমেয়েদের কষ্ট হবে!

ভোরের আগেই চার দল চারদিকে বেরিয়ে পড়ল। যতক্ষণ প্যাটেলদের সেই দলটির সন্ধান না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ ওরা হাঁটবেই। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাঁটবে। হাঁটতে হাঁটতে চৌরাস্তায় এসে পড়লে আগের দল নিঃশব্দে বালির ওপর পায়ে একটি রেখা টেনে দিয়ে যাবে। সে সঙ্কেত দেখে পেছনের

দলের বুঝতে মোটেই অসুবিধে নেই তাদের কোন্ পথে চলা উচিত, কোন্ দিকে চলতে হবে। যত দূরের পথই হোক, ওরা চলবেই। একটা দল বারোজন মানুষকে খুন করার জন্যে কুড়ি দিনে দু শ' মাইল হেঁটেছিল!

হয়ত আখেরে ক'টি তামার পয়সা মাত্র মিলবে, কিংবা হয়ত বা তাও নয়। কিন্তু তবুও একবার যাকে মনে মনে তাক করেছে ওরা, তাকে হত্যা করবেই। যত সাবধানীই হোন তিনি, ঠগীর হাতে তাঁর নিস্তার নেই।

—একদিন এক উচ্চবংশীয় মুসলিম যুবক ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে তাঁর বিস্তর পাইক-বরকন্দাজ, লোকজন। ভদ্রলোক নিজেও সুসজ্জিত। তাঁর কোমরের একদিকে তলোয়ার, অন্যদিকে পিস্তল। তদুপরি পিঠে তীর-ধনুক। ঠগীর দল স্থির করল ওঁকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু মোগল কিছুতেই কোন অপরিচিত লোককে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। হোক না তারা হিন্দু, তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণ।

দ্বিতীয় দিন পথে একদল মুসলিম পথিকের সঙ্গে দেখা হল। তারা সালাম করে সোজাসুজি পথের বিপদের কথা পাড়ল। দলের মধ্যে প্রবীণ যে সে বলল, যা দিনকাল পড়েছে, এমন অরাজকতার দিনে একা একা পথ চলতে কার না প্রাণে ডর হয়! আমাদের নসিব ভাল আপনার মত সঙ্গী পেয়ে গেলাম। মোগল তবুও অনড়। তিনি হাঁকলেন, তফাৎ যাও!

তৃতীয় দিনে এক সরাইখানায় রাত কাটাতে হল ওঁকে। ঠগীদের একটি দলও আস্তানা গাড়ল সেখানে। নবাবজাদার সঙ্গে আলাপের সুযোগ হল না বটে, কিন্তু রাতারাতি চাকরবাকরদের অনেকের সঙ্গেই তাদের ভাব হয়ে গেল।

চতুর্থ দিনে আবার কিছুদূর চলতে না চলতে নতুন একদল

মানুষের সঙ্গে দেখা। মোগল জানেন না, কাল রাত্রে ওরা তার সঙ্গে একই সরাইখানায় ছিল। তিনি যথারীতি তাদের এড়িয়ে যেতে চাইলেন—না, আমার কোন সঙ্গীর দরকার নেই। ওরা বলল, কিন্তু হুজুর, আমাদের তা দরকার আছে! আমরা গরীব তীর্থযাত্রী, আপনার সঙ্গে থাকলে আপনার কোন উপকার হবে না হয়ত, কিন্তু আমাদের উপকার হবে, আমরা হুজুর নির্ভয়ে পথ চলতে পারব। ভৃত্যরা কেউ কেউ এগিয়ে এসে সুপারিশ করল, এরা কাল আমাদের সঙ্গে সরাইয়ে ছিল। নির্ভয়ে আপনি আমাদের দলে নিতে পারেন; আমাদের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছে, লোক ভাল। মোগল তবুও অনড়। তিনি বললেন, বলেছি তো একবার, আমার সঙ্গে নয়, তোমরা অন্য পথ দেখ।

ওরা সালাম জানিয়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পঞ্চম দিনে দেখা গেল পথের ধারে একদল মুসলিম সেপাই একটা মড়া নিয়ে বসে কাঁদছে। নবাবজাদাকে দেখে তারা এগিয়ে এল। বলল, হুজুর, আমাদের সঙ্গী। গা-গতর ভাল ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে ধকল সইতে না পেরে মারা গেছে। আমরা অশিক্ষিত মুসলমান। ফৌজে কাজ করি। কোরাণ হাফিজ কিছুই সড়গড় নেই। কবর তৈরী—আপনি যদি দয়া করে শেষকৃত্যটুকু করে দেন।

শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের সন্তান। সঙ্গে কোরাণশরিফও রয়েছে। মোগল এই অনুরোধ পায়ে ঠেলতে পারলেন না। তলোয়ারের বদলে কোরাণ হাতে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। ওরা জল এনে দিল। তিনি হাত মুখ ধুয়ে প্রার্থনায় বসলেন। তাঁর সামনে কবর। দুই পাশে মৃতের দুই বন্ধু। তিনি তখনও জানেন না সৈনিকের বেশে ঐ মানুষ দু'টি দুই ছদ্মবেশী ঠগী।

মোগল চোখ বুজে প্রার্থনা করছেন। অদূরে দাঁড়িয়ে তাঁর

ঘোড়া, নিজের লোকজন। এমন সময় পবিত্র কোরাণের মন্ত্র ছাপিয়ে ঘোষিত হল নির্মম মৃত্যু-পরোয়ানা,—'তামাকু লেও!'

সঙ্গে সঙ্গে ঝিলিক দিয়ে উঠল হলুদ রংয়ের সেই রুমাল। মুহূর্তে ধ্যানমগ্ন মোগল তাঁর ধ্যানের জগতে উধাও হয়ে গেলেন।

এ প্রতিমা একটি নয়, আপন কবরের পাশে ধ্যানী পথিকের এই নিশ্চিন্ত মূর্তি শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ।

৭

তারই একটি আজও রয়েছে ইলোরায়।

যদি কেউ আজ ইলোরা গুহায় আসেন এবং মৌন পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ সারি সারি মূর্তিগুলোর দিকে ভাল করে নজর করেন, তাহলে একই দৃশ্য দেখতে পাবেন তিনি। অন্তত ঠগীরা নাকি তাই দেখতে পেত।

স্লীম্যান জিজ্ঞেস করেছিলেন, সগরে জনস্টোন নামে এক সাহেবকে নাকি তোমরা বলেছিলে যে ইলোরা গুহায় গেলে তোমাদের কলাকৌশল সব দেখতে পাওয়া যাবে?

ফিরিঙ্গীয়া জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ, সব। এক জায়গায় দেখবেন আমরা ফাঁস পরাচ্ছি। আর এক জায়গায় দেখা যাবে মৃতদেহ কবরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অন্য একটিতে দেখবেন আমরা কবর দিচ্ছি। ঠগীদের এমন কিছু কৃত্য নেই যা ওখানে না আছে।

দুর্গা বলল, শুধু ঠগীদের কথা বলছ কেন? দুনিয়ায় এমন কোন পেশা নেই ইলোরায় যার নক্সা নেই।

ছোটি সায় দিল ওকে।—হ্যাঁ সাহেব, আমরা যখনই ওদিকে যাই, গুহাটা একবার করে দেখে আসি। তাজ্জব ব্যাপার! দুনিয়ার যত গোপন পেশা সব সেখানে চোখের সামনে লিখে রাখা আছে। অথচ গুহাটা তৈরী হয়েছিল এক রাত্রে।

স্লীম্যান হাসলেন।—আচ্ছা, তোমরা ছাড়া আর কেউ সেগুলো দেখলে বুঝতে পারবে কি যে মূর্তিগুলো তোমাদেরই?

ফিরিঙ্গীয়া মাথা নাড়ল।—না, কি করে বুঝবে? আমরা কক্ষনো কাউকে সে কথা বলি না। কেউ বলে না। সবাই নিজ নিজ পেশা দেখতে পায় বটে, কিন্তু কেউ অন্যদের কাছে তা ভেঙ্গে বলে না। আসলে জানেন কি হুজুর, এগুলো মানুষের হাতের জিনিষ নয়, আমাদের সকলের ধারণা, ইলোরা ভগবানের নিজের হাতের সৃষ্টি।

—তোমাদের কোন্ কোন্ কীর্তিকথা খোদাই করা আছে সেখানে? আবার প্রশ্ন করলেন স্লীম্যান। ওদের বক্তব্যটা যথাসম্ভব বিস্তারিত শোনা দরকার।

এবার এগিয়ে এল সাহেব খান।—আমি দেখেছিলাম হুজুর, এক জায়গায় 'সোথা' মুসাফিরদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছে, খাতির জমাচ্ছে, ঠিক আমরা যা করি। আর এক জায়গায় ছিল 'ভুরতোত' তার গলায় রুমাল পরাচ্ছে, 'চামোচি' পা ত্ব'টি ঠেসে ধরে আছে। আমি সেখানে এই ত্ব'টি দৃশ্য দেখেছিলাম হুজুর!

ফিরিঙ্গীয়া জানাল সে আরও একটি দৃশ্য দেখেছিল,—'লুগা' মৃতদেহ নিয়ে কবরে চলেছে।

এগুলো সবই কল্পকাহিনী এমন কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় না। কেননা, ডব্লিউ ক্রুক তাঁর বিখ্যাত 'থিংস্ ইণ্ডিয়ান' (১৯০১) বইয়ে লিখেছেন—ভারতে ঠগীদের অস্তিত্বের সবচেয়ে প্রাচীন প্রমাণ ইলোরা। সেখানে নাকি একটি খোদাই করা দৃশ্যে রয়েছে—এক ব্রাহ্মণ শিব পূজায় রত। পেছন থেকে তার ওপরে ফাঁস হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিষ্ঠুর মৃত্যুদূত—ঠগী; উৎকণ্ঠিত মহাদেব ভক্তকে রক্ষার চেষ্টায় উদ্যত!

ইলোরা সপ্তম শতকের ভারতীয় শিল্পকীর্তি। সুতরাং অনেকের ধারণা, ঠগী ভারতেরই নিজস্ব সৃষ্টি। বিশেষ করে, আমাদের পুরাণের 'নাগপাশ' নামক হাতিয়ারটি নাকি তাই প্রমাণ করে।

কিন্তু পরবর্তীকালের ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলেন, সেটা প্রমাণ নয়, অনুমান মাত্র। কেননা, হেরোডটাস এদের পারসিক বলে বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর ইতিকথার সপ্তম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন—এরা আদিতে পারসিক। এদের ভাষা পারসিক, পোষাক অনেকটা পারসিকদের মত অনেকটা প্যাকটিয়ানদের মত। তবে আসল বৈশিষ্ট্য ওদের হাতিয়ারে। ছোরা ছাড়া ওরা লোহা বা পিতলের কোন অস্ত্র বহন করে না। আসল অস্ত্র ওদের চামড়ার ফিতেয় তৈরী একটি ফাঁস।

হেরোডটাসের মতে এই অদ্ভুত দস্যুদলের আদি পুরুষ হচ্ছেন সাগার্তি, যিনি জারেকসাসকে আট হাজার অশ্বারোহী দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা খুঁজেপেতে সিদ্ধান্ত করেছেন—ভারতের ঠগীরাও সেই বিশ্রুত পুরুষ সাগার্তিরই উত্তরপুরুষ। পশ্চিমের মুসলিম বিজেতাদের পায়ে পায়ে তারাও একদিন এই দেশের নরম মাটিতে পা রেখেছিল। তারপর আর দেশে ফেরা হয়নি। কেননা, পরাজিত দেশের আবহাওয়া যদৃচ্ছ জীবনের পক্ষে অনুকূল ছিল। তদুপরি লুণ্ঠনে লুণ্ঠনে রিক্ত হিন্দুস্তানের মৃত্তিকায় শেকড় বিস্তারও কষ্টকর ছিল না। দেশে না ফিরে তারা এখানেই অরণ্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়েছিল।

সুলতানদের সহযাত্রী সেজে এসেছিল বলেই প্রথম দিকে নবাগত ঠগীদের ঠিকানা ছিল রাজধানী দিল্লির আশেপাশে। তুঘলক কুলগৌরব ফিরোজ থাঁর দরবারী ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্-বারনি ১৩৬৫ সনে তাঁর তুঘলক কাহিনীতে লিখেছেন—১২৯০ সনে জালালউদ্দীনের রাজত্বকালে দিল্লিতে প্রায় এক হাজার ঠগ ধরা পড়েছিল। ওরা সুলতানের এক প্রিয় দাসকে হত্যা করে বাদশাহের মনে কোপের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু বাদশাহী ক্রোধ। দিনান্তে তা মহান্ ক্ষমায়

পরিণত হল। সুলতান বললেন, ওদের পেছনে আমার মুদ্রার পাকা ছাপ এঁকে দিয়ে ওদের নৌকোয় তুলে দাও। সে নৌকো যেন পূর্বভারতের লাখনার আগে কোথাও না নোঙর করে! শোনা যায়, বাংলা দেশের ঠগ সেখান থেকেই সংক্রমিত।

সুলতানী আমলে ঠগীর দ্বিতীয় কাহিনী শোনা যায় সুলতান আলাউদ্দীনের কালে। ১৩০৩ সনে উত্তর থেকে যখন বহিরাক্রমণের প্রবল ঝড়, তখন সেই দুর্দিনে বেপরোয়া সম্রাটের রাজধানী রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল নাকি ঠগীরাই। তাদের নায়ক ছিলেন বিখ্যাত সন্ত নিজামউদ্দীন। তিনিই নাকি সেদিন তাঁর শিষ্যদের সাহায্যে শত্রুপক্ষের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিলেন! কেউ বলেন, সে কাজ করেছিলেন তিনি তাঁর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার বলে; কেউ বলেন, সেই রুমালের বলে।

দ্বিতীয় অনুমানটির পক্ষে বলা হয়, দিল্লির বিখ্যাত নিজামউদ্দীন আউলিয়া ঠগীদের কাছে চিরকালের এক স্মরণীয় তীর্থ। দ্বিতীয়ত, আপাতসন্ন্যাসী নিজামউদ্দীন ঐশ্বর্যে তখন দ্বিতীয় সুলতান। লোকে বলত, তিনি 'দুস্তুল গিয়াব' বা স্বর্গীয় ভাণ্ডারের সন্ধান জানতেন। ঠগীরা বলত, তিনি যৌবনে ঠগী ছিলেন।

যতদূর মনে হয় এগুলো সবই অনুমান। কেননা, ঠগীদের বিবেচনায় তীর্থ হলেই যাঁকে উপলক্ষ্য করে তীর্থ, সেই তীর্থপতিকে ঠগী বলে ধরে নেওয়া যুক্তির দিক থেকে মোটেই সঙ্গত নয়। কেননা, তাহলে শুধু নিজামউদ্দীন নয়, ভারতের আরও কিছু কিছু শ্রদ্ধার উপলক্ষ্যকে এই হীন বৃত্তির সঙ্গে জড়াতে হয়। সেটা পুরোপুরি প্রমাণ-নির্ভর নয় বলেই অনুচিত। দ্বিতীয়ত, ভারত চিরকালের সাধু-সন্তের দেশ। ট্যাভেনিয়ার লিখেছেন—দু'শ বছর আগে নিজামউদ্দীনের কালে ভারতে হিন্দু সাধু সন্ন্যাসী ছিল প্রায় বারো লক্ষ, মুসলিম ফকির দরবেশ আট লক্ষ। ধর্মপ্রাণ হিন্দুস্তানের মানুষ

তাদের দানে এঁদের বাঁচিয়ে রাখতেন। নিজামউদ্দীন আউলিয়া কি তাঁদের দানে অসম্ভব ?

সুতরাং, নিজামউদ্দীন এবং ঠগীর মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক করেছেন বটে, কিন্তু তা খুব সারবান নয়। তার চেয়ে বরং 'দাদাধীরা' এবং 'ঝোরা নায়েকে'র সঙ্গে তাদের যোগাযোগের কাহিনীটি বহুলাংশে বিশ্বাসযোগ্য।

ঠগীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় জানা গিয়েছিল, ভুরসুতে উপজাতির নায়ক দাদাধীরা তাদের অন্যতম আরাধ্য। তারা বলে, ধীরা তাদের নায়ক ছিলেন। বিশেষ অনুষ্ঠানে তারা তাঁর আত্মাকে তাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনত। মদ খেয়ে তাঁর কাছ থেকে শক্তি ভিক্ষা করত।

ঝোরা নায়েকও তাদের কাছে জনপ্রিয় আদর্শ ছিল। সে ছিল মুলতানি ঠগেদের নেতা। তার আদর্শনিষ্ঠা ঠগীদের মধ্যে প্রবাদের মত ঘুরে বেড়াত। একবার ঝোরা নাকি শুধু তার ভৃত্যকে নিয়ে শিকারের খোঁজে বের হয়েছিল। দেবীর আশীর্বাদে প্রথম দিনেই তার সামনে এসে পড়ল একদল 'চিসা', অর্থাৎ সম্পন্ন পথিক। ঝোরা একাই তাদের ওপর 'খোমুসনা' হল, অর্থাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ঘোড়ার পিঠে লুঠের মাল চাপিয়ে গাঁয়ে ফিরে এল। বাড়িতে বসে হিসেব করে দেখল, এই এক যাত্রায় আয় হয়েছে তার প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। ইচ্ছে করলে তার সবটুকুই সে নিজে রেখে দিতে পারত। কিন্তু আদর্শ পুরুষ ঝোরা মনে সে পাপচিন্তা ঠাঁই দিল না। সে দলের সবাইকে ডেকে টাকাটা সকলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দিল। এমন মানুষকে ঠগী কখনও না ভজনা করে পারে ?

এদের কথা স্বতন্ত্র। আলাউদ্দীনের পর মুসলিম ভারতে ঠগীর পরবর্তী উল্লেখ পাওয়া যায় সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ)। সেবার ধরা পড়েছিল পাঁচশ' এবং সব নাকি এটোয়া জেলায়।

যা হোক, রাজধানী থেকে বিতাড়িত ঠগীরা নানা দলে ভাগ হয়ে সেই সুদূর সুলতানী আমলেই ছড়িয়ে পড়ল নানা দিকে। কয়েকশ' বছর পরে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে আবার এক জায়গায় জড় করতে গিয়ে কোম্পানির কর্মচারীরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিলেন, সাকুল্যে তাদের আদি গোত্র মাত্র সাতটি। (১) বাহ্‌লিম, (২) ভিন্, (৩) ভুজসোত্, (৪) কাচুনি, (৫) হুত্তার, (৬) গান্নু এবং (৭) তুনদিল্। ভারতে নানা এলাকায় নানা বর্ণের যত ঠগী, আদি তাদের এই সাত পরিবার।

দিল্লির পর এদের মধ্যে পাঁচটি পরিবারই বসতি স্থাপন করে আগ্রায়। অন্য এলাকার ঠগীদের কাছে তাদের নাম—আগুরিয়া। সন্দেহ নেই, সেকারণেই পরবর্তীকালের অযোধ্যায় ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হওয়ার উপক্রম দেখা দিয়েছিল। স্লীম্যান লিখছেন—অযোধ্যায় জনপথ ছিল সাকুল্যে চৌদ্দশ' ছ' মাইল। তার প্রতি মাইলে তখন ঠগ। একমাত্র এখানেই পথের ধারে ধারে তাদের 'বিল' বা কবরখানা ছিল ছ'শ চুয়াত্তরটি!

আর এক দল চলে গেল দক্ষিণে, আর্কটে। তারাই সবচেয়ে বনেদী ঘরানা। অন্য দলের সঙ্গে পোষাকে এবং চাল-চলনে তাদের অনেক ফারাক। আর্কটের ঠগীরা সাধারণত ডোরাকাটা লুঙ্গী পরত, গায়ে দিত কোম্পানির সেপাইদের মত খাটো জ্যাকেট। বাবুয়ানার প্রতীক হিসেবে তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকত একগাছা বেতের ছড়ি। রাস্তায় যখন শিকারের খোঁজে নামত তখন প্রত্যেক দলপতির সঙ্গে থাকত নিজস্ব বাবুর্চি, হুকোবরদার এবং নানা শ্রেণীর অগণিত ভৃত্য। ওরা শুধু আপন হাতে রুমাল ধরত। বাকী সব কাজই ছিল মাইনেকরা ভৃত্যদের দায়িত্ব। তারাই তাঁবু খাটাত, রসুই পাকাত, গরু ঘোড়ার তদারকি করত, মালপত্র বইত। তবে এমন বড়মানুষি সত্ত্বেও উত্তর ভারতের ঠগীদের কাছে আর্কটিদের কোন

মর্যাদা ছিল না। হিন্দুস্তানী ঠগীরা বলত, ওরা আসলে খুবই নিচু জাত, ওদের ঘরে আমরা মেয়ে বিয়ে দিতে পারি না।

সপ্তম গোষ্ঠী—মুলতানিরা। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল কোথাও তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করত না। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-পরিজন সমেত গোটা সংসার গরুর গাড়িতে চাপিয়ে তারা পথে পথেই ঘুরে বেড়াত। দৈবাৎ মর্জি হলে কোথাও হয়ত একখানা গাঁ সাজাত। শ' খানেক পরিবার একবার হিঙ্গোলিতে তাই করেছিল।

তবে সেটা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। মুলতানিদের মধ্যে নিয়ম ছিল—আজ এখানে, কাল সেখানে। বাঘের পেছনে ফেউয়ের মত ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলত ব্রিঞ্জারীরা। কেননা, মুলতানিরা তত 'ধার্মিক' নয়, সুযোগ পেলে তারা নারীহত্যা তো করেই, শিশু অপহরণের দিকেও তাদের বিশেষ নজর। কেননা, ওরা নাকি তৎকালের বাজার দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সোনা-রূপার চেয়ে তারই বেশী কদর। বিশেষ, শিশুটি যদি কন্যাসন্তান হয় তবে ব্রিঞ্জারীরা কাছেই আছে, তারা তক্ষুনি নগদ প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে অপহৃত শিশু কোলে তুলে নেবে। দিল্লি, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, হায়দ্রাবাদ, পুনা, লাহোর—প্রতিটি নগরের বিলাস-পল্লীতে তার বাজার! এসব কারণেই মুলতানিদের একটি শাখা বিবেচকের মত সেদিন ঠগী থেকে পুরোপুরি 'ম্যাকফানসা' হয়ে যেতেও আপত্তির কারণ দেখেনি। ম্যাকফানসাদের প্রতিষ্ঠাতা ঝোরা নায়েক আদিতে মুলতানি ঠগীই ছিল।

এই কয় সম্প্রদায় ছাড়াও কিছু কিছু স্থানীয় ঘরানা ছিল ওদের। তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মালব এবং রাজপুতানার 'সুসিয়া' সম্প্রদায়, অযোধ্যার 'জুমালদেহী' সম্প্রদায় এবং আদি মুলতানি 'চিঙ্গুরিয়া'রা।

রাজপুতানার সুসিয়াদের পদবী ছিল—নায়েক, থোরি, ইত্যাদি। আর্কটিদের মত তাদেরও বাবুয়ানার খাতির ছিল। দলপতিরা প্রতিষ্ঠিত

ব্যবসায়ীর বেশে দামী পাল্কীতে চড়ে 'বাণিজ্যে' বের হত। কখনও কখনও তারা তৎকালীন রূপেয়া-বেহারাদের মতও পোষাক করত।

এই বেহারা সে দিনের ভারতীয় ব্যবসা-জগতে একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়। স্থল পথে তখন রেল নেই, অনেক অঞ্চলে ভাল পথ-ঘাট পর্যন্ত নেই। অথচ নিয়মিত যোগাযোগ ছাড়া দূর-দুরান্তের কুঠির সঙ্গে ব্যবসা সম্ভব নয়। সুরাট এবং বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদের এ ব্যাপারে একমাত্র সহায় তখন এই বেহারারা। শত শত মাইল পায়ে হেঁটে তারা এক রাজ্যের জিনিষ অন্য রাজ্যে মহাজনের গদীতে পৌঁছে দিত, সেখান থেকে কোমরে টাকা গুঁজে আবার নিজেদের গদীতে ফিরে আসত। বোম্বাই থেকে জয়পুর, সুরাট থেকে ইন্দোর—ওদের পায়ে ভর করে বাণিজ্যের রথ চলত। সততায় এবং বিশ্বস্ততায় পশ্চিম ভারতে এখনও তারা প্রবাদ।

'সুসিয়া'রা যেমন কখনও কখনও ওদের সাজে বের হত, অযোধ্যার 'জুমালদেহী'রা তেমনি আবার মাঝে মাঝে 'সুসিয়া'দের মত ব্যবসায়ীর সাজ নিত। তখন প্রতি দলের সঙ্গে থাকত চার-পাঁচজন করে বাবুর্চি! মাথায় পাগড়ী, গায়ে ফুলকাটা কামিজ, হাতে বেনারসী তামাকের হুকো। দেখে মুলতানিরা বলত, ওদের দেমাক দেখে বাঁচিনে, যেন বাদশা শিকারে চলেছেন। স্লীম্যানকে এক ব্রিঞ্জারী নাকি বলেছিল—ওদের দেখলে আমাদের কষ্ট হয়, বাব্বা, মাথায় কি বিরাট পাগড়ী, ঠগী নয়, যেন মুটে!

তবে চাল-চলন এবং আচার-ব্যবহারে রকমফের ঘটলেও বিশাল ভারতের বিস্ময়কর অন্তঃপ্রকৃতির মতই তার এই ছন্নছাড়া বেপরোয়া সন্তানদের বৈচিত্র্যময় জীবনের অন্তরালেও ছিল এক অচ্ছেদ্য ঐক্য-সূত্র। হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, 'চিঙ্গুরিয়া' হোক আর 'জুমালদেহী'ই হোক, তারা সকলেই ঠগী। পরবর্তীকালে স্লীম্যান এবং তাঁর সহচররা হিসেব নিয়ে দেখেছেন—অযোধ্যার ঠগীদের দশ ভাগের ন' ভাগই

ছিল জন্মসূত্রে মুসলমান, এক ভাগ হিন্দু। দোয়াবে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেখানে মুসলমান পাঁচ ভাগের এক ভাগ। নর্মদার দক্ষিণে আবার মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যায় তারা প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ। রাজপুতানায় আবার কম, মুসলমান সেখানে মাত্র চার ভাগের এক ভাগ। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং বোম্বাইয়ে দুই সম্প্রদায়ের অনুপাত আধাআধি—সমান-সমান। কিন্তু এহ বাহ্য। ধর্মে তারা যে সম্প্রদায়েরই হোক, তারা ঠগী। কোথাও তাদের নাম—'ফাঁসুড়ে,' কোথাও 'ফাঁসীগীর', কোথাও 'আরিতুলুকর,' কোথাও 'তন্তাকালেরু'। কিন্তু যে নামেই লোকে জানুক তাদের, সকলেই তারা ঠগী। তাদের হাতিয়ার এক, ভাষা এক, জীবন এক, পেশা এক, ধর্ম এক।

ঠগী-ধর্ম এক অদ্ভুত সমন্বয়বাদ। দু'টি আপাতবিপরীত অপরিচিত এবং দূরবর্তী ধর্ম কোন ঐতিহাসিক কারণে পরস্পরের সংস্পর্শে এলে তাদের নৈকট্য, সংস্পর্শ বা সংঘাত মানুষের ধ্যানের জগতে কখনও কখনও বিস্ময়কর তৃতীয় ভাবনার জন্ম দিয়েছে এমন নজীর ইতিহাসে অজ্ঞাত নয়। ভারতের লৌকিক ইতিহাসেও তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম সাধনা ঠগীদের মধ্যে যেমন অন্তরঙ্গ রূপ নিয়েছিল তেমন বোধ হয় আর হয় না।

ঐতিহাসিক যাই বলুন, হাজার হাজার ঠগী আদালতে দাঁড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করেছে, তারা 'মা ভবানী' বা কালীমাতার সন্তান। তাদের তীর্থ সুদূর বাংলা দেশের কালীঘাট। কালীঘাটের পরে দ্বিতীয় তীর্থ তাদের বিন্ধ্যাচলের ভবানী মন্দির।

দ্বিতীয় মন্দিরটি মীর্জাপুরের কয়েক মাইল পশ্চিমে। বর্ষাশেষে পথের কাজ সেরে দক্ষিণের সমুদয় ঠগ নাকি সেখানে জমা হত। সে খবর শুনেই ফেনি পার্কাস ১৮৪৪ সনে সেখানে গিয়েছিলেন মন্দিরটি দেখতে। ছোট্ট মন্দির। মিসেস পার্কাস লিখছেন—

প্রতিমাটি কালো পাথরে গড়া। বিরাট বিরাট চোখ, চোখের সাদা অংশটুকু রুপোর পাতে ঢাকা।···মাথার ওপরে যুঁই ফুলের কতকগুলো মালা ঝুলছে। সেগুলো চুলের কাজ করছে।···সব মিলিয়ে চার ফুট উঁচু প্রতিমা।···স্বভাবতই ঠগীদের কথা মনে পড়ছিল আমার। কিন্তু মুখে আনতে সাহস হল না। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা বুদ্ধির কথা নয়! ফেনি তাঁর বইয়ে প্রতিমা এবং মন্দির দুইয়েরই দু'টি ছবি দিয়েছেন।

কিন্তু বিন্ধ্যাচলের ভবানীর চেয়েও ঠগীর কাছে চিরকালের আকর্ষণ কলকাতার কালীঘাট। তারা বলত, তাঁরই আশীর্বাদে, তাঁরই আশ্রয়ে তারা রহস্যময় জীবনচারী, অন্ধকারের পথিক। কালীঘাটের জননী তাদের হাতে ফাঁস তুলে দিয়েছেন বলেই তারা ফাঁসীগীর—ঠগী।

কি করে ভবানীর আশীর্বাদ তাদের মত অভাজনের মস্তকে বর্ষিত হল সে কাহিনীও প্রতিটি ঠগীর মুখস্ত।

ঃ পৃথিবীতে তখন আবির্ভূত হয়েছে মহাদানব রক্তবীজ। তার উপদ্রবে তাবৎ পৃথিবী উৎকণ্ঠিত, সৃষ্টি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম। জগদম্বা কালী তার সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু রক্তবীজের সামনে তিনিও অসহায়। কেননা, রক্তবীজের প্রতি বিন্দু রক্ত থেকে আবার তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হচ্ছে মহাবলী সব রাক্ষস। ক্লান্ত, বিরক্ত ভবানী স্বভাবতই চিন্তিত হয়ে উঠলেন। সেই পরম মুহূর্তে তাঁর দেহনিঃসৃত ঘর্ম থেকে আবির্ভূত হল দু'টি অনুচর। তারা মনুষ্য। ভবানী তাঁর করধৃত রুমালটি তাদের হাতে দিয়ে বললেন—বৎসগণ, এই তোমাদের অস্ত্র। তোমরা শত্রু নিধনে তৎপর হও। ওরা সেই হরিদ্রা বর্ণের কাপড়ে দু'টি ফাঁস তৈরী করল। তারপর মাকে প্রণাম করে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। দেখতে দেখতে রক্তবীজের শেষ বংশধরটিও ধরাশায়ী হল।

ঠগীরা বলে, লড়াইশেষে ভক্ত দু'জন মাকে আবার তাঁর রুমাল ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিল। কিন্তু ভবানী বললেন, না বাছা, এই অস্ত্র আমি আর চাই না। রুমাল আমি তোমাদেরই দিলাম, যারা ধর্মে বিপরীত, যারা শত্রুকুলের সৃষ্টি, এর সাহায্যে তোমরা তাদের বিনাশ করবে, পৃথিবীকে পরিচ্ছন্ন রাখবে। ঠগীরা আরও বলে, কলিযুগের সূচনা পর্যন্ত মা ভবানী প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের সময়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, অলক্ষ্যে থেকে নিজে তাদের কাজে সাহায্য করতেন। তখন কবরের দরকার হত না, ওরা ফাঁস পরিয়েই খালাস, মৃতদেহের দায়িত্ব ছিল মায়ের। কিন্তু একদিন এক বেয়াকুফ ঠগী খুনের শেষে হঠাৎ পেছনে তাকাতে গিয়ে অঘটন ঘটাল, ঠগীদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনল। ভবানী তখন খুন করে রেখে আসা মৃতদেহের ভোগ গ্রহণ করছিলেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ভক্তের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাওয়ায় তিনি যারপরনাই রুষ্ট হলেন। কুপিতা দেবী ভোগ ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার থেকে মৃতের দায়িত্বও তোমাদের। ঠগীরা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কান্নাকাটি সুরু করল। দেবীর রোষাগ্নি প্রশমিত হল। তিনি আবার প্রসন্ন হলেন। নিজের একখানা দাঁত ওদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ভাবনার কিছু নেই, এই রইল তোমাদের কোদালি। বুকের একখানা পাঁজর খুলে দিয়ে বললেন, এই রইল তোমাদের ছুরি। কোদাল দিয়ে কবর খুঁড়বে, ছুরি দিয়ে কেটে মৃতদেহ কবরে রাখবে, সব দুর্ভাবনা দূর হবে।

সেই থেকে রুমালের মত কোদাল আর ছুরিও আশীর্বাদপূত হাতিয়ার। এবং সেই থেকে ঠগীরা ভবানী বলতে আরও উন্মাদ।

কৌতূহলী ইংরেজ জানতে চাইলেন, সাহেব খান, তুমি কি মুসলিম ?

—আজ্ঞে হুজুর, আমরা দক্ষিণের ঠগীরা প্রায় সবাই মুসলমান।

—তোমাদের দেবী কে ?

—আজ্ঞে, মা ভবানী—কালী।

—তোমাদের কি মুসলমানদের নিয়মেই বিয়ে-সাদী পানাহার হয় ?

—হ্যাঁ।

—তোমাদের পবিত্র শাস্ত্রে কি ভবানী নামে কেউ আছেন ?

—না।

—তবে তোমরা কেন তাঁর ভজনা কর ?

—বাঃ, তিনি যে আমাদের দেবী।

নাসির জমাদারকে জিজ্ঞেস করা হল। তারও এক উত্তর। এবার অন্য প্রশ্ন। রাজপুরুষ জানতে চাইলেন—দেবী না হয় আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তোমরা ভূতপ্রেতে ভয় পাও না ? মৃতের আত্মারা তোমাদের তাড়িয়ে ফেরে না ?

—না। উত্তর দিল নাসির—তারা কখনও আমাদের ঘাটাঘাটি করে না।

—কিন্তু, অন্য মানুষ যখন খুন করে তখন ?

—তখন নিশ্চয়ই তাদের প্রেতে উৎপাত করে। নাসির বিজ্ঞের মত জানাল, কখনও কখনও একসঙ্গে পঞ্চাশটা পর্যন্ত আত্মা এসে তাদের উপর হামলা সুরু করে, খুনীরা তখন তাদের তাড়নায় পাগল পর্যন্ত হয়ে যায়।

—তোমরা হও না কেন ?

—হব কেন ? আমরা কি দেবীর হুকুম ছাড়া কখনও কাউকে খুন করি ? দেবী যাদের পাঠান আমরা কি তাদের ছাড়া আর কারও জীবনে হাত দিই ?

কল্যাণ সিং সায় দিল। বলল, দেবী সঙ্গে থাকেন বলেই ভূতপ্রেত আমাদের ধার ঘেঁষে না হুজুর ! দুর্গা বলল, তাছাড়া, প্রেত হয় কারা ?

যারা নরকে যায়। দেবীর নির্দেশে আমরা যাদের হত্যা করি, তারা তক্ষুনি সবাই চলে যায় স্বর্গে, আমাদের ওপর উৎপাত করার তাদের সময় কোথায় ?

সকলের মুখে এক কথা—দেবী ! দেবী ! দেবী !

সুতরাং, 'জয় ভবানী'—পাতালের এই মন্ত্র নিয়ে সুরু হল ভারতময় হিন্দু-মুসলমানের এক বিস্ময়কর মিলিত সাধনা—খুন, খুন, খুন। রাজস্থানের মরু প্রদেশে, পাঞ্জাবে সিন্ধুতীরে, উত্তরে গঙ্গা-যমুনার বিশাল অববাহিকা ঘিরে, দক্ষিণে নর্মদা-গোদাবরী উপত্যকা জুড়ে—সমগ্র ভারতের পথে পথে নিঃশব্দ পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার খুনী। বছরের পর বছর, শতকের পর শতক। তাদের কালো কালো শীর্ণ হাতগুলোতে পুরুষানুক্রমিক খুনের অভিজ্ঞতা, তাদের প্রশান্ত চোখের আড়ালে শত শত বছরের সাফল্যের ইতিকথা।

কোম্পানির আমলে সে-ইতিকথা ক্রমেই আরও কলঙ্করঞ্জিত হয়ে উঠেছে। কেননা, বহুকাল পরে ভারত আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। রাজন্যবর্গের স্বাধীনতা অপহৃত হচ্ছে বটে, কিন্তু পথে পথে প্রজার স্বাধীনতা বেড়েছে। নায়কহীন উচ্ছৃঙ্খল সে বাহিনীর যদৃচ্ছ লুঠতরাজ ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। দিকে দিকে কোম্পানির শাসন প্রসারিত হচ্ছে। তাছাড়া ফৌজের আনাগোনা হেতু পথের অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। মানুষ এখন আর পথকে ভয় পায় না। ব্যবসায়ীরা ঘোড়ার পিঠে মোট চাপিয়ে বাণিজ্যে বের হচ্ছে, সুদূর দক্ষিণ থেকে তীর্থযাত্রীর দল উত্তরে চলেছে, কোম্পানির দরবারে কাজের ধান্ধায় গাঁয়ের গরীব দল বেঁধে শহরের দিকে চলেছে। পথে পথে তখন অনেক মানুষ। স্বভাবতই অনেক ঠগীও। কোম্পানির মশালের আলো ওদের কাছে সেদিন অন্ধকারের ইশারা। আলোর টানে ঘরছাড়া মানুষ নিজেদের অজানতে এগিয়ে যাচ্ছে পথের ধারে ধারে খাটান তাঁবুগুলোর দিকে। গাছতলায় বিছান মাদুরগুলোতে বসছে,

তামাক খাচ্ছে, গল্প করছে। দিনের ক্লান্তি তামাকের ধোঁয়ায় উবে যাচ্ছে। সন্ধ্যা মনোরম হয়ে উঠছে। হঠাৎ ক্ষুধার্ত সরীসৃপের মত নিঃশব্দে তাদের ঘাড়ে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ছে নিষ্ঠুর মৃত্যু। প্রতি সন্ধ্যায় শত শত বৃক্ষতলে উচ্চারিত হচ্ছে ভবানীর আদেশ, মৃত্যু-পরোয়ানা—তামাকু লেও!

অথচ আশ্চর্য এই, ভারত সে খবর তখনও জানে না। তার নিশ্চিন্ত, উদাসীন, নির্বিকল্প মুখের দিকে তাকালে সে ঘটনা যেন ভাবাও যায় না।

৮

একজন ভেবেছিলেন।

তিনি আর-এক 'ঠগী'। ফিরিঙ্গী 'ঠগী'। ভারত-ইতিহাসে নাম তাঁর উইলিয়াম হেনরী স্লীম্যান। সমসাময়িক ইউরোপীয়ানরা বলতেন 'ঠগী স্লীম্যান'।

শীতশেষে ভারতের নানা রাজ্যের ভবানী-শিষ্যরা যখন অগণিত প্রাণের অর্ঘ বহন করে শত শত মাইল পায়ে হেঁটে ভক্তিবিনম্র চিত্তে কালীঘাটের পথিক, তখন চিৎপুর রোডের অদূরে লালদীঘির দক্ষিণ তীরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একটি নির্জন কক্ষে উনিশ বছরের এক তরুণ ইংরেজ একটি ভ্রমণ-কাহিনীর পাতায় মগ্ন।

মাত্র মাস কয় আগে তিনি এদেশের মাটিতে নেমেছেন। কিন্তু এদেশ সম্পর্কে আন্তরিক আগ্রহ তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। কেননা, কর্ণওয়ালের যে পরিবারে তাঁর জন্ম, ইংল্যাণ্ডে সৈনিকের পরিবার হিসেবে চিরকাল তাঁরা সুপরিচিত। বাবা ক্যাপ্টেন ফিলিপ স্লীম্যান সৈনিক ছিলেন। আট ভাইয়ের মধ্যে তিনজন নৌবাহিনীতে, একজন স্থলবাহিনীতে। পঞ্চম পুত্র উইলিয়াম সেই বাল্য বয়সেই মনে মনে স্থির করেছিলেন, তিনিও সৈনিক হবেন, এবং আর কোথাও নয়, সৈনিক জীবন কাটাবেন তিনি স্বপ্নের দেশ হিন্দুস্তানের মাটিতে। এ স্বপ্ন সেদিনের কোন উচ্চাভিলাষী তরুণের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ, মাত্র দশ বছর আগে শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধ হয়ে গেছে।

কোম্পানির শাসন সবেমাত্র স্থায়ী রাজত্বের চেহারা নিচ্ছে। অর্থ, বিত্ত, রোমাঞ্চ,—হিন্দুস্তান তখনও অভিযাত্রীর কাছে স্বর্গ-রাজ্য। এদেশের নামে যে কোন তরুণ ইংরেজ সেদিন উন্মাদ। তবুও জনৈক ফিলিপ-পুত্র উইলিয়ামের কথা বিশেষ করে বলতে হচ্ছে, কারণ, অন্যদের সঙ্গে তার স্বপ্নের কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছিল। এই বালকটি শুধু 'প্যাগোডা ট্রি' নামে টাকার গাছটির স্বপ্নেই বিভোর ছিল না, ইতিহাসের অনুরাগী ছাত্র হিসেবে অদেখা ভারতের মাটিকেও সে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছিল। কলকাতায় নামবার পরক্ষণেই তার মুখে গড়গড় হিন্দুস্তানী ভাষা শুনে ফোর্ট উইলিয়ামের বুড়ো কর্ণেল সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর একটু নড়েচড়ে বসে বলে উঠেছিলেন, 'বর্ণআউট হিয়ার ?'

'নো স্যার!' সগর্বে উত্তর দিয়েছিল কর্ণওয়ালের খাঁটি ইংরেজ উইলিয়াম।

ইতিমধ্যে বারাসতের শিক্ষানবিশী সাঙ্গ করে ১৫ নম্বর নেটিভ ইনফেন্ট্রির সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে এসেছেন। অযোধ্যা, নেপাল, উত্তর ভারতের অনেকখানিই তাঁর দেখা হয়ে গেছে। পথে পথে হিন্দুস্তানীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উর্দু, ফার্সী, পোস্তু, গোর্খালি ইত্যাদি আরও কয়টি ভাষা। এমন সময় হঠাৎ নির্দেশ এল ব্যারাকপুরে ফিরতে হবে। উইলিয়ামের কাছে ব্যারাকপুরের চেয়ে ঢের বেশী আকর্ষণ নেপাল সীমান্তের। তবুও কোম্পানির আদেশ! মনে মনে ঠিক করলেন, যদি যেতেই হয় তবে সময়টা এবার কাজে লাগাবেন।

সেই বাসনাতেই ব্যারাকপুর থেকে একদিন পা দিয়েছিলেন লাল-দীঘির ধারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লাইব্রেরীতে। সেখানে দু'দিন আনাগোনার পর বুড়ো কর্ণেল নিজেই এগিয়ে এসে পনের মাসের জন্যে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন তাঁকে। উইলিয়াম

সেখানে আরবী আর ফার্সী ভাষা শেখেন। সুযোগ পেলেই ভারত বিষয়ক বই খুলে বসেন। সেদিনও করছিলেন। কিন্তু পাতা উল্টাতে উল্টাতে এমন একটা জায়গায় এসে চোখ ঠেকল যেখান থেকে কোনমতেই আর এগোন যায় না, এগোন সম্ভব নয়।—কে ওরা?—কোথায় থাকে ওরা?—এই বিচিত্র পেশার মানুষগুলো কি এখনও আছে এই দেশে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসে ঘিরে ধরছে। স্লীম্যান আবার প্রথম ছত্রে ফিরে যাচ্ছেন।

ভ্রমণ-কাহিনীটির লেখক এম. থিভেনট নামে একজন ফরাসী পর্যটক। সপ্তদশ শতকে ভারতে এসেছিলেন তিনি। বইটি সেকালের দেখা-শোনা ভারতের বিবরণ।

কালীঘাট থেকে তীর্থশেষে তৃপ্ত ঠগীরা যখন হাল্কা মনে চিৎপুরের পথে দল বেঁধে নিজ নিজ ঘরে ফিরছে, লালদীঘির এককোণে টানা পাখার তলায় বসে তরুণ স্লীম্যান তখনও বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে পড়ছেন:

দিল্লী আর আগ্রার মধ্যবর্তী যে পথের কথা বলছি, জনপথ হিসেবে সেটি মন্দ নয়। কিন্তু সেখানে বাঘ, সাপ এবং ডাকাত আছে। বিশেষ করে কোন অচেনা পথিকের পক্ষে পথে কারও কাছাকাছি হওয়া নিরাপদ নয়। কেননা, বিশ্বের সবচেয়ে ধূর্ত ডাকাতদলের বাস এখানে। পৃথিবীতে এমন নিপুণ, এমন বিচক্ষণ খুনী আর হয় না। যাত্রীরা নাগালে আসামাত্র তারা একটা ফাঁস ছুঁড়ে দেয়। নির্ভুল তাক ওদের। ফাঁসটা ঠিক গলায় পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রান্ত টেনে ধরে পথিককে ওরা ধরাশায়ী করে ফেলে। চোখের নিমেষে সব শেষ।

কখনও কখনও শিকারকে ওরা আরও এক অভিনব কৌশলে প্রতারিত করে। চলতে চলতে পথিক হঠাৎ দেখতে পাবেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে একটি সুন্দরী রমণী কাঁদছে। নির্জন বনপথে একাকিনী অসহায় নারীকে দেখে কে না থমকে দাঁড়াবেন? পথিক স্বভাবতই

তার দিকে এগিয়ে যাবেন। রমণী ইনিয়ে-বিনিয়ে তাঁর কাছে নিজের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করবে। সমবেদনায় পথিকের চোখেও জল আসবে। তিনি এবার পুরো কাহিনীটাই শুনতে চাইবেন। ক্রমে দু'জনে সাময়িক ঘনিষ্ঠতা হবে। পথিক রমণীর অনুরোধমত তাকে পরবর্তী গঞ্জ বা শহরে পৌঁছে দিতে রাজী হবেন। সঙ্গিনীকে পেছনে বসিয়ে তিনি আবার ঘোড়ার পিঠে চাপবেন। ক'মিনিট পরেই রূপসী নিজ মূর্তি ধারণ করবে,—কোমর থেকে নিঃশব্দে ফাঁসটা বের করে পেছন থেকে তা উপকারীর গলায় পরিয়ে দেবে। তার সঙ্গীরাও কাছে-ভিতেই থাকে। তারা ছুটে এসে বাকীটুকু সমাধা করবে।···

যতবার পড়েন ততবারই স্লীম্যানের চোখে মুখে এক অস্ফুট জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে, এখনও কি আছে ওরা—সেই অজ্ঞাত খুনীরা? কলকাতায়, ব্যারাকপুরে, বারাসতে; বেগম-জনসনের বৈঠকখানায়, সৈন্যদের ব্যারাকে, শহরতলীর হাটে—পুরানো মানুষ যাঁকেই সামনে পান তাঁকেই জিজ্ঞেস করেন স্লীম্যান—আজও কি এদেশে বেঁচে আছে থিভেনটের কালের সেই ডাকাতেরা? সপ্তদশ শতকের খুনীরা?

কিন্তু বৃথাই খ্যাপার মত খুঁজে ফেরা। স্লীম্যানের এই জিজ্ঞাসার উত্তর কেউ জানে না। না কোম্পানির পুরানো অফিসাররা, না ব্যারাকপুরের হিন্দুস্তানী বাসিন্দারা।

ক'বছর পরে নিজেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ লাইব্রেরীতে কুড়িয়ে পাওয়া সেই জিজ্ঞাসার উত্তর। এবারও পুরানো কাগজের স্তূপে, প্রাণহীন একটি পাণ্ডুলিপিতে।

কলকাতায় নামবার (১৮০৯) আট বছর পরের কথা। সৈনিকের বেশে তারা-মীর্জাপুর, দিনাপুর, গোরখপুর, নানা জায়গা ঘুরে, সগৌরবে গোর্খা যুদ্ধ (১৮১৪-১৬) সেরে স্লীম্যান তখন এলাহাবাদে। সেদিনের অস্থির ভারতে কোম্পানির ফৌজের বিশ্রাম নেই। আজ এখানে,

কাল সেখানে। স্লীম্যানও তখন ব্যস্ত পথিক। তিনি সাহসী সৈনিক। কিন্তু পথে পথে যেখানেই তিনি অচেনা মানুষের ভীড় দেখেন সেখানেই যেন কেমন অমনোযোগী হয়ে ওঠেন। কর্ণেল জিজ্ঞাসা করেন, এত কি দেখবার জিনিষ এই হিন্দুস্তানীর দলটিতে ? ধরা পড়ে লজ্জিত স্লীম্যান ঘাড় হেঁট করে উত্তর দিতেন, 'বেগ ইওর পারডন স্যার !—আমি থিভেনটের দেখা খুনীদের খুঁজছিলাম !'

অনেক খুঁজেছেন। কখনও গাঁয়ের পথে গাছতলায় বসা মানুষ-গুলোর মুখে, কখনও গমের ক্ষেতে দল বেঁধে কাজ করছে যারা তাদের বাহুতে, কখনও ফেরীঘাটের ভীড়ে, হুঁকোর ধোঁয়ার অন্ধকারে, হাট-ফেরত জনতার দঙ্গলে, পসারিনী রূপসীর চোখে। কিন্তু কোথাও ওরা নেই।

অবশেষে এলাহাবাদ। শত শত মাইল পথে, শত শত গাঁ-গঞ্জে যা পাওয়া গেল না, অবশেষে এলাহাবাদে পুরানো কাছারি বাড়িটার পুরানো একটি তাক সে উত্তরই তুলে দিল তাঁর হাতে। থিভেনটের চেয়ে আরও তাজা সে বিবরণ, আরও প্রামাণ্য।

স্থানীয় কালেক্টার পুরানো বন্ধু। ছাউনি থেকে সৈনিক মাঝে মাঝে তাঁর অফিসে যান। অলস বিকেলগুলো নানা কথায় কাটিয়ে আবার নিজের ছাউনিতে ফিরে আসেন। কথাপ্রসঙ্গে সেদিন যথারীতি থিভেনটের কথা উঠল। কালেক্টার বললেন, সে ধরনের একটা কিছু ছিল বলে আমিও শুনেছি।

—কোথায় ? সঙ্গে সঙ্গে স্লীম্যান হাত চেপে ধরলেন তাঁর।

—সম্ভবত তাও কোন বইয়ের পাতায়। চোখ বুজে বন্ধু কালেক্টার কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, তুমি এই তাকটা একটু হাতড়ে দেখতে পার। যতদূর মনে পড়ছে বইটা বোধহয় এখনও এখানে আছে !

স্লীম্যান তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে গেলেন। কাগজের পাহাড়

ঘাঁটতে ঘাঁটতে অবশেষে হাতে উঠল সেই মূল্যবান সম্পদ। বই নয়, একটি পাণ্ডুলিপি। লেখক—ডাঃ রিচার্ড শেরউড। পরিচয়-ছত্রটি থেকে জানা যাচ্ছে, তিনি মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জের সার্জন ছিলেন। সমগ্র রচনাটি আসলে একটি রিপোর্ট। বিষয়বস্তু তার ফাঁসীগীর বা আরিতুলুকর, বা তান্তাকেলেরু বা ওয়ারলু ওয়ান্দুলু নামে এক বিচিত্র খুনী সম্প্রদায়। নাতিদীর্ঘ রিপোর্ট। কিন্তু রচনাকাল অত্যন্ত সাম্প্রতিক, মাত্র সেদিন—১৮১৬ সন। স্লীম্যান সেখানে দাঁড়িয়েই তা পড়তে লাগলেন।

ডাঃ শেরউড লিখছেন—১৭৯৯ সনে শ্রীরঙ্গপত্তমের পতনের পর বাঙ্গালোরের পথে প্রায় একশ' ফাঁসীগীরের একটি দল ধরা পড়েছিল। ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে তাদের সেই প্রথম মোলাকাত। উত্তরে দিল্লী এবং আরও দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুরেও একবার আরও তু'টি দল ধরা পড়েছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালোরের দলটাই তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ওদের অবশ্য প্রমাণাভাবে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ডাঃ শেরউড তাদের থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছেন। কেননা, কে জানে, কোনদিন হয়ত তা দরকার হবে।

আনন্দে কাঁপতে লাগলেন স্লীম্যান। তাঁর হাতে পাণ্ডুলিপিটা কাঁপছে। হাতে-লেখা বাঁকা বাঁকা হরফগুলো কাঁপছে। যেন দলের পর দল ফাঁসীগীর সার বেঁধে ছুটছে। রিপোর্টের শেষে ডাঃ শেরউড ভবিষ্যতের জন্যে আরও কিছু সঞ্চয় রেখে দিয়েছেন। পরিশিষ্ট হিসেবে তিনি এই ফাঁসীগীরদের ভাষারও কিছু কিছু নমুনা দিয়েছেন। স্লীম্যান আর পারলেন না। রিপোর্টটি বন্ধ করে বন্ধুকে বললেন, অশেষ ধন্যবাদ। আজকের মত আমি এটি নিয়ে যাচ্ছি, কাল আবার ফেরত পাবে!

সে রাত্তিরে আর ঘুম হল না। ডাঃ শেরউডের সংগৃহীত শব্দগুলো যেন হরফের বন্ধন ভেঙ্গে কানের গোড়ায় চিৎকার করছে—পান

লেও! তামাকু লেও! উদ্যোগী সৈনিক ইতিমধ্যে হিন্দুস্তানের অনেক ভাষা শিখে ফেলেছেন। এ ভাষাও তাঁকে শিখতে হবে, আওয়াজ ধরে খুঁজে বের করতে হবে খুনীকে। যেখান থেকে হোক, আর যেদিনই হোক।

সে সুযোগও এল একদিন। এবং এল অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। ১৮২২ সনের কথা। স্লীম্যান তখন আর সৈনিক নন। তিন বছর আগে সৈনিকের পোষাক ছেড়ে সিভিল সার্ভেণ্টের কোট গায়ে চাপিয়েছেন তিনি। ইচ্ছে ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা করেন। কেননা, সামনে তৎক্ষণাৎ কোন যুদ্ধ নেই। ১৮১৮ সনের মারাঠা যুদ্ধেও তাঁর বাহিনীকে রণাঙ্গনে যেতে হয়নি। দ্বিতীয়ত, পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে সৈনিক লড়াইয়ের মাঠের মত ফসলের মাঠগুলোকেও ভালবেসে ফেলেছেন। চাষীদের তিনি ভালবাসেন। তালুকদার-জোতদার বনাম চাষীর বিবাদ সম্পর্কে আন্তরিক আগ্রহ তাঁর। ইতিমধ্যেই অযোধ্যার ভূতত্ত্ব এবং সেখানকার রাজস্বনীতি সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছেন তিনি। সেগুলো নিয়ে ভাববার বিষয় অনেক। তৃতীয়ত, তাঁর ভাষাপ্রীতিও ইতিমধ্যে প্রায় ভাষাবিদের স্তরে উন্নীত হয়েছে। শুধু হিন্দুস্তানের মানুষের মুখের ভাষা নয়—আরবী, ফার্সী, হিন্দি, নানা ভাষার সাহিত্যেও তাঁর দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা হয়ে গেছে। তাও কাজে লাগান আবশ্যক। ১৮১৯ সনের ২২শে আগস্ট তারিখে তাই অভাবিত একটি দরখাস্ত নিয়ে তিনি তাঁর বাহিনীর অধিপতি কর্ণেল গ্রেগরীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। চমকিত কর্ণেল দরখাস্তটার ওপর চোখ বুলিয়ে ধীর স্বরে বলেছিলেন, অসম্ভব! এ জিনিষ কখনও আমি সুপারিশ করতে পারব না!

অসহায় স্লীম্যানের মুখে কাতরোক্তি শোনা গিয়েছিল, কিন্তু…

—কোন কিন্তু নয় স্লীম্যান, এই রয়েছে কলম, এই কালি। গ্রেগরী সামনের দোয়াতদানটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।—এখানে বস, তারপর কোন কথা না বলে আমি যা বলছি তাই লিখে যাও। তোমার মত একটি তরুণকে তো আমি আর স্কুল-মাস্টারে পরিণত হতে দিতে পারি না!

স্লীম্যানের সাহস ছিল না বৃদ্ধ কর্ণেলকে তিনি অমান্য করেন। কেননা, গ্রেগরীর গলায় সেদিন বাবা ফিলিপ স্লীম্যানের কণ্ঠস্বর।

সুতরাং, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপকের পদপ্রার্থনার বদলে দরখাস্তটি লিখিত হয়েছিল পলিটিক্যাল সার্ভিসে যে কোন আসনের জন্যে। ক'মাস পরে, ১৮১৯ সনের এক ভোরে খবর এল, তাঁর সে আরজি মঞ্জুর হয়েছে। কলকাতা থেকে গভর্ণর-জেনারেলের আদেশ এসেছে সৈন্যবাহিনী থেকে তাঁকে ছেড়ে দিতে। স্লীম্যান এখন থেকে সিভিল সার্ভেন্ট। তাঁর নতুন পদ—সগরে তিনি গভর্ণর-জেনারেলের একজন প্রতিনিধি—'জুনিয়ার অ্যাসিস্টেন্ট টু দি এজেন্ট অব দি গভর্ণর-জেনারেল ইন সগর এণ্ড নর্মদা টেরিটোরিস।' ইতিমধ্যে পদোন্নতিও হয়ে গেছে তাঁর। ১৮২২ সনে তিনি নর্মদা উপত্যকার নরসিংপুর জেলার প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন। উপস্থিত সরকারী নির্দেশে জব্বলপুরে চলেছেন। সেখানে মিঃ মলোনিকে মাস কয়েকের জন্য তাঁর কাজে সাহায্য করতে হবে। মলোনি জব্বলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট।

ভোরে কাছারিতে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন স্লীম্যান। প্রধান শাসক মিঃ মলোনি সাদরে গ্রহণ করলেন তাঁকে।—ভালই হল স্লীম্যান, আমাদের এখানে এখন লোকের ভীষণ টানাটানি!

—বলুন স্যার, আমাকে কি করতে হবে? স্লীম্যান সবিনয়ে উত্তর দিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের

সামনে বটগাছতলায় একদল লোক তল্পিতল্পা নিয়ে বসে আছে। কাজের কথা একপাশে ঠেলে দিয়ে স্লীম্যান জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কারা স্যার? ঐ যে আপনার কাছারির সামনে বসে বসে জটলা করছে লোকগুলো, ওদের কথা বলছি স্যার!

মলোনি হাসলেন। এদিককার আর সব রাজকর্মচারীর মত তিনিও জানতেন, স্লীম্যানের ঠগী খোঁজার বাতিক আছে। তিনি বললেন, সঙ্গে রকমারি জিনিষপত্র রয়েছে, দেখে মনে হয়েছিল চোরাই মাল। কিন্তু কোন সাক্ষী-সাবুদ নেই। মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিতে হবে।—বেশ তো, তুমি ওখান থেকেই কাজ সুরু কর-না কেন? বিস্তর কেস জমে গেছে। ঘাঁটতে ঘাঁটতে চাই কি তোমার ঠগীও দু'চারটে মিলে যেতে পারে!

মলোনির শেষ বাক্যটিতে প্রচ্ছন্ন একটু উপহাসের রেশ ছিল। স্লীম্যানের তা নজর এড়াল না। তিনি বললেন, কোনদিন খুঁজে বের করতে পারব কি পারব না সে কথা জানি না, কিন্তু ঠগী যে সত্যিই আছে এ বিষয়ে আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ। আমার কি মনে হয় স্যার, জানেন? সিন্ধু থেকে কুমারিকা পর্যন্ত ওরা একটি বিরাট দল, বিরাট কোন গাছের মত। চারদিকে তার ডালপালা ছড়িয়ে আছে। যে কোন একটি শাখায় হাত দিন, গোড়াটা খুঁজে বের করা তারপর আর মোটেই কষ্টকর কিছু নয়। অবশ্য আমি জানি, লোকে আমার এইসব কথা শুনে হাসে।

—সে কথা ঠিকই অনুমান করেছ তুমি স্লীম্যান! এবার স্পষ্ট সহানুভূতি মলোনির গলায়। এবার আর তিনি হাসতে পারলেন না। স্লীম্যানের পিঠে হাত রেখে তিনি বললেন, ঠিকই লোকে তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। কিন্তু তার জন্যে মন খারাপ করে কি লাভ? আমরা জানি, তুমি ঠগীর ঘোরে আছ; তাই থাক। উই উড নট হ্যাভ ইউ আদারওয়াইজ, মাই ল্যাড! জান, ওরা তোমার কি নাম

দিয়েছে ? মলোনি কথাটা বলেই তাঁর কেরানীর দিকে তাকালেন, *বাবুজী, গাছতলার ঐ লোকগুলোকে আর বসিয়ে রেখে কোন লাভ নেই। ওদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী-প্রমাণ পাচ্ছি না, ওদের ছেড়ে দিন !*

কেরানী ঘর ছাড়ামাত্র মলোনি আবার নিজের কথায় ফিরলেন, অফিসে-আদালতে, জিমখানায়, অফিসারদের মেসে ওঁরা তোমাকে কি নামে ডাকে তা তুমি শুনেছ ?

কৌতূহলী স্লীম্যান মাথা নাড়লেন, না।

মলোনি বললেন, ঠগী স্লীম্যান !

স্লীম্যান হেসে উঠলেন। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে নিয়ে এতদূর এগিয়ে গেছেন তা তিনি তখনও জানেন না। মনে মনে তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন 'ঠগী', 'ঠগী',—'ঠগী স্লীম্যান'। হয়ত এ নামের আদি ব্যঙ্গ, হয়ত বিদ্রূপ, হয়ত সহানুভূতি। যে সূত্রেই তাঁর ভাগ্যে জুটে থাকুক নামটা, এ নাম তাঁকে রাখতেই হবে। তাঁকে 'ঠগী স্লীম্যান'ই হতে হবে। মনে মনে সেই সংকল্প নিয়েই মলোনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্লীম্যান কোর্ট ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

কোর্ট ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন স্লীম্যান। তাঁর মাথায় তখনও মলোনির কথাগুলো ঘুরছে। ওরা তাঁকে নিয়ে হাসে, মলোনির মত যাঁরা, তাঁরা তাঁকে ভালবাসে বলেই সহানুভূতি জানায়, বাকী সকলে হাসে ; উপহাস করে। ওরা তাঁর নাম রেখেছে ঠগী স্লীম্যান। স্লীম্যান, আমি স্লীম্যান আজ সকলের উপহাসের পাত্র, করুণার পাত্র ! অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে করতে স্লীম্যান আবার জানালাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁর সামনে সগরের পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে একদল মানুষ। গাছতলার সেই দলটি। মলোনি ছেড়ে দিয়েছেন। তল্পি-তল্পা নিয়ে ওরা আবার পথে নেমেছে, ধীরে ধীরে হাঁটছে। মাথায়

তাদের পাগড়ী, গায়ে ধুলোয় ধুলোয় বিবর্ণ কামিজ, পিঠে পিঠে নানা আকারের পুঁটুলি। সঙ্গে গোটা ছয় ছোট ছোট টাট্টুও রয়েছে। ক্লান্ত, অলস পায়ে তারা হাঁটছে। খুরে খুরে ধুলো উড়ছে। 'ঠগী স্লীম্যানে'র ভাবনা ছেড়ে স্লীম্যান হঠাৎ যেন আবার নিজের মধ্যে ফিরে এলেন। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। তাঁর হঠাৎ থিভেনটের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল ডাঃ শেরউডের কথা। তাছাড়া, ইতিমধ্যে তিনি নানা সূত্রে আরও কিছু কিছু খবর জোগাড় করেছেন। একের পর এক সেগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

প্রথম খবর: ১৮০৭ সনে চিতোর এবং আর্কটে দু'টি দল ধরা পড়েছিল। কিন্তু প্রমাণাভাবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় খবর: ১৮০৯-১০ সনে, অর্থাৎ স্লীম্যান যে বছর এদেশের মাটিতে প্রথম পা দেন, সে বছরই দোয়াবে পথের ধারে কয়েকটি কুয়োয় তিরিশটিরও বেশী মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু খুনীদের হদিস করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় খবর: সে বছরই ইংরেজ ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল লীগার দেশওয়ালী সিপাইদের হুঁসিয়ার করে দিয়ে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল—অচেনা পথিকদের বিষয়ে সাবধান!

স্লীম্যানের মনে কোন সন্দেহ নেই, সকলে না হোক, কোম্পানির কলকাতা-কাউন্সিল উনিশ শতকের সূচনা থেকে অন্ততঃ এই রহস্যময় খুনের কথা অবহিত ছিলেন। সেদিন তাঁদের পক্ষে এদিকে মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ নেই, সকলেই নিজেদের ঘর সামলাবার কাজে ব্যস্ত। তাছাড়া, সমগ্র দেশে তখন এক আশ্চর্য নির্লিপ্ততার মনোভাব,—ওরা তো আর ইউরোপীয়ানদের খুন করেনি! কেউ কেউ আরও দার্শনিক ছিলেন। তাঁরা বলতেন—একই বর্বরতা তো যুদ্ধও। সেখানেও আমরা মানুষ হয়েও মানুষকে সানন্দে খুন করি, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিই, শহরকে মরুভূমি করে তুলি। সুতরাং বিশ্বময়

যেখানে এত হানাহানি, খুনোখুনি সেখানে ভারতের গাঁয়ের পথে কে ফাঁকিতে পড়ে নিজের অজানতে মারা গেল তার জন্মে ভেবে মরে লাভ কি ? কোম্পানির হাত গুটিয়ে বসে থাকার আর একটি কারণ, স্লীম্যান জানতেন, রাজ্যাভিলাষী বণিকেরা হিন্দুস্তানের মানুষের ধর্মকে সম্মান দিয়ে তাদের হাতে রাখতে চান। স্লীম্যান শুনেছেন, উত্তর ভারতে একবার জনৈক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে ছিয়াত্তর জনের একটি দলকে হাজির করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে সতের জন প্রাণের মায়ায় নিজেদের অপরাধ স্বীকারও করেছিল। কিন্তু তাদের মুখে ভবানীর উল্লেখ শুনে ম্যাজিস্ট্রেট তৎক্ষণাৎ তাদের ছেড়ে দেওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। কেননা, তাঁর মনে হয়েছিল এদের শাস্তি দিলে তা ধর্মে হাত দেওয়ারই সামিল হবে। স্লীম্যান আবার পায়চারি স্থরু করলেন—কাওয়ার্ডস্! কি ধর্ম, আর কি ধর্ম নয়, রাজত্বের লোভ সেটুকু বলার সাহসও কেড়ে নিয়েছে আমাদের ? ছিঃ!

জানালা থেকে ততক্ষণে পথিকের দলটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। তুপুরের রোদ্দুরে সগরের পথ ঝিমুচ্ছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় ধুলো উড়ছে। কখনও কখনও খেলাছলে দমকা হাওয়াই ঘূর্ণি সাজছে। ধুলোর কুণ্ডলী ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠে যাচ্ছে, মুঠো মুঠো আবীরের মত চারদিকে রাঙা ধুলো ছড়িয়ে পড়ছে। স্লীম্যান উদাসীর মত সেদিকে তাকিয়ে আছেন। কেরানী কখন এসে নতুন সাহেবের জন্মে ফাইলের পাহাড় সাজিয়ে রেখে গেছে সেদিকে তাঁর নজর নেই। পাশের টেবিলে তুপুরের টিফিন পড়ে আছে। কিন্তু স্লীম্যান তার কথাও ভুলে গেছেন। এক-একটা চিন্তা তাঁর মাথায় আসছে, পাক খাচ্ছে, আবার ভেঙ্গে পড়ছে। কখনও থিভেনট, কখনও মলোনি, কখনও ডাঃ শেরউড, কখনও বা এইমাত্র হারিয়ে যাওয়া লোকগুলো। মনে তাঁর জব্বলপুরের তুপুর—তীব্র, উদাসীন, এলোমেলো!

—সাহেব! কার পায়ের শব্দে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল। কিন্তু

স্লীম্যান তবুও নড়লেন না। পেছনে না তাকিয়ে জানালায় চোখ রেখেই বললেন, কে তুমি? কি চাই!

—সাহেব! লোকটি এবার যেন তাঁর ঠিক পেছনেই। স্লীম্যান সৈনিকের ভঙ্গীতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। সেলাম করে এক পা পেছনে সরে গেল লোকটি।—সাহেব, আমি কল্যাণ সিং!

—কল্যাণ সিং? স্লীম্যান ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। হ্যাঁ, মুখটা চেনা-চেনা ঠেকছে বটে। অন্য সময় হলে অনেক আগেই মনে পড়ে যেত। কিন্তু এখন তাঁর মন অন্যত্র। তিনি ঠগীর চিন্তায় মগ্ন। ঠগী এবং 'ঠগী স্লীম্যানে'র চিন্তায়। সুতরাং লোকটিকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেই তিনি ছাদের কড়িগুলোর দিকে তাকালেন।

ভাব দেখে বোঝা গেল কল্যাণ সিংকে চিনতে হলে এখন তাঁর কিছুক্ষণ সময় লাগবে। সুতরাং, কল্যাণ সিং নিজেই এগিয়ে এল তার পরিচয় দিতে—সাহেব, আমি কোম্পানির আস্তাবলে কাজ করতাম।

—ওঃ। মুহূর্তে সমস্ত ঘটনাটা স্লীম্যানের মনে পড়ে গেল।—তুমি ঘোড়ার দানা চুরি করতে, তাই তোমাকে আমি তিন মাসের জন্যে জেলে পাঠিয়েছিলাম, তাই না?

কল্যাণ ঘাড় হেঁট করল,—হ্যাঁ, হুজুর! আপনি দেওতা! আমি জেলে গেলাম তো আপনি আমার ছেলেমেয়েদের তিনমাস নিজের কুঠিতে রেখে খাওয়ালেন—

—হুঁ। কিন্তু কল্যাণ সিং, আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি আবার ঝঞ্ঝাটে পড়বে! স্লীম্যানের মনে হল কিছুক্ষণ আগে গাছতলার সেই দলটিতে কল্যাণ সিংকেও যেন তিনি দেখেছেন। তিনি বললেন, তুমি আবার বদ লোকের সঙ্গ নিয়েছ কল্যাণ সিং!

—ওরা যে খারাপ লোক তা আপনি জানেন সাহেব? কল্যাণ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভয়ে তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।—সাহেব, আপনি অন্তর্যামী, আমাকে আপনি

দয়া করুন, আমি আর ওদের দলে থাকতে চাই না সাহেব! বলতে বলতে কল্যাণ স্লীম্যানের পা ছুটো জড়িয়ে ধরল।

স্লীম্যান এতটা আশা করেননি। তাঁর মনে হল, ঈশ্বর যেন তাঁর কথা শুনেছেন। এই কল্যাণ সিংকেই তিনি তাঁর ইজ্জত রক্ষার্থে দূত করে পাঠিয়েছেন। তিনি আর ওকে অবহেলা করতে পারেন না।—কেন? দল ছাড়তে চাইছ কেন? ওরা বুঝি ঠিকমত ভাগ দেয়নি?

—না সাহেব, ওদের সর্দার তুর্গা বড় নিষ্ঠুর।

—হুঁ, আমি জানি। স্লীম্যান অন্ধকারে আবার একটা ঢিল ছুঁড়লেন।—তুর্গা কথায় কথায় খুন করে, তাই না?

কল্যাণ সিং স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সাহেবের মুখের দিকে. তার চোখ ছুটো যেন মরা মানুষের চোখ, তাতে পলক নেই, প্রাণ নেই। এত বড় জোয়ান মানুষটার শরীরে যেন কোথাও আর এক ফোঁটা চেতনা নেই, সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। কল্যাণ সিং যেন মরে গেছে।

—কি, চুপ করে রইলে কেন? ধমকে উঠলের স্লীম্যান।—আমি যা বললাম সে কি মিথ্যে?

—না। যাতুকরের কবলে পড়া বিমূঢ় বালকের মত মাথা নেড়ে উত্তর দিল কল্যাণ সিং, না হুজুর!

ব্যস! আর একটি কথা নয়। ভাল চাও তো তবে চল আমার সঙ্গে। বলতে বলতে স্লীম্যান ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তারপর অদূরে বসা সিপাইটিকে ডেকে বললেন, সহিসকে বল এক্ষুনি আমার ঘোড়া বের করতে! বলেই সাহেব আবার নিজের কামরায় ঢুকলেন। পেছনে পেছনে তাঁর মন্ত্রমুগ্ধ কল্যাণ সিং। সে যেন কিছু বলতে চাইছে, অথচ বলতে পারছে না। তার ঠোঁটে জিভেও শক্তি নেই। তাছাড়া হাওয়ায় জরুরী কিছুর গন্ধ পেয়ে সিপাইটিও ততক্ষণে

এসে সামিল হয়ে গেছে। সাহেবের দিকে তাকিয়ে তারও কিছু বলবার সাহস নেই।

নিজের ঘরে ঢুকেই প্যান্টটাকে পাল্টে একটা ব্রিচেস পরে ফেললেন স্লীম্যান। তারপর পা দুটো বুটের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে চাবুকটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখে পড়ল সামনে টেবিলে তখনও দুপুরের টিফিনটা পড়ে আছে। বাক্সটা খুলে তিনি ক'টুকরো রুটি পকেটে ফেললেন। তারপর একলাফে বারান্দা পেরিয়ে আস্তাবলের দিকে পা বাড়ালেন। শংকিত সিপাই শুনল, সাহেব চলতে চলতে বলে গেলেন, থানাদারকে বলবে সগরের পথে এক্ষুনি একদল পুলিশকে পাঠিয়ে দিতে! আমার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন মাঝ পথ থেকে ফিরে না আসে! আর, পেছনের দরজা দিয়ে এই লোকটিকে ফাটকে নিয়ে যাবে।—কল্যাণ সিং, তোমার পক্ষে আপাতত সেটাই হবে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা, নয় কি?

—হ্যাঁ হুজুর! উত্তর দিয়েছিল কল্যাণ সিং। কিন্তু সাহেব সে উত্তর শুনে যেতে পারেননি। ততক্ষণে তিনি কম্পাউণ্ডের ওপারে সহিসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঘোড়ার গদী ঠিক করছেন। ওরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল, চোখের নিমেষে তিনি লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন, তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে মুহূর্তে তিনি উধাও হয়ে গেলেন।

একরাশ ধুলোর মধ্যে ঘোড়াটা যখন থামল তখন অ্যাডজুট্যান্ট বাংলোর সবিস্ময়ে দেখলেন, তার পিঠে অসময়ের আগন্তুক যিনি তিনি আর কেউ নন, স্লীম্যান। সাজানো টিফিনের টেবিল সেখানেই পড়ে রইল। তিনি বারান্দা থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে স্লীম্যানের সামনে দাঁড়ালেন।

গিভ মি এ ট্রুপ অ্যাটওয়ান্স!—উইল ইউ?—আই এম আফটার ডেকয়েটস্! উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন

স্লীম্যান। অ্যাডজুট্যাণ্ট জানতেন স্লীম্যানের তাই নিয়ম। তিনি পথে পথে পরামর্শ নেওয়ার মানুষ নন, গায়ে পড়ে তাঁকে উপদেশ দিতে যাওয়াও বাতুলতা। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে তাতে দুটো ছত্র লিখে পাশে দাঁড়ানো আর্দালির হাতে গুঁজে দিয়ে তিনি ঘোড়ার পিছু পিছু গেটের দিকে ছুটলেন,—মাই এমার্জেন্সি ট্রুপস্ উইল টার্ন আউট ইন টেন মিনিটস্ ফর ইউ! গুড লাক! শেষ কথাগুলো তাঁর কানে পৌঁছাল কিনা বোঝা গেল না। ধুলোর মেঘ গেট পেরিয়ে ততক্ষণে পথে নেমে গেছে।

বেশী দূর যেতে হল না। কিছুক্ষণ চলার পরেই পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে ঠেকল। স্লীম্যান তাকিয়ে দেখলেন অ্যাডজুট্যাণ্ট কথা রেখেছেন। তিনি তাঁর জরুরী বাহিনী পথে নামাতে সত্যিই বেশীক্ষণ সময় নেননি।

ওরা এসে সামিল হল। স্লীম্যান বললেন, তোমরা অন্তত আধ মাইল পেছনে থেকো। আমি আগে চললাম। নয়ত, এক সঙ্গে এত লোক দেখলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। বলেই তিনি আবার জোর কদমে ঘোড়া ছুটালেন।

কিন্তু মলোনির হাতে ছাড়া পাওয়া দল তখন আর কাছে-ভিতে নেই। স্লীম্যান মনে মনে সময়টা হিসেব করে দেখলেন, এতক্ষণে তাদের বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে যাওয়ার কথা। তাছাড়া এমনও তো হতে পারে, এপথ ছেড়ে তারা অন্য কোনদিকে চলে গিয়েছে! তাহলেও আগে বড় রাস্তাটা দেখে নেওয়াই ভাল। স্লীম্যান ঘোড়ার বেগ আরও বাড়িয়ে দিলেন।

চলতে চলতে প্রায় পাটনের কাছাকাছি এসে তবে দলটার নাগাল পাওয়া গেল। স্লীম্যান ওদের পাশ দিয়ে চলেছেন। যেন তিনি ওদের বিষয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহলী নন। ওরাও তার সম্পর্কে

বিশেষ উৎসাহী বলে মনে হয় না। বিরাট দল। একশ'র ওপরে মানুষ হবে। লটবহরও অনেক। ওরা আপন মনে পথের এক পাশ ধরে ছোট ছোট জটলা বেঁধে ধীরে ধীরে চলছে। সাহেব এমন মনে করতে পারবেন না যে ওরা পথে কারও কোন অসুবিধে করছে। কিন্তু তা হলেও ফিরিঙ্গীর মর্জি! হঠাৎ দেখা গেল, দলের মুখ যেখানে শেষ সাহেব সেখানে ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ওদের দিকে ঘুরে হাত তুলে কি যেন বলছেন। মনে হচ্ছে থামতে হুকুম দিচ্ছেন।

ওরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। একজন তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। স্লীম্যান মনে মনে ধরে নিলেন—এর নামই দুর্গা।

দুর্গা সেলাম করে সাহেবের একপাশে এসে দাঁড়াল।—সাহেব, আপনি কি কিছু বলতে চাইছেন?

ঘোড়ার পিঠ থেকে স্লীম্যান উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমরা বলতে পার এই পথে সগর এখান থেকে ঠিক কয় ক্রোশ হবে? তাছাড়া, কোনাকুনি পাটনের আর কি কোন পথ আছে? যদি এখন ঘোড়া ছুটাই তা হলে কি সন্ধ্যার আগে সগর পৌঁছান যাবে? আবোলতাবোল সব প্রশ্ন। দুর্গা বিজ্ঞের মত ভেবেচিন্তে এক-একটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, আর সাহেব পরক্ষণেই ঘোড়ার পিঠ থেকে আর একটা প্রশ্ন তার মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছে। দুর্গা তখনও জানে না, সাহেব তার সঙ্গে খেলছেন। ঘোড়সওয়ারদের বাহিনীটা এসে না পৌঁছান অবধি ওদের ছলনায় আটকে রাখছেন।

প্রশ্নোত্তরের ফাঁকেই একসময় দেখা গেল ওদের চারপাশ ঘিরে এসে দাঁড়িয়েছে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী। স্লীম্যান এবার ঘোড়া থেকে মাটিতে নেমে এলেন। বললেন, পথে নয়, তোমরা ঐ আমবাগানটিতে চল, তোমাদের সঙ্গে আমার কথা আছে।

দুর্গা তার দলকে সাহেবের কথামত আমবাগানে নিয়ে চলল।

স্লীম্যান বললে, এবার তোমরা বসতে পার।

দুর্গা উত্তর দিল, তা না-হয় বসছি হুজুর। কিন্তু আপনি যে কি বলতে চান তা-ই আমরা কিছু ঠাহর করতে পারছি না হুজুর!

ধমকে উঠলেন স্লীম্যান, সে পারবে কি করে? আমি বলতে চাই তোমরা ডাকাত। অমুক দিন রাত্তিরে তোমরা নরসিংপুরে ডাকাতি করেছ।

ওরা খিল খিল করে হেসে উঠল।—না সাহেব, আমরা ডাকাত নই। নরসিংপুরে আমরা জীবনে কখনও যাইনি!

স্লীম্যান নিজেও সেটা জানেন। তবুও লোকগুলোকে আরও কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখতে হবে। কেননা, পুলিশ না এলে এত বড় দলকে নিয়ে ঘোরসওয়ারদের পক্ষে জব্বলপুরে ফেরা সম্ভব নয়। তিনি বললেন, তোমরা দোষী কি নির্দোষ সে পরে বোঝা যাবে, আপাতত তোমরা এখানে বস। আমার পুলিশ আসছে। তারা এসে তোমাদের সনাক্ত করবে। ওরা যদি বলে তোমরা নরসিংপুরের সেই দল নও, তবে আর মিছিমিছি তোমাদের আটকে রাখব কেন?

দুর্গা বলল, বেশ তো, আসুক না পুলিশ! আমরা তো বসেই আছি। তবে আমি বলছি হুজুর, মিছিমিছি আমাদের ধরে রেখেছেন! আমরা তীর্থযাত্রী, আমাদের আর বসে থাকতে কি? তাতে হুজুরেরই সময় নষ্ট। দুর্গা নিজেও এবার গাছতলায় বসে পড়ল। স্লীম্যান ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তাদের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় রুমাল বিছালেন। তার ওপর বসে হাতে মাথা গুঁজলেন। সেদিকে তাকিয়ে দুর্গার মনে হল, বেয়াকুফ সাহেব যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। সে দলের অন্যদের সঙ্গে ঘরোয়া কথায় মন দিল।

ঘুম নয়, জব্বলপুরের অদূরে পাটনের পথে হিন্দুস্তানের মাটিতে বসে তরুণ সিভিলিয়ান স্লীম্যান সেদিন স্বপ্ন দেখছিলেন। তাঁর

মাথায় তখন সেদিনই সকালে শোনা মলোনির কথাগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে। ওরা তাঁকে পাগল বলে, ওরা তাঁকে উপহাস করে, ওরা তাঁর নাম রেখেছে 'ঠগী স্লীম্যান!' তাঁকে এই নামের মর্যাদা রাখতেই হবে।

লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। স্লীম্যান তন্ময় হয়ে সে কথা শুনছেন। কখনও কানে আসছে 'সামচানি'—খরগোস, কখনও 'রেকলান'—শেয়াল। কখনও একজন কথার ফাঁকে বলছে 'সেটাক'—সোনাদানা, কখনও 'ক্রুস'—টাকা, কখনও বা 'নিয়ামেত ভিটু'—ধনী হিন্দু। সে সব কথা যেন এক অভাবিত স্বপ্নলোকের। ডাঃ শেরউডের ছাত্র তার সব অর্থ না বুঝলেও এটুকু বুঝে গেছেন, তিনি একদল ঠগীর মধ্যে বসে আছেন। সেই ঠগী, এদেশের মাটিতে নামবার পর থেকেই যা তাঁর ধ্যান, স্বপ্ন।

ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে সাহেবের গলায় ফাঁস পরিয়ে দিতে পারে ওরা। এত বড় দলের পক্ষে ক'টি ঘোড়া আর জনাকয় সিপাই উধাও করে দেওয়াও ওদের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। স্লীম্যান তা জানতেন। কিন্তু তবুও সেদিন একবারও মৃত্যুভয় উঁকি দেয়নি তাঁর মনে। কারণ, স্লীম্যান সেদিন স্বপ্নাবিষ্ট মানুষ। তার মনে একমাত্র ধ্যান তখন ঠগী।

পুলিশ এল।

তুর্গার দল নিয়ে আবার জব্বলপুরের পথ ধরলেন স্লীম্যান। আগে আগে তিনি। পেছনে তুর্গার বাহিনী। তাদের ফাঁকে ফাঁকে পুলিশ। সবশেষে অশ্বারোহী দল। তারা কেউ জানে না, এই শোভাযাত্রার আগে আগে ঘোড়ার পিঠে চলেছেন যিনি, সেদিন তাঁর জীবনে সবচেয়ে সুখের দিন। সতীদাহ, বাধক ডাকাত, নেপাল যুদ্ধ, ১৮৪৩ সনের বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহ, মহারাজপুরের লড়াই, সগরের তুর্ভিক্ষ, জব্বলপুরের রাজস্বনীতি, অযোধ্যায় সুশাসন,

ভারতে মরিসাসের আখের চাষ—ভারতের ইতিহাসে ইংরেজের অনেক গৌরবের সঙ্গে জড়িত উইলিয়াম হেনরী স্লীম্যানের নাম। কিন্তু স্লীম্যানের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন সেই অপরাহ্ণটি,—পাটন থেকে তিনি যখন ইতিহাসকে সশরীরী করে ঘোড়ার পিছু পিছু হাঁটিয়ে জব্বলপুরে ফিরছিলেন। দুর্গা জানত না, যখনই তাদের দিকে পেছন ফিরছেন তিনি, তখনই পুলকে তাঁর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিচ্ছে। পকেটের রুটির বাণ্ডিল পকেটেই পড়ে আছে, সাহেব শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলে গেছেন। আনন্দ আর উত্তেজনায় ঘোড়ার পিঠে তিনি থর থর করে কাঁপছেন।

৯

জব্বলপুরে এসে নিজের বাংলোর সামনে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামলেন স্লীম্যান। এখন যেন তিনি অন্য মানুষ, সকালের স্লীম্যানের সঙ্গে কোন মিল নেই তাঁর। সারাদিনের ক্লান্তির ছাপ তাঁর চোখে মুখে, ঢেউ-খেলান চুলে, ব্রিচেসের ভাঁজে ভাঁজে, বুটের রংয়ে। কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। হাতের চাবুক হাতেই রইল। বাংলোয় ঢুকে পোষাক বদল না করেই তিনি কল্যাণ সিংয়ের কাছে চললেন। মলোনি নয়, কৌতূহলী অ্যাডজুট্যান্ট বা জব্বল-পুরের কোন পুরানো রাজকর্মচারী নয়—সকলের আগে তাঁর ওকেই দরকার।

আধঘণ্টার মধ্যেই আবার নিজের বাংলোয় ফিরে এলেন স্লীম্যান। হাবিলদারকে কানে কানে কি যেন বললেন। তারপর নিজের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মলোনি তখনও জানেন না স্লীম্যান কি করছেন, ‘পাগলা ছোকরাটা’ কি করতে চায়!

হাবিলদার দুর্গা এবং তার অনুচরদের নিয়ে জেল ব্যারাকে ঢুকল। তারপর ফাটকটা বন্ধ করে হাঁক দিল, মোতি কৌন হ্যায়?

দল থেকে একটি তরুণ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। হাবিলদার হিন্দুস্তানীতে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এস, সাহেব বোলাতা হ্যায়।

ভয়ে মোতির মুখ শুকিয়ে গেল। সে দুর্গার দিকে তাকাল। দুর্গা বলল, ভয় কি? সাহেব অবিবেচক নন। তুই যা। বলবি,

নরসিংপুর আমরা জীবনেও কখনও দেখিনি হুজুর! তারপরও যদি তিনি অন্য রকম ভাবেন, তবে আমরাও তো রয়েছি।

মোতি জমাদারের পিছু পিছু ওদের ব্যারাক থেকে বের হয়ে গেল। পথে জমাদারও অভয় দিল ওকে।—ভয় কি? সবাই জানে, এ সাহেবের একটু ছিট আছে! জব্বলপুরে আজই এসেছেন। দেখবে, হয়ত কাল ভোরেই আবার সবাইকে ছেড়ে দেবেন।

মোতি বলল, এখন কি আমাকে তাঁর কাছেই নিয়ে চলেছ?

—না। জমাদার একটা সেলের সামনে থমকে দাঁড়াল। অবাক হয়ে মোতি দেখল তার ভেতরে পাথরে গড়া মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণ সিং—তার ভাই। তালাটা খুলতে খুলতে জমাদার বলল, সাহেবের হুকুম, তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।

আবার তালা পড়ল। সান্ত্রীকে সাহেবের হুকুম বুঝিয়ে দিয়ে জমাদার আবার বাংলোয় ফিরে চলল।

রাত তখন প্রায় বারোটা। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। বাংলোর উঠোনে জ্যোৎস্নার আলো-আঁধারি মায়াজাল। চারপাশে ক'টি বিরাট বিরাট গাছ। তারই পাতার ছায়া উঠোনে নাচছে,—অলক্ষ্যে থেকে একটি নিপুণ হাত যেন ফুটফুটে অঙ্গনে সাদায়-কালোয় একটি নিটোল জাল বুনে চলেছে। স্লীম্যান ধীরে ধীরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। নিজের ছায়াটাকে তাঁর মনে হল যেন সামনে ছড়ান বিস্তীর্ণ জালটার প্রান্তদেশ। এখান থেকে টানলেই গোটা জালটি তার হাতে উঠে আসবে, উঠোন আবার তকতকে ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

জেলের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

ধীরে ধীরে স্লীম্যানের দীর্ঘ ছায়াটি ঘিরে নিঃশব্দে আরও ক'টি ছায়া এসে মিলিত হল। স্লীম্যান বারান্দা থেকে নেমে বললেন, চল। ছায়ার সারি সামনের দিকে এগিয়ে চলল। আগে আগে তাদের

মোতি, তার দু'পাশে দু'জন সান্ত্রী। পরের সারিতে থানাদার আর কল্যাণ সিং। তাদের ঘিরে ক'জন সিপাই। তাদের হাতে হাতে মশাল, ঘাড়ে কোদাল। পেছনে স্বপ্নাবিষ্ট স্লীম্যান।

চলতে চলতে ওরা লাখনাদৌনের পথের মুখে এসে হাজির হলেন। পেছন ফিরে মোতি বলল, হুজুর, আরও একটু কষ্ট করতে হবে। স্লীম্যান কোন জবাব দিলেন না। তিনি নিঃশব্দে ওদের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলেন।

ওরা এসে পথের ধারে একটা আমবাগানের দিকে মোড় ঘুরল। স্লীম্যান বাগানটার দিকে তাকালেন। বিরাট বিরাট গাছ। গায়ে সাদা-কালো দাগ। মাথায় ঘন পাতার বাহার। এমন সুন্দর, শান্ত সমাহিত বাগান কোন খুনের সাক্ষী হতে পারে, একথা ভাবাও যায় না। মোতি একটা গাছের গোড়া থেকে হাতে খানিকটা মাটি তুলে নিল। তারপর মশালের আলোয় তা নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে বলল, হুজুর, এখানটায় খুঁড়তে আজ্ঞা করুন।

সিপাইরা কোদাল চালাল। দেখতে দেখতে মাটির নীচ থেকে ছেঁড়া কাপড়-চোপড় উঁকি দিল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল একটি সত্যমৃত মানুষের দেহ। তারপর আরও একটি। তারপর আরও। মোতি বলল, হুজুর, আরও আছে।

স্লীম্যান বললেন, না, আজ আর চাই না। কোথায় আছে, সিপাইদের তুমি সে জায়গাগুলো শুধু চিনিয়ে দাও। ওরা পরে খুঁড়ে দেখতে পারবে।

মোতি বলল, যে আজ্ঞে।

থানাদারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন স্লীম্যান।—কি, কাউকে চিনতে পারছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দু'জনকে। ঐ যে দু'টি দেহ দেখছেন স্যার, ওরা দু'জনই জব্বলপুরের লোক।

—ব্যস, যথেষ্ট। স্লীম্যান তাঁর ঘোড়ার দিকে এগিয়ে চললেন। —তবে এবার ঘরে চল।

আগে আগে মোতি আর কল্যাণ সিং। পেছনে সিপাইদের ঘাড়ে পর পর তিনটে ন্যাকড়ায় তৈরী ডুলি। তাতে চারটি মৃতদেহ—পাঁচশ' বছরের ইতিহাসের চার টুকরো মৌন স্বাক্ষর। মৌন, কিন্তু স্লীম্যান জানেন, ওদের অবহেলা করে এমন সাধ্য আজ আর কারও নেই। তিনি আবার আমবাগানটার দিকে তাকালেন। চাঁদের আলোয় বাগানটা যেন তখনও ঘুমোচ্ছে। জিমখানা, ক্লাব, মলোনি—গোটা জব্বলপুরও নিশ্চয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু কাল সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর কি হিন্দুস্তান আবার এমন নিশ্চিন্ত ভাবে কোনদিন নাক ডাকাতে পারবে? কাল সকালের পর কি কেউ তাঁকে 'ঠগী স্লীম্যান' বলে ব্যঙ্গ করবে? তা করুক। স্লীম্যানের সে জন্যে আর কোন খেদ নেই। কেননা, তিনি জানেন, কাল থেকে সেটাই হবে তাঁর সত্যিকারের নাম। সেই আমবাগানের ছায়ায় দাঁড়িয়েই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন স্লীম্যান, কাল থেকে এই ঠগীই হবে তাঁর একমাত্র ধ্যান। গাছের একটি শাখা তিনি যখন হাতে পেয়েছেন, তখন কাণ্ড, মূল—সব তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে, তার আগে তাঁর বিশ্রাম নেই!

একটি দল ধরা পড়ল।

তারপর আরও। লাখনাদৌনের আমবাগানের সাক্ষীকে এবার আর উড়িয়ে দেওয়া গেল না। কেননা, সে কবরের ধন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যিনি উদ্ধার করেছেন তিনি স্বয়ং স্লীম্যান। স্লীম্যানের তীক্ষ্ণ জেরায় দুর্গা ভেঙ্গে পড়ল। তার মুখ থেকে আরও কতকগুলো নাম পাওয়া গেল। কবর থেকে উঠল আরও কিছু মৃতদেহ এবং কঙ্কাল। সাকুল্যে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এখন আটাশটিতে। তাদের মধ্যে যেমন ব্যবসায়ী, সিপাই, তীর্থযাত্রী, সব রকমের মানুষ আছে, তেমনি দুর্গার

তালিকা দেখে যাদের ধরে এনে কাঠগড়ায় দাঁড় করান হয়েছে তাদের মধ্যেও নানা পরিচয়ের মানুষ আছে। একজন তাদের সরকারী হরকরা। আর একজন পুলিশ ইনস্পেক্টার। স্লীম্যানের সাধনায় দলের আটাশ জনের ফাঁসী হল, বাকী সত্তর জন প্রেরিত হল কারাগারে। একমাত্র ছাড়া পেল মোতি আর কল্যাণ সিং। সাহেব বলেছেন, ওদের আরও কাজ আছে, এ হু'জনকে তাঁর দরকার!

অবশ্য মোতিকেও শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। সে আবার দলে ফিরে গিয়েছিল। ধরা পড়ে আবার যখন সে স্লীম্যানের সামনে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল, তখন স্লীম্যান নিরুপায়। এমন ঘৃণ্য খুনীকে বাঁচিয়ে রাখার তাঁর আর কোন অধিকার নেই। তিনি মোতিকেও ফাঁসীকাঠে পাঠালেন।

মোতি চলে গেল। কিন্তু তার আগে 'ঠগী স্লীম্যান'কে হু'টি অমূল্য জিনিষ দিয়ে গেল সে। তার একটি 'রামসী', অর্থাৎ ওদের 'বুলি'। স্লীম্যান যে এখন যে কোন ঠগীর মত এমন গড়গড় করে রামসী বলতে পারেন সে শুধু মোতির কারণে। সাহেবকে সে-ই ভাষাটা শিখিয়েছিল। দ্বিতীয়—ঠগীদের ভেতরের কাহিনী। ওরা কিভাবে ঠগী হয়, কারা দলে আসে, কেন আসে, কিভাবে খুন করে—সাহেব মোতির কাছ থেকেই সে রহস্যময় পেশার খুঁটিনাটি সব জেনেছিলেন। বলতে গেলে তিনি যে আজ গোটা হিন্দুস্তানে ঠগীদের বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জানেন তার অনেকখানি কারণ এই মোতি।

মোতির কথার সূত্র ধরেই স্লীম্যান আবিষ্কার করেছিলেন যে, তাঁর ধারণা ভুল নয়—সকলে মিলে ওরা সত্যিই একটি অখণ্ড দল। উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম—ভারতের যেখানেই ঠগী থাক না কেন, বিশাল হিন্দুস্তানের মতই তারা এক অখণ্ড অস্তিত্ব। দ্বিতীয়ত, স্লীম্যান সেই সূচনা দিনেই বুঝেছিলেন, ওরা আর ভারত এক হয়েও একই ঘটনা নয়। হিন্দুস্তানের এই ছন্নছাড়া সন্তানদের এই বেপরোয়া জীবনের

পেছনে রয়েছে কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণ। স্লীম্যান লিখেছেন—ভারতবর্ষ খুনীর দেশ এমন মনে করার কোন কারণ নেই। সমগ্র ভারতে ইংরেজের নিজস্ব দুর্গ আছে মাত্র তিনটি—কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ। অথচ আমরা মুষ্টিমেয় ইউরোপীয়ানরা কেমন স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের চারদিক ঘিরে এদেশের মানুষ। তাদের নিয়ে আমরা শাসন চালাচ্ছি, হাটে-বাজারে, নগরে, বন্দরে তাদের সঙ্গে অষ্ট প্রহর মেলামেশা করছি। কিন্তু কই, সেখানে তো ভারত ন্যায়নীতি-বর্জিত খুনীর দেশ নয়!

তিনি আরও লিখেছেন—১৮৩৫ সনে মিসেস কর্নেল ফেথফুল নামে এক ইংরেজ মহিলা কলকাতা থেকে সুদূর লুধিয়ানায় এসেছিলেন পাল্কীতে চড়ে। সঙ্গে তাঁর একটি কুমারী মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না, একটি ভৃত্যও না। তবুও তিনি নিরাপদে তাঁর স্বামীর কাছে পৌঁছেছিলেন। অথচ এ পথের দূরত্ব ছিল বারোশ' মাইলের বেশী এবং তিনি পথে ছিলেন পুরো চৌদ্দ দিন, চৌদ্দ রাত্রি! শুধু ইউরোপীয়ান নয়, গুটি কয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে স্থানীয় বাসিন্দারাও বছরের পর বছর এমনি নিজ নিজ পথে চলেছে। স্লীম্যানের মতে সেটাই সত্যিকারের ভারতবর্ষ। স্যার টমাস মনরোর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, আমি জানি না ভারতীয়দের সভ্য করব বলে প্রায়শঃ আমরা যা বলে থাকি সে কথাটার সত্যিকারের অর্থ কি! অবশ্য, উন্নততর শাসন ব্যবস্থার কথা উঠলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি বল, উন্নততর কৃষি-ব্যবস্থা, শিল্প সংগঠন বা কারিগরী দক্ষতা কিংবা লেখাপড়ার উন্নততর ব্যবস্থা, তবে আমি আপত্তি করব। এ ক্ষেত্রগুলোতে ভারত কোন দিক থেকেই ইউরোপের চেয়ে হীন নয়। বিশেষ করে এখানকার জনসাধারণের উদার আতিথেয়তা এবং সর্বোপরি নারী সমাজের প্রতি তাদের সম্মান-সৌজন্য ও শ্রদ্ধা—সভ্যতার এই দুই লক্ষণে এখানকার জনসাধারণ সত্যিই অতুলনীয়।

তবুও যে এদেশে ঠগীর মত ঘৃণ্য খুনীদলের আবির্ভাব হয়েছিল তার কারণ এদেশের অস্থির ইতিহাস। মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি যখন বিপন্ন, বহিরাক্রমণে সমাজ যখন ছিন্নভিন্ন, ইতিহাসের সেই তমসার যুগেই আবির্ভূত হয়েছিল একদল অসহায় মানুষ। খুনী না হয়ে সেদিন তাদের উপায় ছিল না। ভারতের দুর্ভাগ্য, ঘরছাড়া সেই হতভাগ্য সন্তানদের সে আর ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারেনি। স্লীম্যান লক্ষ্য করেছেন—সংখ্যায় ওরা অসংখ্য হলেও এখনও প্রধান উৎস ওদের আদি সেই ক'টি পরিবার। বিগতে পাঁচ শ' বছরের ইতিহাসের কোন সুদিনে যদি কেউ ওদের ডেকে ঘরে তুলতে পারত তাহলে আজ ওরা কিছুতেই এমন ভয়াবহ হতে পারত না। কিন্তু সেদিকে কারও নজর ছিল না। ফলে, সমাজের অবহেলাকে ওরা ক্রমে পুষিয়ে নিতে চেয়েছিল ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে। ঠগীর সঙ্গে ধর্মের যে সম্পর্ক তার কারণ বহুলাংশে সেখানেই। দ্বিতীয়ত, ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে স্লীম্যান দেখেছেন—মন্দিরে ঠাঁই পেলেও সমাজের সত্যিকারের আশ্রয় যেখানে, সেখানে ওরা তখনও পরিত্যক্ত। ওদের অধিকাংশেরই যথেষ্ট জমিজমা নেই, অধিকাংশের ঘরেই দু'বেলা দু'মুঠো পেটভরে খাওয়ার সংস্থান নেই। সুতরাং, স্লীম্যান মনে মনে ভাবলেন, এ বৃক্ষ যদি সমূলে উৎপাটিত করতেই হয় তবে তাঁকে শুধু কাঠুরিয়া হলে চলবে না, মৃত্তিকার আরও গভীরে নামতে হবে। মোতি প্রকারান্তরে সে দায়িত্বের কথাই তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

স্লীম্যান মনে মনে তৈরী হয়েই ছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাজে লেগে গেলেন। নরসিংপুর বিরাট জেলা। জেলা শাসকের অনেক কাজ। তারই মধ্যে সুরু হল ঠগীর অনুসন্ধান। কাজটা সহজ ছিল না। কেননা, নরসিংপুরই ঠগীর একমাত্র ঠিকানা

নয়। নামামাত্র বোঝা গেল—উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্ব—কমবেশী গোটা ভারতই তাদের অধিকারে। ধরা-পড়া ঠগীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বোঝা গেছে, শুধু খুনে দক্ষতা নয়, সংগঠন ক্ষমতায়ও তারা অনন্য। প্রত্যেক দলের এলাকা ভাগ করা আছে, সাধারণত তারা সেখানেই চলাফেরা করে, অন্য এলাকা থেকে ইশারা পেলে তবেই তারা সেখানে পা দেবে। তারপর কাজ শেষ হয়ে যাওয়া মাত্র নিজ রাজ্যে ফিরে আসবে। স্লীম্যানের প্রথম কাজ এই এলাকাগুলোকে নির্দিষ্ট করা। এ কাজ একা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্লীম্যানের সেটাই একমাত্র কাজ নয়। তবুও মুহূর্তের জন্যেও তিনি দায়িত্বটা এড়িয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছেন না। কেননা, কোম্পানি উদাসীন হলেও নিজে তিনি মনে মনে দায়বদ্ধ। যত বেশী সংখ্যক দল ধরা পড়ছে, তাঁর নৈতিক দায়িত্ব ততই যেন বেড়ে চলেছে।

সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে কাজের এলাকাও বেড়ে চলল। নরসিংপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কখনও ঠগ খুঁজতে খুঁজতে চলে যাচ্ছেন গোয়ালিয়রে, কখনও রাজপুতানায়। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তখনও উদাসীন। স্লীম্যান কি করতে চান, তাঁরা ঠিক তা বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁর একমাত্র সহায় তখন নিজের ওপরওয়ালা—সগরে গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট কার্ভিন স্মিথ। স্লীম্যান সৈন্যবাহিনী ছেড়ে তাঁর সহকারী হিসেবে যোগ দেওয়ার পর থেকেই স্মিথ তরুণ 'ঠগী'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁরই চেষ্টায় স্লীম্যান জনাকয় সমর্থ সহকারী পাশে পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য রেনোল্ডস, প্যাটন, উইলসন, ম্যাকলিওড, ব্রিগস, এটওয়াল—এই কয়টি নাম। ঠগী-দমনের সূচনা পর্বে ওঁরাই ছিলেন 'ঠগী স্লীম্যানে'র হাতে প্রধান হাতিয়ার। উল্লেখযোগ্য এই, এই ধর্ম-যোদ্ধাদের দলে সেদিন ঠগীদের আপন দেশের মানুষও ছিলেন একজন। নাম তাঁর রুস্তম খাঁ। দুঃসাহসিকতায় তিনিও সেদিন স্লীম্যানের যথার্থ অনুচর।

পরবর্তীকালে অবশ্য 'ঠগী স্লীম্যানে'র এই দলে অন্যরাও যোগ দিয়েছিলেন। স্লীম্যানের নিজের তালিকা অনুযায়ী তাঁর সেদিনের বন্ধু এবং সহকারীদের নাম—'মিঃ এফ. সি. স্মিথ, মিঃ মার্টিন, মিঃ জর্জ স্টকওয়েল, মিঃ চার্লস ফ্রেজার, মিঃ ওয়েলেসলি, মিঃ শোর, মিঃ ক্যাভেনডিস, মিঃ জর্জ ক্লার্ক, মিঃ এল উইলকিনসন এবং মিঃ বক্স।' ওঁদের সঙ্গে ঠগী ধরার কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা অধিকাংশই সিভিল সার্ভিসের লোক। কেউ কেউ আবার ছিলেন 'ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে', অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যসমূহে গভর্ণর জেনারেল তথা কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। ঠগী বিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব ছিল ধরে-আনা ঠগদের বিচার করা। তবুও যে স্লীম্যান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ওঁদের নামোল্লেখ করেছেন তার কারণ আদালতের তরফ থেকে সহযোগিতা ছাড়া সেদিন তাঁর পক্ষে একাকী এই বিরাট সংকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না। কারণ, ইংরেজী আইনের চমৎকারিত্ব প্রদর্শনের বাসনায় অধিকাংশ বিচারকই তখন সুবিচারের চেয়ে আইনের মারপ্যাঁচ নিয়ে বেশী ব্যস্ত। ওঁরাও যদি তাই করতেন তাহলে হয়ত অনেক ঠগীকেই শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হত। বলা বাহুল্য, স্লীম্যানের পক্ষে সে ঘটনা হৃদয়বিদারক হত। কেননা, ঠগী খুঁজে বের করা তখন যে কোন একটা যুদ্ধ বিজয়ের চেয়েও কঠিন কাজ।

যাঁদের সংকল্পে এবং নিষ্ঠায় সে কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন স্লীম্যান সগর্বে তাঁদের নামও উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর সেই প্রিয় অনুচর এবং বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন—কর্নেল লো, কর্নেল স্টুয়ার্ট, কর্নেল অ্যালভেস, কর্নেল স্পাইয়ার্স, কর্নেল কলফিল্ড, কর্নেল সাদারল্যাণ্ড, কর্নেল ওয়াড, মেজর উইলকিনসন, মেজর বর্থউইক এবং ক্যাপ্টেন প্যাটন। ওঁরা সকলেই ছিলেন সৈন্যবাহিনীর তরুণ অফিসার। স্লীম্যানের আহ্বানে পরবর্তীকালে তাঁরাই 'ঠগী'র বিখ্যাত 'তরুণ দল'।

অন্যরা তাঁদের নাম দিয়েছিলেন—'হিজ ইয়ং মেন'। ওঁরা নায়ক স্লীম্যানের আপন হাতে গড়া, তাঁরই আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করা।

এ কাজ একদিনে সম্ভব হয়নি। যাত্রার আগে ঠগী জমাদার যেমন ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তার প্রস্তুতি চালায়, ঠগী-স্লীম্যানের এই বাহিনীও তেমনি তিল তিল করে গড়া।

ছুর্গার দল ধরা পড়ল। তিন বছরের মধ্যে একই এলাকায় ধরা পড়ল আর একটি দল। কিন্তু কোম্পানি তখনও দর্শক। ১৮২৪ সনের এপ্রিলে স্লীম্যানকে তাঁরা ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত করেছেন। কিন্তু সে ঠগী আবিষ্কারের পুরস্কার নয়। জেলা শাসক হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি মাত্র। ঠগী তখনও কোম্পানির চোখে চোর-ডাকাত ইত্যাদি মামুলী অপরাধীদের তালিকায় আর একটি নতুন নাম মাত্র।

কিন্তু স্লীম্যানের কাছে তারা তা নয়।

সুতরাং, জেলা শাসনের ফাঁকে ফাঁকেই সুরু হল 'ঠগী স্লীম্যানে'র আপন কাজ। যখনই সময় পান তখনই তিনি জবানবন্দীগুলো নিয়ে বসেন। রাজসাক্ষীদের পাশে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের কথা শোনেন। রাত জেগে জেগে তাদের ইতিহাস, জীবন এবং আদর্শের কাহিনী লেখেন। ঠগীদের মূল তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে।

রাজসাক্ষীদের ঘাঁটতে ঘাঁটতে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে নতুন দল উঁকি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চড়ে স্লীম্যান সেদিকে ছোটেন। ঠগীর মতই নির্ভুল তাক। স্লীম্যান কখনও নিরাশ হয়ে ঘরে ফেরেন না। বরং, নতুন দলের সঙ্গে প্রতিবারই নতুন নতুন তথ্য যুক্ত হয় তাঁর গবেষণার খাতায়। ফলাফল দেখে স্লীম্যান নিজেই স্তম্ভিত।—কোথায় নরসিংপুর? তাঁর মানচিত্র ক্রমেই আকারে বিশাল হয়ে উঠছে, পথের দৈর্ঘ্য শতকের ঘর পেরিয়ে হাজার হাজার মাইলে ঠেকছে। তাও অনুসন্ধান এখনও অসম্পূর্ণ।

বাধ্য হয়েই ওপরওয়ালা স্মিথের কাছে হাত পাততে হল। স্মিথ এই তরুণটিকে জানেন। তাঁর চোখের তারায় কি স্বপ্ন নেচে বেড়াচ্ছে তাও তাঁর অজানা নয়। তিনি বললেন—তুমি এগিয়ে যাও। আমি যতদিন আছি ততদিন তোমার কোন ভাবনা নেই। আমি তোমায় গোটা সগর এবং নর্মদা এলাকার ঠগী দমনের দায়িত্ব দিলাম, এই নাও তোমার সহকারী !

বর্থউইক পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর রুস্তম খাঁ, প্যাটন। আনন্দিত স্লীম্যান প্রবল উৎসাহে আবার কাজে মাতলেন।

হঠাৎ 'ঠগী'কে থামতে হল। ক'বছর আগে নাথপুরে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে শয্যা নিয়েছিলেন তিনি। বেঁচে উঠবেন বন্ধুরা তা ভাবতে পারেননি। এবার আবার সেই ম্যালেরিয়া চাড়া দিয়ে উঠেছে। তার ওপর এই খাটুনি। শঙ্কিত বন্ধুরা তাঁকে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে বললেন। কিন্তু স্লীম্যান এই মুহূর্তে কিছুতেই ভারত ত্যাগে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত অভিভাবকতুল্য বৃদ্ধ স্মিথকে হস্তক্ষেপ করতে হল। তাঁর নির্দেশে স্লীম্যান আঠার মাস ছুটির জন্যে দরখাস্ত পেশ করলেন।

ছুটি মঞ্জুর হল। ১৮২৫ সনের এপ্রিলে কলকাতার পথে স্লীম্যান অস্ট্রেলিয়া যাত্রা করলেন। সেখান থেকে তাহিতি দ্বীপে। কর্মজীবনে ভারতের বাইরে এই তাঁর একমাত্র ছুটি উদ্‌যাপন। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দেশে যেতে পারেননি, কারণ দক্ষিণ সাগরই ছিল চিকিৎসকদের নির্দেশ !

পরের বছর সেপ্টেম্বরে আবার কলকাতায় নামলেন 'ঠগী'। সঙ্গে তাঁর ঠগী দমনের নতুন কোন হাতিয়ার নয়, রাশি রাশি আখের বীজ। সুদূর তাহিতি থেকে দক্ষিণ ভারতের রায়তদের জন্যে তিনি তা বহন করে এনেছেন। দেখতে দেখতে সগরের মাঠে মাঠে ভারতের হাওয়ায় সে আখ মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। চলতে চলতে

সে মাঠ সামনে পড়লেই আনন্দিত 'ঠগী' ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন। দীর্ঘ আখ মাথা আন্দোলিত করে,—স্মিতহাস 'ঠগী' আবার নিজের পথ ধরেন। কোনটা তাঁর পথ—ভারতের কৃষক অথবা ঠগীর দল, এ নিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মনে সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই একই সিদ্ধান্ত নেন স্লীম্যান,—সামনে তাঁর পথ একটিই। আপাতত যাকে দুই বলে মনে হচ্ছে আসলে তা একই পথ; পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ মিলিয়েই তাঁর এই ভালবাসার দেশ ভারত। তার আলোতে যদি তাঁর কোন অধিকার থেকে থাকে, তবে অন্ধকারও তাঁর দায়।

পরের বছর তাহিতির আখ বাতিল হয়ে গেল। মরিসাস থেকে নতুন বীজ আসছে। তার আগে সে খবর জানাতেই যেন সুদূর মরিসাস থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে 'ঠগী'র সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন আরও মিষ্টি, আরও তন্বী—এমেলি। এমেলি জোসেফিন। (Amelie Josephine)।

খানদানী ফরাসী তরুণী। বাবা কাউন্ট ব্লুদেন ফঁতেন (Count Bluden de Fontenne de Chaplin) তদানীন্তন ফ্রান্সে বিখ্যাত অভিজাত পুরুষ ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সম্ভাবনা নজরে পড়া মাত্র তিনি বিষয়-আশয় সব বিক্রি করে দিয়ে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ফরাসীদের দ্বীপ—মরিসাসে। সেখানেই তাঁর এই কন্যার জন্ম। কাউন্টের একটি পুত্রসন্তানও ছিল। তাঁর বাসনা ছেলেটিকে তিনি অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠিত করেন। জব্বলপুরে তাঁর এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। তিনি জানালেন—সে দেশ ভারতবর্ষ। এখানে অনেক জমি, অফুরন্ত সুযোগ। মেয়ে এমেলি এসেছিলেন তাঁরই খবরাখবর করতে।

উনিশ বছরের সুন্দরী ফরাসী তরুণী। বেশভূষা চালচলনে স্থানীয় ইংরেজললনাদের সঙ্গে কোন মিল নেই তাঁর। এমেলির পায়ের ছন্দে, কথা বলার ভঙ্গীতে, চোখের নড়াচড়ায়—সর্বত্র

আভিজাত্যের স্বাক্ষর। চল্লিশ বছরের অভিজাত পলিটিক্যাল অফিসার স্লীম্যান মেয়েটির নজর এড়াতে পারলেন না। সেটা কার্যত সম্ভবও ছিল না। কেননা, তাহিতি থেকে ফেরার পরে নতুন করে পদোন্নতি হয়েছে তাঁর। স্লীম্যান তখন নর্মদা উপত্যকায় একটা পুরো ডিভিশনের কর্তা—কমিশনার। পদটা অবশ্য অস্থায়ী, তবে যতদিন যোগ্য আকারের কোন জেলা ফাঁকা না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন ক্যাপ্টেন স্লীম্যান এই পদেই বহাল থাকছেন। তাছাড়া ঠগীর কারণে স্লীম্যান তখন ভারতে অন্যতম বিখ্যাত রাজপুরুষ। কোম্পানি অবশ্য তখনও বিষয়টিকে সরকারীভাবে তেমন গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেননি। কিন্তু সমগ্র ভারতে স্লীম্যান এবং তাঁর অনুচরেরা তখন এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ। প্রতিদিন তাঁরা নতুন নতুন দলের সন্ধান বের করছেন। জব্বলপুরের কয়েদখানায় প্রতিদিন ঠগীদের ভীড় বেড়েই চলেছে। সুতরাং, এহেন স্লীম্যানকে অবহেলা করে পাশ কাটিয়ে চলে যান এমেলির সেই সাধ্য কোথায়?

আলাপ হয়েছিল আখকে কেন্দ্র করেই। এমেলি বললেন—মরিসাসের মেয়ে আমি, তাহিতির আখ দেখে মোটেই বিস্মিত হইনি; বিস্মিত হচ্ছি আপনার ফরাসী শুনে।

এমেলি কথা সুরু করেছিলেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে। স্লীম্যান জবাব দিচ্ছিলেন—অনর্গল ফরাসীতে। অনেকদিন চর্চা নেই। কিন্তু কর্ণওয়ালের সেই বিদ্যা এখনও তিনি হারাননি। গ্রীক, লাতিন, ফরাসী—তৎকালের সংস্কৃতিবান যে কোন ইংরেজের মত এই তিনটে ভাষা রপ্ত ছিল তাঁর। বরং তার চেয়ে কিছু বেশীদূরই এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এই তিন সাহিত্যকেও দখলে এনেছিলেন। কারণ, গণিত আর সাহিত্য এই দু'টি বিদ্যা স্লীম্যানের ছোটবেলার নেশা। ভারতে অফুরন্ত কাজের মধ্যেও দৌলতরাও সিন্ধিয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে (১৮২৭) তাঁর বিধবা

বিজাবাঈয়ের কীর্তিকাহিনীর যে বিবরণ তিনি লিখে রেখে গেছেন—নিঃসন্দেহে তাঁর সেই ছোট্ট বইটি ('স্টোরি অব বিজাবাঈ,' ১৮২৭) এক অনুপম সাহিত্য। তাছাড়া তাঁর 'রেম্বলস এণ্ড রিকালেকসানস অব এন ইণ্ডিয়ান অফিসিয়াল', 'এ জার্নি থ্রু দি কিংডম্ অব আউধ (১৮৪৯-৫০)', 'দি স্পিরিট অব মিলিটারী ডিসিপ্লিন ইন দি ইণ্ডিয়ান আর্মি', 'এনালাইসিস এণ্ড রিভিউ অব দি পিকিউলিয়ার ডক্টরিনস অব দি রিকার্ডো' অথবা, 'নিউ স্কুল অব পলিটিক্যাল ইকনমি' কিংবা ঠগীদের সম্পর্কে লেখা তাঁর অগুণতি রচনার যে কোন একটি টুকরো হাতে তুলে নিলে দেখা যাবে, শুধু একটি বিশ্লেষণধর্মী তীক্ষ্ণ মন নয়, সমর্থ একটি কলমও ছিল তাঁর হাতে। দু'দিন কথা বলেই এমেলি তাঁর যাদুতে পড়ে গেলেন। বয়সের ব্যবধান ঘুচে গেল। ১৮২৮ সনের ১৪ই জুন চল্লিশ বছরের পলিটিক্যাল অফিসারের হাত ধরে জব্বলপুর চার্চ থেকে বেরিয়ে এলেন উনিশ বছরের তরুণী। হাসতে হাসতে তিনি তাঁর বাংলোয় গিয়ে উঠলেন।

তারপর আর একদিনের জন্যেও 'ঠগী'র সঙ্গ ছাড়তে পারেননি। যেখানে স্লীম্যান সেখানেই এমেলি। কখনও অচেনা দেশের পথের ধারে তাঁবুতে, কখনও শত শত মাইল অতিক্রম করে সুদূর নৈনিতালের পাহাড়ে, কখনও অযোধ্যার গাঁয়ে গাঁয়ে, মাঠে মাঠে, কখনও বা ঠগী দলের মধ্যে। তারপরও স্লীম্যান দীর্ঘ আটাশ বছর ছিলেন এদেশে। এমেলি তাঁর সেই জীবনে প্রতিদিনের সঙ্গী। স্বামীকে তিনি ক্যাপ্টেন থেকে মেজর-জেনারেল হতে দেখেছেন, মেজর-জেনারেল স্লীম্যানকে 'স্যার' হতে শুনেছেন। জেলাশাসক থেকে ঠগী দমনের একচ্ছত্র অধিনায়ক, কমিশনার থেকে অযোধ্যার রেসিডেন্সের দায়িত্বশীল পদ স্লীম্যানের কর্মজীবনের আনন্দিত সাক্ষী, —সহচর ; এদেশের মাটিতেই তাঁর দু'টি পুত্র, পাঁচটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছে। একটি পুত্র প্রাণত্যাগ করেছে—এদেশেই নির্বাসিত

কাউণ্ট-তুহিতার জীবনকে নামহীন, পরিচয়হীন ভবিষ্যতের বদলে মিসেস স্লীম্যানের গৌরবে ভূষিত করেছে। ১৮৫৬ সনের ২৪শে জানুয়ারী দীর্ঘ প্রবাস শেষে অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে যেদিন তিনি কলকাতা থেকে 'মনার্কে'র ডেকে পা দিয়েছেন সেদিন তিনি আর জব্বলপুরের সেই চপলা তরুণী নন। ব্যারাকপুর-পার্ক থেকে বিদায়ী অফিসার, কোম্পানির গৌরব স্লীম্যানকে অভিনন্দন জানিয়ে গভর্ণর-জেনারেল ডালহৌসি স্বয়ং জরুরী চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, মহারানীর আদেশ অনুযায়ী ভারত থেকে রাজকীয় সম্মানের জন্যে যে একটিমাত্র নাম তিনি স্বদেশে পাঠিয়েছেন সেটি মেজর জেনারেল উইলিয়াম হেনরী স্লীম্যানের। মিসেস স্লীম্যান অপেক্ষায় আছেন—যে কোন মুহূর্তে স্বামী তাঁর 'স্যার' হবেন।

হয়েছিলেন। কিন্তু এমেলির তুর্ভাগ্য, স্বামী তাঁর সে খবরটি দেখে যেতে পারেননি। মাত্র কয়দিন পরে ফেব্রুয়ারীর ১০ তারিখে 'মনার্ক'এর লগ বইতে চোখের জলে কলম ভিজিয়ে ক্যাপ্টেন লিখেছিলেন—আবহাওয়া ঃ 'লাইট এণ্ড ফাইন'। সময় ঃ রাত্রি ৩টা ৪৫ মিঃ। মেঃ জেঃ উইলিয়াম হেনরী স্লীম্যান মরদেহ ত্যাগ করলেন। অক্ষাংশ—২.২২ (সাউথ), দ্রাঘিমা—৮২.৫১ (ইষ্ট)।...সিংহলের অদূরে ভারত মহাসাগরের সীমানা ছাড়াবার আগেই প্রাণত্যাগ করলেন স্লীম্যান। তরঙ্গায়িত সমুদ্রেই সমাহিত করা হল তাঁকে। তু'দিন পরে সাগর থেকেই ইংল্যাণ্ড পৌছাল এমেলির বিলাপ ঃ '...ইট ইজ উইথ সাচ এ ব্রোকেন হার্ট ছাট আই টেক আপ মাই পেন টু রাইট টু ইউ, এণ্ড টু টেল ইউ ছাট ইট হ্যাজ প্লীজড গড টু ড্রিপাইভ মি অব মাই এভার লেমেনটেড এণ্ড ডিয়ারেস্ট হাসবেণ্ড।...' সে চিঠির ঠিকানা—'টুয়েনটি মাইলস টু দি স্টার্ট'।

ক'দিন পরে জাহাজে থাকতে থাকতেই মিসেস স্লীম্যানের হাতে পৌছাল সরকারী বিজ্ঞপ্তি (২০শে মার্চ, ১৮৫৬) ঃ মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বরী

বেঙ্গল আর্মির গৌরব মেজর জেনারেল উইলিয়াম হেনরী স্লীম্যানকে 'স্যার' খেতাবে ভূষিত করেছেন। পাশেই পরে রয়েছে ৩রা জুন তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মেল'-এর একখানা কপি, তাতে বিগত জেনারেলের দীর্ঘ প্রশংসার ফাঁকে বাঁকা হরফে ছাপা একটি শব্দ—'ঠগী'! এমেলি ভেবে পাচ্ছেন না কোন্ সম্মানটা বড়—'স্যার' অথবা এই 'ঠগী'! তিনি যে সেদিনের স্লীম্যানকেও দেখেছেন!

১০

ঠগী আর ঠগী।

নরসিংপুরের জেলাশাসক স্লীম্যানের সেদিন ঠগী ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ভাবনা নেই। রাজসাক্ষীরা আসছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জবানবন্দী শোনাচ্ছে; টেবিলে মেলে ধরা মানচিত্রে দাগ কাটছে। স্লীম্যান যেন কোন সার্ভেয়ার—আমিন। তাঁকে কোন অজ্ঞাত দেশের মানচিত্র আঁকতে হবে। এমন মানচিত্র যা কারও ধারণায় নেই, অথচ প্রতিটি বিন্দু যার নির্ভুল।

সে এক দেখবার মত বস্তু। দেরাজে রাশি রাশি মানচিত্র মজুত করে রেখেছেন তিনি। পথ ঘাট, নদী নালা, গাঁ শহর—সাজান সুন্দর মানচিত্র। কোন দল ধরা পড়লেই স্লীম্যান নির্ভুল চোখে সেখান থেকে গুটিকয় মানুষকে আলাদা করে রাখেন। দলের মধ্যে প্রকৃতিতে যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কিংবা যাদের প্রাণের মায়া অন্যদের চেয়ে প্রবল—সাধারণত তারাই সাহেবের পছন্দ। স্লীম্যান সময় বুঝে তাদের নিজের ঘরে তলব করেন। তারপর অনর্গল 'রামসি'তে সুরু হয় তাদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন। ওরা দু'চার মিনিট কথা বলার পরেই জেনে যায়, এ সাহেবকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা।

কথা বলতে বলতেই একসময় দেরাজ থেকে মানচিত্রগুলো বের করে টেবিলে রাখেন স্লীম্যান। তারপর বন্দীর হাতে লাল পেন্সিলটা

তুলে দিয়ে বলেন, এই হচ্ছে গোয়ালিয়রের পথ—এই নালা, এই শহর, এই বন; অমুক অমুক মানুষগুলোকে কোথায় রেখেছিলে সে জায়গাটা দাগিয়ে দাও।

একটা কবর চিহ্নিত করতে গিয়ে আরও পাঁচটা কবরের কথা মুখে এসে পড়ে। স্লীম্যানের ইঙ্গিতে আবার কেরানীর হাতের কলম চলতে সুরু করে। সাহেবের হুকুম আছে, দরকারী অথবা অদরকারী সে বুঝবেন তিনি, একটি কথাও যেন বাদ না পড়ে।

কথা শেষ হওয়া মাত্র মানচিত্রটা আবার ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন স্লীম্যান। তারপর বলবেন, নতুন যে কবরগুলোর কথা বললে সেগুলো কোথায় আছে দেখিয়ে দাও। এই হচ্ছে ইন্দোরের পথ—শহর এখান থেকে আট ক্রোশ—আমবাগানটা ডাইনে না বাঁয়ে ?—বাঁয়ে ? বেশ, তাহলে এখানটায় একটা দাগ দাও।

হুকুম তামিল করে মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঠগী। তখনকার মত তার কাজ শেষ। এবার আর একজনের পালা। তার সামনে রাখা হবে আর একটি নতুন মানচিত্র। তারপর একই কথোপকথন, একই নির্দেশ—'বিল'গুলো কোথায় আছে দেখিয়ে দাও।

সকলের সব বক্তব্য শেষ হয়ে গেলে সুরু হবে স্লীম্যানের কাজ। সামনে তাঁর রাশি রাশি জবানবন্দী, অসংখ্য মানচিত্র। প্রথম কাজ এগুলো থেকে খুঁজে খুঁজে নামগুলো বের করতে হবে। তারপর পুরানো খাতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে রোসন জমাদার আর রুস্তম খাঁ যে নামগুলো বলে গেল তারা একই মানুষ কিনা। বাপের নাম, গাঁয়ের নাম, দলপতিদের নামগুলো খুঁটিয়ে দেখতে হবে। সব দেখার পরে বিস্তীর্ণ বংশ-তালিকায় হয়ত আরও একটি অতিরিক্ত শাখা যোগ হবে। কেননা, রোসন জমাদারের এক বোনের যে ইন্দোরে সাদী হয়েছিল সে খবরটা চোখের সামনে রাখতে হবে।

স্লীম্যানের হাতে রচিত ঠগীদের এই বংশ-তালিকাগুলো এক বিস্ময়কর দলিল। কয় বছর আগেও যাদের অস্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তাঁর গবেষণার ফলে তারা আজ যে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রাজবংশের মত শাখাপ্রশাখায় সম্পূর্ণ এক-একটি সুস্পষ্ট বংশ। সাহেবের সামনে রাখা কাগজটির দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায়, এনায়েত বা দুর্গা—কেউ ভুঁইফোঁড় ঠগ নয়। পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য তাদের—এনায়েতের বৃদ্ধ প্রপিতামহ কে ছিল, তার অধস্তন পুরুষ ক'জন এবং তাদের মধ্যে ক'জন অযোধ্যা ছেড়ে দক্ষিণে এসে সংসার পেতেছিল তা যেমন সেখান থেকে এক লহমায় জেনে ফেলা যায়, তেমনি জানা যায় আজ এই মুহূর্তে এনায়েত ছাড়াও তার আর ক'টি ভাই ভাগিনা বা নিকট-আত্মীয় আছে। তাদের কি নাম, কি ঠিকানা এবং কার তহবিলে অপহৃত প্রাণের সংখ্যা কত, স্লীম্যানের বংশ-তালিকায় তাও আছে।

তবে কেবলমাত্র তার ভিত্তিতেই কোন ঠগীকে হাতে পাওয়া সম্ভব নয়। ফেরারীদের আইনের পরিধিতে আনতে হলে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে সব মানচিত্র ছেঁকে স্লীম্যান বসে বসে নিজে যে মানচিত্র তৈরী করেছেন সেগুলো। ঠগীদের এক-একটি এলাকার জন্যে এক-একটি মানচিত্র। গাঁ থেকে বের হয়ে একটি দল কোন্ কোন্ পথে চলতে পারে, রাত্রে কোথায় কোথায় আশ্রয় নিতে পারে, সেখানে আশ্রয় দেওয়ার মত কেউ আছে কিনা সব লেখা আছে তাতে। তার চেয়েও দরকারী নিশানা—পথের ডাইনে বাঁয়ে কোথায় কোথায় 'বাগ' বা খুনের জায়গা আছে, কোথায় আছে 'বিল' বা কবরখানা। ঠগীরা সাধারণত পথের যেখানে-সেখানে 'ঝিরণী' দেয় না, একশ' মাইল হাঁটতে হলেও তারা 'বাগ'-এ এসেই তবে রুমাল বের করবে, 'বিল'-এ কবর দেবে। সুতরাং, ঠগীর হদিস করতে হলে তার খবরগুলো সকলের আগে জানা দরকার।

দিন রাত সহকারীরা আসছেন, যাচ্ছেন। কেউ বিশেষ এলাকার সর্বশেষ মানচিত্র চাইছেন, কেউ স্লীম্যানের নিজস্ব দু'জন গুপ্তচর চান।

কেউ বা রাজসাক্ষী নিয়ে কবর খুলতে চলেছেন—স্লীম্যানের কোন বিশেষ নির্দেশ আছে কিনা, যাওয়ার আগে তাই জানতে এসেছেন। তিনি বের হতে না হতেই আর একজন ছুটতে ছুটতে রহস্যময় দু'টি খুনের খবর নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।—গলায় ফাঁসের কোন চিহ্ন নেই। পথের ধারে পড়ে আছে দু'টি নারী-পুরুষ।—আপনার কি মনে হয় স্যার, এগুলোও ঠগীদের কীর্তি ?

দিন রাত ঠগী আর ঠগী।

এমেলির মনে পড়ে, সেদিন তিনিও 'ঠগী-বৌ' হয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিদিন বসে বসে জবানবন্দীগুলো পড়তেন, কলকাতার জন্যে স্লীম্যান যে রিপোর্টটি তৈরী করছেন তা দেখতেন। নিজের বক্তব্য কিছু থাকলে তা পেশ করতেন। স্লীম্যান এমেলিকেও সেদিন ঠগী বিষয়ে রীতিমত বিশেষজ্ঞে পরিণত করে ফেলেছিলেন। তাছাড়া উপায়ও ছিল না। কেননা, প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের সহচরী যিনি তাঁর মনে ভয় বা ভ্রান্তি কোনটাই নিরাপদ নয়। স্লীম্যানের বাংলোয় সব সময় যে অন্তত গোটা কয় খুনী হাজির থাকে এমেলির পক্ষে সে খবরটা জানা ভাল। পথেও যে সঙ্গী হিসাবে তিনি জনাকয় খুনীকে বেছে নিয়েছেন, স্লীম্যান সে খবরটাও তাঁকে জানাতে ভুলতেন না।

সে এক আশ্চর্য জীবন। এমেলির মনে পড়ে, পরবর্তীকালের অসুস্থ, রুগ্ন স্লীম্যানের সঙ্গে কি পার্থক্য সেদিনের ঠগী স্লীম্যানের! বিশেষত ১৮২৬ সন থেকে ১৮২৯ সন এই বছর তিনটিতে। এমেলি এসেছেন '২৮ সনে। কিন্তু তার আগের বছরগুলোও তাঁর কাছে অজানা ছিল না। '২৬ সন থেকে নিজের সব শক্তি দিয়ে ঠগীদের সন্ধানে কাজে নেমেছেন স্লীম্যান। কোম্পানির কলকাতা দপ্তরে বছর বছর দীর্ঘ রিপোর্ট এসে পৌঁছচ্ছে। কোথায় কত ঠগী ধরা পড়ল, কিভাবে বিচার হল, কত জনের ফাঁসী হল, বাকীরা কোথায়—শত শত

পৃষ্ঠাব্যাপী তার বিস্তৃত বিবরণ। কিন্তু কোম্পানি তখনও কার্যত অনড়। সিভিল সার্ভেণ্ট স্লীম্যান তাঁদের হাতে এক অমূল্য সম্পদ। ঠগী দমনের কাজে তাঁকে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে রাজী নন। ১৮৩০ সনে, অর্থাৎ, মানচিত্র এবং বংশ-তালিকায় দেরাজে যখন আর ঠাঁই নেই,—তামাম হিন্দুস্তান যখন ঠগীদের হাতের পেন্সিলে চিহ্নিত—কোম্পানি তখন স্লীম্যানকে নিযুক্ত করলেন জব্বলপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট! হয়ত শেষ পর্যন্ত সে আসনে বসেই বাকী কাজটুকুও শেষ করতে হতো। কিন্তু স্লীম্যান তথা হিন্দুস্তানের সৌভাগ্য—তু'বছর আগে গভর্ণর-জেনারেলের আসনে বসেছেন—বেন্টিঙ্ক।

ইংরেজের ইতিহাসে 'বর্ণহীন পুরুষ' বেন্টিঙ্ক সম্ভবত আমাদের ইতিহাসে অন্যতম বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব। একদা (১৮০৭ সনে) ভেলোর বিদ্রোহের কারণে অকর্মণ্যতার অভিযোগে ওঁরা মাদ্রাজ থেকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে। সৈনিক সেজে বেন্টিঙ্ক অতঃপর যোগ দিয়েছিলেন স্পেনের রণাঙ্গনে। শোনা যায়, সেখানেও ডিউক অব ওয়েলিংটন মোটেই পছন্দ করতেন না তাঁকে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষও যে বিশেষ সুনজরে দেখতেন তাঁকে এমন নয়। ভারতে গভর্ণর-জেনারেলের পদে তিনি ছিলেন তাঁদের সামনে ষষ্ঠতম নাম। অন্য পাঁচ জন নানা কারণে বাতিল হয়ে গিয়েছিলেন বলেই 'বর্ণহীন' বেন্টিঙ্ক প্রেরিত হয়েছিলেন ভারতে। কিন্তু তৎকালের মাপে চিন্তায় প্রগতিশীল হুইগ, বেন্থাম-শিষ্য বেন্টিঙ্ক অচিরেই 'ঠগী'র মনোজয় করে নিলেন। তিনি সতীদাহ, সন্তান-বিসর্জন ইত্যাদির মত ঠগীদমনকেও তাঁর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। কেননা, বেন্টিঙ্ক বিশ্বাস করতেন—'ভারতে ইংরেজের নৈতিক দায়িত্ব বিরাট।' কথাটা বলে-ছিলেন অবশ্য এলেনবারো, কিন্তু তা কাজে পরিণত করলেন যিনি, তিনি—উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। এদেশে নামবার পরক্ষণেই তিনি স্লীম্যান এবং 'তাঁর নেশা' ঠগীদের বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তাঁর নির্দেশে

স্লীম্যানের ওপর তাদের দমনের বিশেষ কর্তব্যভার ন্যস্ত হল। দু'বছরের মধ্যে অনেক বাধা অপসারিত হল। এবং পরের বছর, ১৮৩১ সনে গভর্ণর-জেনারেলের বিশেষ নির্দেশে স্লীম্যান অন্য সব দায়িত্ব থেকে ছাড়া পেলেন। বেন্টিঙ্ক তাঁকে সমগ্র ভারতে ঠগী দমনের কাজে নিযুক্ত করলেন। এবার আর জব্বলপুরের জেলাশাসক নয়, —তাঁর পরিচয় 'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেনারেল'। গভর্ণর-জেনারেলের ঠগী দমন কার্যক্রমের তিনি সর্বাধিনায়ক। শুধু নর্মদা উপত্যকা নয়, লাহোর থেকে কর্নাটিক—সমগ্র ভারত তাঁর এলাকা। হেড কোয়ার্টার্স—সগর। সেখানে সাদা বাংলোটায় বসে বসে ফিরিঙ্গী 'ঠগ' মুলতানী আর জামুলদেহীদের সঙ্গে শেষ পাঞ্জা কষার কথা ভাবছেন!

কাজটা সহজ ছিল না।

পথে প্রথম বাধা কোম্পানির আইন। আইন অনুযায়ী অপরাধীর স্বীকারোক্তি বা তদনুযায়ী মাটির নীচে ক'টি মৃতদেহ প্রাপ্তিই যথেষ্ট ছিল না। কোম্পানির বিচারকেরা রাইটার থেকে আইনের সিঁড়ি ডিঙ্গাতে ডিঙ্গাতে বিচারক হয়েছেন। তাঁরা আরও সাক্ষী-প্রমাণ চান। কিন্তু ঠগীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে কে?

স্লীম্যান লিখছেন: ১৮২৪ সনের শীতকালের কথা। হিন্দোরিয়ায় এসে আস্তানা পেতেছে দু'শ ঠগীর একটি দল। ভোরে সাত জন লোক ওদের সামনা দিয়ে চলে গেল। তাদের প্রত্যেকের হাতে হাতে বন্দুক। ওরা দেখেই বুঝল—নিশ্চয় টাকা নিয়ে যাচ্ছে। একজন গিয়ে জেনে এল—ওদের সঙ্গে টাকা পয়সা যা আছে সব তার জব্বলপুরের বিখ্যাত ব্যাঙ্কার মোতি কোচিয়ার। তাঁর টাকা নিয়েই ওরা বান্দা চলেছে। বান্দা জায়গাটা এলাহাবাদের পঁচান্নব্বুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। খবর শুনেই তিন জন দলপতি তক্ষুনি চল্লিশ জন সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে।

সাত মাইল চলার পর একটা খালের ধারে এসে লোকগুলোর দেখা পাওয়া গেল। কাছাকাছি কোন 'বিল' নেই, আধমাইল দূরে একটি গাঁ ছাড়া কোন বন নেই। অথচ রকম দেখে মনে হচ্ছে লোকগুলো খুবই হুঁসিয়ার, তারা কিছুতেই অচেনা সঙ্গীকে ধারে ঘেঁষতে দেবে না। সুতরাং, ওরা একটি অ-ধর্মীয় সিদ্ধান্ত নিল। ঠগীর মত সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে অতর্কিতে তলোয়ার হাতে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠগীরা সাধারণত এমন আচরণ করে না!

যাহোক, ওরা যখন মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত তখন হঠাৎ চোখে পড়ল গাঁয়ের একটি লোক এই দিকেই আসছে। গ্রামটির নাম—সুজাইনা। সেখানে অনেক গো-পালকের বাস। সে খবরটা ওদের জানা থাকবার কথা। তাছাড়া, লোকটি একটি মোষ সঙ্গে নিয়ে হাঁটছিল। 'আইনত' সে অবধ্য। কিন্তু ওরা সেদিন ধর্মের পথ পুরোপুরি ত্যাগ করেছে। সুতরাং, লোকটি কাছাকাছি আসা মাত্র তাকেও তলোয়ারের এক ঘায়ে ধরাশায়ী করা হল। কেননা, ওরা জানে মরা মানুষ সাক্ষী দিতে পারে না! যুগপৎ দু-দু'টি অশাস্ত্রীয় কাজ করে ওরা তৃতীয় পাপ করল। মৃতদেহগুলো কবরস্থ না করেই ধনদৌলত যা ছিল লুঠে নিয়ে নিজেদের পথ ধরল।

সেদিন রাত্তিরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। পরের দিন ভোরে সুজাইনা থেকে হাত্তার দিকে হাঁটছিলেন গাঁয়ের ক'টি মেয়ে। পথের ধারে একগাদা মৃতদেহ দেখে তাঁরা আঁতকে উঠলেন। একজন তাঁদের গাঁয়ের মানুষটিকে চিনে ফেললেন। হাত্তা যাওয়া স্থগিত রেখে খবর দিতে তাঁরা আবার গাঁয়ে ফিরে এলেন।

দেখতে দেখতে পথের ধারে ভীড় জমে উঠল। গোটা গাঁ ভেঙ্গে পড়ল সেখানে। সকলে মিলে গাঁয়ের মানুষের দেহটি দাহ করলেন। বাকী সাতজন শেয়াল শকুনের জন্য সেখানেই পড়ে রইল।

বহুদিন পরে খুনীদের জবানবন্দী অনুযায়ী স্লীম্যানের লোকেরা *যখন সেখানে পৌঁছলেন—তখন সাত পথিক বা গ্রামের সেই* হতভাগ্যের কোন চিহ্ন নেই। গোটা গাঁ এক জায়গায় জড় করা হল। সবাই একবাক্যে জানাল, না হুজুর, আমাদের গাঁয়ের আধমাইলের মধ্যে এমন ঘটনা কিছুতেই হতে পারে না! হলে নিশ্চয় আমরা জানতে পারতাম। বিস্তর ভয় দেখান হল, জেরা চালান হল, কিন্তু গাঁয়ের সেই এক কথা—এসব ঝুট খবর হুজুর, ঝুট খবর! কে আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে!

স্লীম্যান লিখছেন: ওদের এই আচরণের একমাত্র কারণ আদালতের ভয়।—ওরা কেউ সাক্ষী দিতে চায় না। কেননা, তাতে বিস্তর ঝামেলা। গাঁ ছেড়ে বহুদূর যেতে হবে, কাজকর্মের ক্ষতি হবে, তারপর জেরা, শুনানী আরও কত কি আছে!

এসবের ভয়েই যে লোকগুলো মিথ্যে বলছিল তারও প্রমাণ পাওয়া গেল ক'মিনিটের মধ্যে। তদন্তকারী অফিসার যেই বললেন, তোমরা নির্ভয়ে বল, তোমাদের কাউকে সাক্ষী দিতে শহরে ছুটতে হবে না। ওরা তক্ষুনি তাঁকে সেই খুনের জায়গায় নিয়ে চলল!

একই আদালতভীতি তখন শহরের মানুষের মধ্যেও। ঠগীদের হিসেব মত লোকগুলোকে খুন করে ওরা সেদিন সাকুল্যে চার হাজার পাঁচশ' টাকা পেয়েছিল। কিন্তু কোথাও কোন থানায় তার কাছাকাছি সময়ে সেই মর্মের কোন এজাহার নেই। হারিয়ে যাওয়া সাতজন মানুষ বা এতগুলো টাকা—কোন বিষয়েই কোথাও কোন বক্তব্য নেই। অবশেষে ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন খাস জব্বলপুরে মোতি কোচিয়া আবিষ্কৃত হলেন—তখন তাঁরও সেই এক কথা,—ঝুট বাত হুজুর! নিশ্চয় কোন শত্রু আমাকে বিপদে ফেলার জন্যে আপনাদের এই খবর দিয়েছে! বাধ্য হয়েই স্লীম্যানকে তাঁর গোপন খাতায় হাত দিতে

হল। দেখা গেল, সেখানে ঐ তারিখে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে বান্দায় পাঠান টাকার হিসেব। পাশে সাতজন বেয়ারার নাম।

স্লীম্যান বললেন, তবে?

মোতি কোচিয়া জবাব দিল, কে এতসব হুজ্জত পোয়াতে চায় বলুন।

কেউ তা পোয়াতে চাইত না। স্লীম্যানের তাই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল এ অসুবিধা দূর করা। তিনি কলকাতায় দরবার সুরু করলেন। তাঁর বক্তব্য—কোম্পানির ম্যাজিস্ট্রেটদের নিজ নিজ এলাকায় আটকে রাখলে চলবে না। ঠগীদের ক্ষেত্রে তাঁদের এক্তিয়ার বাড়াতে হবে। যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট যাতে যে কোন এলাকার ঠগীর বিচার করতে পারেন তেমন আইন করতে হবে। কেননা, কোন ঠগীই আপন ঘরের পাশে খুন করে না। তারা রুমাল খোলে নিজের গাঁ থেকে শত শত মাইল দূরে, ধরা পড়ে আরও দূরে, হয়ত অন্য কোন রাজ্যে। সুতরাং, যদি সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ওদের বিচারের দায়িত্ব নিতে না পারেন তবে স্লীম্যানের কাজ আরও বেড়ে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কারণ, অপরাধী হাতে পেয়েও যদি ম্যাজিস্ট্রেটের সন্ধানে হাজার হাজার মাইল ঘুরে বেড়াতে হয়, তবে অপরাধী সন্ধান করবে কে? স্লীম্যান তাই দাবী তুললেন—পুরানো ব্যবস্থা রদ করা হোক। তাঁর দ্বিতীয় দাবী—সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের ঝামেলাও কমাতে হবে। তার একমাত্র পথ লিখিত সাক্ষ্যকে মৌখিক সাক্ষ্যের মর্যাদা দেওয়া। সাক্ষী যদি কাছাকাছি আদালতে যেতেও অস্বীকার করে তবে অন্যভাবে তার বক্তব্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। তাকে ডাকযোগে নিজের কথা জানাবার সুযোগ দিতে হবে।

বেন্টিঙ্ক সানন্দে তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। স্লীম্যানকে

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-জেনারেল নিযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে নর্মদা এবং সগর এলাকায় তাঁর প্রতিনিধি স্মিথ সাহেবের ওপর ভার দিলেন ঠগীদের বিচার করবার। পরবর্তীকালে অবশ্য একই উদ্দেশ্যে হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ইন্দোর, লক্ষ্ণৌ এবং গোয়ালিয়রেও কয়েকটি বিশেষ আদালত স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সেদিন স্লীম্যান এবং স্মিথ দু'জনেরই প্রধান কর্মশালা—সগর। সেখানে দু-দু'টি কারাগার তৈরী করা হয়েছে। অবশ্য, স্লীম্যানের দৌলতে কোম্পানির তাতে এক পয়সাও খরচ হয়নি। ইতিমধ্যে তিনি যেসব ঠগী ধরেছেন তাদের লুঠের মাল বিক্রি করেই বাড়ী দু'টি তৈরী করা হয়েছে। এমনকি ১৮৩৪ সন পর্যন্ত সেখানকার টুকিটাকি খরচও সেই তহবিলেই চলেছিল।

আর একটি বন্দীশালা ছিল জব্বলপুরে। সেখানে রাখা হত রাজসাক্ষী এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের। ১৮৩৮ সনে তাদের অন্য জীবিকায় দীক্ষিত করার বাসনায় সেখানে একটা শিল্প বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল।

সে যা হোক, আদালতের মামুলী অসুবিধেগুলো দূর হল বটে, কিন্তু ক্রমে বোঝা গেল সেগুলোই একমাত্র বাধা নয়।

রাজপুতানার সীমান্ত থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন স্লীম্যানের উত্তেজিত অনুচরেরা। তাড়াতে তাড়াতে তাঁরা দলটাকে প্রায় নাগালের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু বাদ সাধলেন সাদারল্যাণ্ড রাজস্থানের দেশীয় রাজ্যসমূহে তিনি কোম্পানির প্রতিনিধি। স্লীম্যানের অনুচরদের তিনি সেখানে ঢুকতে দিতে রাজী নন। কেননা, তাতে রাজন্যবর্গের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা!

একই খবর এল গোয়ালিয়র সীমান্ত থেকে। ক্যাভেনডিসের মত প্রখর মানুষ রয়েছে সেখানে। কিন্তু তাঁরও নাকি একই কথা! দেশীয় রাজ্যে ঢুকে এভাবে হামলা করা ঠিক নয়।

চিন্তিত স্লীম্যান আবার সেই পুরানো বন্ধু কারভিন স্মিথের দ্বারস্থ হলেন। স্মিথ ধরলেন কলকাতায় চীফ-সেক্রেটারী সুইনটনকে। তিনি বেন্টিঙ্ককে। গভর্ণর-জেনারেল হস্তক্ষেপ করলেন। তবে সে সমস্যার সুরাহা হল।

তারপর আবার নতুন সমস্যা।

কাজে নেমে জানা গেল, অবশিষ্ট ভারত যতটা নির্দোষ সেজে আছে ঠিক ততখানি নির্দোষ সে নয়। জমিদার-তালুকদারেরা অনেক ক্ষেত্রেই এই বেপরোয়া খুনীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। কেননা, ওরা খাজনা দেয়। অনেক সময় তার বেশীও! তাছাড়া লুঠের মালের অন্য অংশীদারও অনেক।

ভুকুত জমাদারের জবানীতে বলা বিখ্যাত রুরওয়াঘাট হত্যাকাণ্ডের উপসংহার কাহিনীটি সেদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ :

রকৌরিয়া উধাও হয়ে গেল। তাদের কোন খবর নেই দেখে চিন্তিত ধনরাজ শেঠ নিজের প্রতিনিধি করে বিহারীলালকে পাঠাল ইন্দোরে। সে এসে স্থানীয় ইংরেজ রেসিডেণ্টকে ধরে পড়ল, হুজুর, আপনার উপস্থিতি সত্ত্বেও ইন্দোর পথ থেকে নগদ পনের হাজার টাকা সহ আমাদের লোক উধাও হয়ে গেছে। আপনাকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে! বিহারীলাল একই আরজি পেশ করল বুন্দেলখণ্ডে গভর্ণর-জেনারেলের প্রতিনিধির দরবারে! তিনি দায়িত্বশীল লোক। খবর শুনে চারিদিকে নির্দেশ পাঠালেন।—যে করে হোক, হারানো মানুষগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে। যদি না পারা যায় তবে খুনীদের! কোম্পানির উপস্থিতি সত্ত্বেও এমন কাণ্ড ঘটা মোটেই গৌরবের নয়।

ভদ্রলোকের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ভুকুত জমাদার ধরা পড়ল। সেই সঙ্গে দলের আরও কয়েকজন! বুন্দেলখণ্ড থেকে তাদের পাঠান হল ইন্দোরে, সেখানকার রেসিডেণ্টের কাছে। তিনি তাদের আবার

ফেরত পাঠালেন বুন্দেলখণ্ডে। কারণ, ওদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলে দেখেছেন, ওরা আসলে সেদিককারই লোক! বুন্দেলখণ্ডের এজেণ্ট তাদের স্থানীয় শাসকদের হাতে তুলে দিলেন। বললেন, এরা আপনার প্রজা, ধনরাজ শেঠ নামে আমাদের এক প্রজার ধন লুঠ করেছে। অভিযোগকারী ক্ষতিপূরণের দাবী তুলেছে, এখন আপনি যা করেন!

স্থানীয় ভূস্বামীরা ভুকুতকে ডেকে বললেন, তোমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সাহেবরা ক্ষেপে গেছেন,—পুরো না পার, বারো আনা দিতেই হবে!

ওরা তা মিটিয়ে দিতে রাজী হল। সঙ্গে যাদের টাকা ছিল তারা সেখানে দাঁড়িয়েই নিজ নিজ দেয় মিটিয়ে দিল। যাদের কম পড়ল, তারা সঙ্গীদের থেকে ধার করল। অন্যরা করজোড়ে সময় প্রার্থনা করল। ভূস্বামীরা বললেন, তথাস্তু। এবার তোমরা যেতে পার।

বিহারীলাল টাকা গুনে নিয়ে ওদের পিছু পিছু বের হল। তারপর ওদের ডেকে বলল, ভুকুত আর ছোটি—তোমরা আমার কাছে থাক। বাকী যারা আছ তারা আজই বের হয়ে পড়, টাকা জোগাড় করে নিয়ে এস। ভুকুত লোক চেনে। সে তার সঙ্গে রয়ে গেল। কথাপ্রসঙ্গে ভুকুত তাকে সবই বলল। বলল, দেখ ভাই, টাকা আমরা পাই বটে, কিন্তু হুজ্জতও কম নয়!—এই তো, ধরম খাঁ জমাদার এখনও পড়ে আছে গোয়ালিয়রের কারাগারে!

—তাকে ছাড়াতে চাও?

—অবশ্য। সাচ্চা ঠগীর মত উত্তর দিল ভুকুত জমাদার।

—কত খরচ করতে পারবে বল? বিস্মিত ভুকুত দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে যে মানুষটি সে ধনরাজ শেঠের কর্মচারী মাত্র নয়, তাদের চেয়েও বিচক্ষণ ঠগী। বন্ধুকে সে বুকে জড়িয়ে ধরল।

—টাকার জন্যে ভাববে না ভাই, আগে তুমি কাজ হাসিল কর।

বিহারীলাল সত্যিই ধরম খাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল। নজরানা মিলল—ন' হাজার টাকা! রকৌরিয়ারা মাটির নীচেই চাপা পড়ে রইল, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ধনরাজ শেঠের ততোধিক প্রভাবশালী এজেণ্ট বিহারীলালের নতুন পেশা দাঁড়াল ঠগীদের ছাড়িয়ে আনা! এ কাজে দস্তুরী অনেক!

স্লীম্যান এই পৃষ্ঠপোষকতাকে নির্মূল করার সংকল্প নিলেন। কিন্তু সেও দুরূহ কাজ। কেননা, স্থানীয় রাজন্যবর্গ কিছুতেই এ ব্যাপারে মন খুলে কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না। এজন্যে নয় যে, ঠগীদমনে তাঁদের আন্তরিক কোন অনিচ্ছা আছে, তাঁদের বলিষ্ঠ হাত-পাগুলো বেঁধে রেখেছে যে বস্তু সে ভয়, ঠগীদের ভয় নয়, ধর্মভয়। ঠগীরা সাধারণ খুনী নয়, তারা ভবানীর সন্তান। মায়ের আদেশেই তারা এই পথে নেমেছে। সুতরাং ধর্মভীরু শাসকরা তাদের ওপর হাত তুলতে ভরসা পান না। দিনে দিনে তাঁদের মনে এ ধারণা তখন বদ্ধমূল হয়ে গেছে—এদের ওপর শাসন ফলাতে গেলে বিনাশ অনিবার্য।

ঠগীরা নিজেরাও তাই বলত।

স্লীম্যান বললেন, দেখেশুনে আমার মনে হচ্ছে, যত ভীরুর রাজত্ব সব এদিকে—নর্মদার নীচে! অন্য এলাকায়ও কি স্থানীয় রাজা-তালুকদারেরা এমনি?

দুর্গা উত্তর দিল, সব জায়গায় হুজুর! জেনেশুনে কে ঠগীর গায়ে হাত তুলতে চায় বলুন? একবার মাধোজী সিন্ধিয়ার কি মতলব হল, সত্তর জন ঠগকে তিনি কয়েদ করলেন। রাত্রে দেবী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, দেখ বাছা, কাজটা তুমি ভাল করনি। যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে কালই ওদের ছেড়ে দিও।

মাধোজী সেকথা কানে তুললেন না। এত বড় রাজা, তার ওপর জোয়ান বয়স—পরদিন ঘুম থেকে উঠেই তাঁর প্রথম কাজ হল ঠগীদের

কোতল করা। তিনি পুরো দলটাকেই তোপের মুখে উড়িয়ে দিলেন। তারপর নিশ্চিন্ত মনে রাত্রে আবার বিছানায় গিয়ে শুলেন। সে রাত্তিরেও স্বপ্নে দেবী আবার আবির্ভূত হলেন তাঁর সামনে। কিন্তু তিনি আর সেই আগের রাতের ভবানী নন,—তাঁর ভিন্ন রূপ! সেই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে মাধোজী শিউরে উঠলেন। ঘুমের মধ্যেই তিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। রানী পাশেই ছিলেন। ঘুমন্ত মাধোজীকে জাগিয়ে দিলেন। কিন্তু মাধোজী তখন আর তাঁর মধ্যে নেই।—দুর্গা বলে চলল—রানী যতই তাঁর ভয় ভাঙ্গাতে চেষ্টা করেন মাধোজী ততই ভয়ে কাঁপেন। খবর পেয়ে দাসদাসী সিপাই-সান্ত্রী যে যেখানে ছিল সবাই ছুটে এল। সকলের এক জিজ্ঞাসা—কি হয়েছে হুজুর, আমাদের বলুন! আমরা এতগুলো লোক হাজির আছি, আপনার ভয় কি? কিন্তু মাধোজীর মুখে কোন কথার জবাব নেই। শেষে একে একে সবাই যখন চলে গেল, মাধোজী তখন রানীকে ডেকে বললেন, রানী, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে, আমি মহাপাপ করে ফেলেছি।

কাঁদতে কাঁদতে রানী বললেন, কি পাপ মহারাজ?

মাধোজী উত্তর দিলেন, আমি দেবীকে অমান্য করেছি!

স্লীম্যান বললেন, তারপর?

দুর্গা বলল, তারপর আর কি হুজুর! যা হওয়ার তাই হল। ভোর থেকে মাধোজীর রক্তবমি সুরু হল। কত হেকিম এল, বদ্যি এল, কিন্তু কেউ তাঁকে ধরে রাখতে পারল না, তিনমাসের মধ্যে মাধোজী চলে গেলেন।

আর একজন ঠগী দুর্গাকে মনে করিয়ে দিল—হুজুরের কাছে নানার খবরটা বল-না, সেবার বুধোকে মেরে সেও কি কম সাজা পেয়েছিল!

হাতে কলম চলছিল বটে, কিন্তু কানটা ছিল এদিকেই। কলম

থামিয়ে স্লীম্যান বলে উঠলেন, কোন্ নানা? কি হয়েছিল তাঁর? সে খবরটাও ভাল করে শোনা দরকার।

দুর্গা আবার নতুন করে সুরু করল, নানা ছিলেন জালৌনের রাজা। একবার হল কি, বুধো আর তার ভাই খুমোলিকে পাকড়াও করে সিপাইরা তাঁর কাছে নিয়ে হাজির করল।

রাজা বললেন, কে ওরা?

সান্ত্রীদের যে জমাদার ছিল সে বলল, মহারাজ, ওরা ঠগী। মানুষকে খুন করে ওরা টাকাপয়সা সব লুঠে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

রাজা বললেন, বটে!

বুধো তখনকার দিনের বহুৎ খানদানী ঠগ। সে অপরাধ কবুল করল। তারপর বলল, হুজুর, দেবীর নির্দেশে আমরা পথে নেমেছি। তিনি যেমন বাঘ সৃষ্টি করেছেন তেমনি ঠগও সৃষ্টি করেছেন। কার কি করা উচিত না উচিত তা তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র।

বাঘের সঙ্গে ঠগের এই তুলনাটা এর আগেও স্লীম্যান দু'চারবার অন্যদের মুখে শুনেছেন। তিনি ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে বুঝতে চাইলেন। কেননা, বনের বাঘের সঙ্গে লোকালয়ের মানুষের এই উপমাটার মধ্যে এদের জীবনাদর্শের নতুন কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়াও হয়ত অসম্ভব নয়।

ঠগীর দলে সবাই 'শাস্ত্রজ্ঞ'। নিজেদের 'ধর্ম' সম্পর্কে যা জানা দরকার সকলেরই তা মুখস্ত। সুতরাং, জালৌনরাজ তখনকার মত বিদায় নিলেন। দুর্গা একপাশে সরে দাঁড়াল। সবাই একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সাহেবকে ব্যাঘ্র-তত্ত্ব বোঝাতে।

স্লীম্যান লিখছেন: ওরা নিজেদের বাঘের সঙ্গে তুলনা করে। কারণ, বাঘ যেমন ঈশ্বরের সৃষ্টি, তেমনি ওরাও। বাঘ যখন মানুষ খায় তখন অন্য মানুষ খেদ করে বটে, কিন্তু তর্ক তোলে না। কারণ,

সকলেরই জানা আছে বাঘের তাই ধর্ম, মানুষ তার খাদ্য। ঠগীরাও তাই বলে। নরহত্যাই তাদের ধর্ম। ভবানী সে কাজেই রুমাল হাতে ওদের মর্ত্যে পাঠিয়েছেন। দেবীই ওদের সামনে শিকার তুলে দিচ্ছেন, সুতরাং ওদের দোষ কোথায় ?

স্লীম্যান আরও লিখছেন—ঠগীরা কখনও বাঘ মারে না। ওরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, কোন ঠগী যদি নিজ ধর্মে অবিচল থাকে তবে তাকেও কোন বাঘ স্পর্শ করবে না। বাঘ যদি কোন ঠগীকে খায় তবে ওরা ধরে নেয় যে, নিশ্চয় সে দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, নিশ্চয় সে লোভের বশে কোন বামাল নিজের জন্যে সরিয়ে রেখেছিল। তেমনি যদি কখনও কোন ঠগী স্বেচ্ছায় কোন বাঘকে হত্যা করে তবে ওরা জানে, অচিরেই সে বিদায় নিচ্ছে বলে !

—যা হোক, দুর্গা আবার তার কাহিনী সুরু করল—জালৌনরাজ বুধোর সে কথা কানে তুললেন না। তাঁর রাজত্বে খুনের কথা শুনে তিনি রেগে আগুন হয়ে গেলেন। হুকুম দিলেন—ওদের হাতির পায়ের তলায় পিষে মার।—আজই—এক্ষুনি !

তাই করা হল। বুধো আর তার ভাই খুমোলিকে সেদিনই নানার সামনে হাতির পায়ের তলায় পিষে মারা হল। ব্যস, আর যায় কোথা ? পরের দিনই রাজাবাহাদুরের পা ফুটে বের হল দেবীর কোপ। তাঁকে মহারোগে ধরল। দেখতে দেখতে তাঁর সোনার অঙ্গ কুষ্ঠে ছেয়ে গেল !

স্লীম্যান জানতে চাইলেন—বুধোকে মারার ফলেই যে তাঁকে এ ব্যাধি ধরেছে রাজা কি তা বিশ্বাস করতেন ?

—না করে উপায় ? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল দুর্গা,—তা না হলে কি আর পাপ খণ্ডনের জন্যে তিনি এত চেষ্টা করতেন ? কি করলে দেবীর শান্তি হবে তা ভেবে ভেবে রাজা তখন হয়রান।

—কিছু কি করেছিলেন তিনি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! সে আপনি না দেখলে বিশ্বাস করবেন না হুজুর। জালৌনে বুধো একটা কুয়ো আরম্ভ করেছিল। বেচারা সেটি আর শেষ করে যেতে পারেনি। রাজা বললেন—ভবানীর-বেটার এই কাজের দায় আমার। তাঁর হুকুমে কুয়ো ইঁদারা হল। বিরাট ইঁদারা। চমৎকার জল তার। শুধু তাই নয় হুজুর, বুধো আর খুমোলির নামে জালৌনে এক বিরাট 'ছাবুত্রা' প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। মস্ত মন্দির। রাজা সেখানে শত শত ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে ভূরিভোজন করালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, ক'মাসের মধ্যেই পাপের দাম চুকিয়ে দিতে হল তাঁকে—তিনি চলে গেলেন।—ইচ্ছে করলে তাঁর সেই কুয়ো আর মন্দির আপনিও দেখতে পারেন হুজুর। এখনও তা তেমনি আছে। বছর বছর শত শত লোকের পায়ের ধুলো পড়ে সেখানে, সবাই এ কাহিনী জানে!

দুর্গার কাহিনী শেষ হল। এবার মুখ খুলল কল্যাণ সিং।—কার কাছে কি বলছ তুমি জমাদার? হুজুরের কি এসব অজানা?—সেবার হোসুঙ্গাবাদে আমাদের দল যখন ধরা পড়ল তখনও কি হুজুর, সেখানকার রাজা-জমিদাররা আমাদের ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেননি? ওঁরা জব্বলপুরে পর্যন্ত লোক পাঠিয়েছিলেন।—নয় কি হুজুর? অথচ, বললে বিশ্বাস যাবেন না, আমরা কোনদিন ওঁদের চোখেও দেখিনি!

—তবুও ওঁরা তোমাদের জন্যে এমন মায়াকান্না কেঁদেছিলেন কেন বলতে পার? স্লীম্যান অজ্ঞের ভান করলেন।

কল্যাণ সিং উত্তর দিল, আমরা ওঁদের বলে পাঠিয়েছিলাম হুজুর যে, ওঁরা যদি আমাদের ব্যবসায় বাধা না দেন তবে অন্য প্রজা যা খাজনা দেয় আমরা তার পঞ্চাশ গুণ বেশী খাজনা দেব। তাছাড়া, প্রতি বছর যথাসাধ্য নজরানাও দেব!

ছোটি বলল, সেজন্যেই তো আট-দশটা ঠগের জন্যে খাইরোর

তালুকদার এমন করে তাঁর নিজের প্রভু ঝাঁসীরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন !—ঠগীরা একা খায় না হুজুর।

কাসিম খাঁ বলল, বাহমনপুরের জমিদার কি করেছিলেন তা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন হুজুর! আপনাদের হুকুম মেনে গোয়ালিয়রের মহারাজা বাহমনপুরে খবর পাঠালেন—ঠগীদের আমার হাতে তুলে দাও! বাহমনপুরের জমিদার মহারাজার প্রজা। তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর নিজের সামন্ত তাঁকে অমান্য করবেন না। কিন্তু জমিদার বেঁকে বসল। সে জবাব পাঠাল—তা হয় না মহারাজ। ওরা আমার আশ্রিত। বাধ্য হয়েই মহারাজকে ফৌজ পাঠাতে হল। আমরা বললাম, ক'টা ঠগীর জন্যে প্রাণহানি কি দরকার; তালুকদার, তুমি আমাদের ছেড়ে দাও। নসিবে যা আছে তা খণ্ডাবে কে? তালুকদার কিছুতেই তাতে রাজী নয়। ফলে দুই দলে লড়াই হল। ভোর থেকে বেলা ন'ঘড়িতক তুমুল লড়াই চলল। দু'পক্ষেই বিস্তর লোক মারা গেল। কমজোরী তালুকদার গোয়ালিয়ররাজকে ঠেকাতে পারল না। তার হাতে মোটে ষোলটা বন্দুক ছিল! তাহলেও সে শেষ পর্যন্ত লড়াই করল। আমাদের জমাদার গুলাব খানের সঙ্গে তার খুব খাতির ছিল।—কোন্ গুলাব খান চিনতে পারলেন হুজুর? সেই যে যার বাপকে গেল বছর সগরে আপনি ফাঁসী দিলেন। এখন সে টমাস সাহেবের সঙ্গে আছে, আমার মতই সে বেচারাও রাজসাক্ষী হয়েছে।

ধমকে উঠলেন স্লীম্যান—এসব খবর রাখ, যা বলছিলে তাই বল।—শেষে তালুকদারের কি হল?

—কি আর হবে হুজুর, কাসিম খাঁ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আবার তার কাহিনী সুরু করল—বেলা ন'ঘড়িতক লড়াই শেষে হয়রান হয়ে তালুকদার ক্ষান্ত হল। লড়েছিল বটে মানুষটা! লর্ড সাহেব তখন রায় সাহেবের সঙ্গে মাত্র এক ক্রোশ দূরে তাঁবু ফেলে আছেন, তিনিও গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে থাকবেন।

স্লীম্যান বললেন, ব্যস, হয়েছে। এবার থাম।

লর্ড সাহেবের কথা শুনে আবার বেন্টিঙ্ককে মনে পড়ে গেছে। এই অন্ধকার থেকে বের হওয়ার মত আলোর সন্ধান একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। রাজসাক্ষীদের বিদায় দিয়ে স্লীম্যান তক্ষুনি আবার একটি নতুন রিপোর্ট লিখতে বসলেন। এবারকার রিপোর্টের বিষয়বস্তু ঠগী এবং স্থানীয় মানুষ। তাঁর সহকর্মীদের অভিজ্ঞতা এবং রাজসাক্ষীদের জবানবন্দীগুলো উদ্ধৃত করে স্লীম্যান প্রমাণ করলেন—সমগ্রভাবে ভারতের সঙ্গে ঠগীদের কোন প্রাণের যোগ না থাকলেও কিছু কিছু রাজা-জমিদার এবং নীচুতলার মানুষ ওদের নিয়মিত ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে। তারা অবশ্য ধর্মের দোহাই দেয়, কিন্তু তাঁর নিজের ধারণা সেসব কথা সত্য নয়। ধর্মের চেয়ে ঘরফেরত ঠগীদের পিঠের বোঝাগুলোর দিকেই তাদের নজর বেশী। এই লোভকেও দমন করা আবশ্যক।

১৮৩৬ সনে বেন্টিঙ্ক তার উপায়ও হাতে তুলে দিলেন। সে বছর আইন করা হল—অপরাধী শুধু ঠগীরাই নয়, তাদের যারা সাহায্য করে তারাও। সুতরাং, অতঃপর যদি তাদের সঙ্গে কারও সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয় তবে যত বড় মান্য লোকই হোন না কেন তিনি, তাঁকেও সাজা পেতে হবে। কোম্পানির আইন অনুযায়ী সে দণ্ডের পরিমাণ ধার্য হল—যাবজ্জীবন কারাবাস!

শেষ পর্যন্ত একে একে সব বাধা অপসারিত হয়েছিল বটে, কিন্তু কোন বাধাই স্লীম্যানের নিজের কর্মসূচীকে একদিনের জন্যে থামিয়ে রাখতে পারেনি। আইনের আগে আগে যথারীতি ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চলেছেন 'ফিরিঙ্গী ঠগী'।' ৩১ সনে বেন্টিঙ্ক যখন আর সব দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে সগরের সাদা বাংলোয় বসিয়েছেন ওঁকে, স্লীম্যান তখন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত 'দেবতা'। তাঁর আপন অনুচরদের

কাছে তিনি যেমন এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব আর এক রহস্যময় 'ঠগী',—ঠগীদের মধ্যেও তিনি তেমনি এক রহস্যময় 'অবতার', অবিশ্বাস্য পুরুষ।

প্রথমে ওরা খবর শুনে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল। শত শত বছরের নিশ্চিন্ত জীবনের অভিজ্ঞতায় পাওয়া অবহেলার হাসি। কিন্তু সে মাত্র কয়েক দিনের জন্যে। তারপর হঠাৎ পথের বাঁকে আবির্ভূত হতে লাগল তীর্থযাত্রীর বদলে ঘোড়সওয়ারের দল। চারদিকে চোখ ওদের। তবুও ওরা ভেবে পায় না, যমের মত এই মানুষগুলো কোথা থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। শুধু কি তাই? ঘোড়া থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমেই চেঁচিয়ে ওঠেন সাহেব—কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। আমরা স্লীম্যানের লোক। সাহেবের হুকুমে তোমাদের ধরে নিতে এসেছি, চল আমাদের সঙ্গে।

জমাদার আপত্তি তোলার চেষ্টা করে, কিন্তু বৃথাই। সঙ্গে সঙ্গে পিঠের থলি থেকে একটা কাগজ টেনে নেবেন সাহেব। তারপর বলবেন, মিথ্যে বলে লাভ নেই। তোমার নাম অমুক, তোমার বাবার নাম অমুক, তোমার ঠাকুর্দার নাম অমুক,···তোমার তিন ছেলে, দুই মেয়ে। তাদের বিয়ে হয়েছে অমুক গাঁয়ে, স্বামীর নাম···। আরও শুনতে চাও? সাহেব এবার থলি থেকে মানচিত্রটা বের করবেন। তোমরা এই গ্রাম থেকে অমুক দিন বের হয়েছিলে, তারপর এই এই পথ ঘুরে আজ এখানে এসে পৌঁছেছ। পথে অমুক অমুক জায়গায় তোমরা খুন করেছ, কবর দিয়েছ এই এই বিলে!—নয় কি?

নির্বোধ শিশুর মত ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর নিঃশব্দে সাহেবের পিছু পিছু সগরের পথ ধরে।

সারাদিন হেঁটে এসে পথের ধারে একটা গাঁয়ে আস্তানা পেতেছে পুরো একটি দল। সে গাঁ সদর রাস্তা থেকে প্রায় মাইলখানেক

দূরে। মোড়লের সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। সেই সুবাদেই সেখানে ঠিকানা করা। নিশ্চিন্ত আশ্রয়। সারাদিনের শ্রমের পর মোড়লের ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বন্ধু জমাদার এবং তার অনুচরবর্গ। হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে এসে হানা দিয়ে বসে অজ্ঞাত আগন্তুক দল। ওরা পালাতে গিয়ে দেখতে পায় সব পথ বন্ধ। সেখানে গাঁ ঘিরে মশাল হাতে বন্দুক ঘাড়ে দাঁড়িয়ে আছে দুষমন। সকলের মুখে এক কথা—আমরা স্লীম্যানের লোক! ওরা ভেবে পায় না, কে এই স্লীম্যান, তিনি কি মানুষ না ঈশ্বর! যেখানেই ওরা সেখানেই স্লীম্যান!

সেবার ওরা রাজপুতানার মরুভূমি পার হচ্ছিল, কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ বালি ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এল উর্দিপরা একদল লোক। জমাদার প্রথমে ভেবেছিল, হয়ত আর একটি ঠগীর দল। এগিয়ে গিয়ে বলেছিল—'রাম রাম!' ওরা জবাব দিয়েছিল, হাত ওঠাও! আমরা ঠগী নই, স্লীম্যানের লোক।

সুদূর কানপুরের শহরতলীতে নিজের ছাউনিতে দুটো বৌ আর একগাদা নানা বয়সের মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার পেতে বসে আছে 'ধুতুরিয়া'। পরমানন্দে তামাক খাচ্ছে আর মনে মনে ভাবছে, ক'দিন গেলেই হাতে আসবে ঝকঝকে কতকগুলো টাকা! বৌয়ের নতুন ঘাঘরা হবে, চাই কি ইচ্ছে করলে আরও দুটো পোষা যাবে!···হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ল। ছেঁড়া তাবু ঘিরে বর্ষার মেঘের মত কালো কালো কতকগুলো ছায়া ভেসে উঠল। কোথায় লক্ষ্ণৌ, কোথায় চকের বাজার? মুহূর্তে তামাম জগৎসংসার অন্ধকার, দুষমন হুঙ্কার দিয়ে উঠল—আমরা স্লীম্যানের লোক!

কানপুর থেকে শত শত মাইল দূরে গঙ্গার ঘাটে পানসী নিয়ে শিকারে বের হয়েছে 'ভাগিনা', নৌকোর পাটাতন বোঝাই যাত্রী-

দল। আর ক'মাইল যেতে পারলেই রাজমহল। তার দু'ক্রোশ আগে 'ঝিরণী' দেওয়ার মতলব। আনন্দিত 'ভাগিনা'রা জলের কলকল্লোলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরেছে। উজানে যেতে যেতে ভাটিয়ালী গান। হঠাৎ পেছন থেকে পাশে এসে ধাক্কা খেল আর একটি ছোট নৌকো। ওরা কিছু বলার আগেই বন্দুক হাতে পানসীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল একদল মানুষ। চেঁচিয়ে উঠল—আমরা স্লীম্যানের লোক!

স্থলে, জলে, বনপথে, মরুভূমিতে, সর্বত্র সেদিন সগরের সেই দুষমন স্লীম্যান। যেখানেই ঠগী সেখানেই তিনি।

ওরা রণভঙ্গ দিয়েছিল। স্লীম্যান সগরে কায়েম হবার আগেই ওরা পিঠ দেখিয়েছিল। দেখে দেখে ওরা জেনে গিয়েছিল, এ সাহেব নিশ্চয় কোন প্রেরিত পুরুষ। ওঁর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে যাওয়া হঠকারিতা!

সদ্য ধরে আনা দলটিকে সামনে দাঁড় করিয়ে স্লীম্যান হাসলেন।—কই, আমাকে তো ঠেকাতে পারছ না তোমরা?

একজন বলল, হুজুর সে কোম্পানির ইকবাল! কোম্পানির জয়ঢাকের সামনে পড়ে দৈত্যি দানো ভূত প্রেত পর্যন্ত আজ পালিয়ে যাচ্ছে, আমরা ঠগীদের সাধ্য কি তার সামনে দাঁড়াই!

আবার হাসলেন স্লীম্যান—কেন, তোমাদের দেবী? তিনি এখন কোথায়?

দেবী দীন নামে এক ঠগী হাজির ছিল সেখানে। সে বলল, দেবীকে দোষ দেওয়া বৃথা হুজুর! দেশে আসল ঠগ থাকলে তো! আমার তো মনে হয় হুজুর, ওদিকে গঙ্গা এদিকে যমুনা, মাঝে পঞ্চাশ জনও আসল ঠগ আজ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ!

ছোটি এবং ব্রাহ্মণেরও তাই মত। ওরা বলল, গোয়ালিয়র এবং বুন্দেলখণ্ডেও তার বেশী সাচ্চা ঠগ নেই। তবে হ্যাঁ, রাজস্থানের

সুসিয়ারা এখনও আছে বটে!—দিল্লিতেও কিছু কিছু থাকা সম্ভব।

নাসির খাঁ বলল, দক্ষিণেও শেষ পর্যন্ত কিছু না কিছু থেকেই যাবে।

—কেন? কৌতূহলী স্লীম্যান প্রশ্ন তুললেন।

—হুজুর, সেখানে অনেক ঠগ, বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে!

—তোমার কি মনে হয়, সে আমি পারব না?

—বোধ হয় না!

—কেন? তোমরা নিশ্চয় শুনেছ, সগরে বিস্তর লোককে আমি ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়েছি। দেবীর অনুমতি না থাকলে আমি কি তা কখনও পারতাম?

—কক্ষনো না।

—তাহলে একথা তোমরা মেনে নিচ্ছ যে, দেবী সঙ্গে আছেন বলেই আমি এভাবে তোমাদের ধরতে পারছি, ফাঁসীকাঠে দিতে পারছি।

—আলবৎ হুজুর। দেবীর মর্জি না থাকলে আপনার সাধ্যও ছিল না আমাদের এভাবে কব্জি করেন।

—তা হলে তোমরা স্বীকার যাচ্ছ যে, এ পর্যন্ত আমি যা করেছি সব দেবীর হুকুম মত।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর।

—তাহলে একথাও নিশ্চয় তোমরা মানবে যে, দেবী যদি সাহায্য করেন তবে দক্ষিণও আমি সাফা করতে পারব!

ওরা সকলে যেন হঠাৎ এক সঙ্গে বোবা হয়ে গেল। কারও মুখে কোন কথা নেই। এই ন্যায় অনিবার্য ভাবেই যে শেষ সিদ্ধান্তটিতে পৌঁছায় সেটি যেন তাদের জানা নেই! সবাই অপলক চোখে

তাকিয়ে আছে সামনে দণ্ডায়মান মানুষটির দিকে। সাদা ধবধবে রং, একমাথা লাল চুল, চওড়া কপালের পরেই বড় বড় হু'টি চোখ। অসহায় মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। হালকা ঠোঁটের কোণে বিন্দুর মত লেগে আছে এক টুকরো হাসি। বিজয়ীর হাসি। গোটা মুখে সেটুকু ছড়িয়ে দিয়ে স্লীম্যান বললেন, আচ্ছা, এবার তোমরা যেতে পার!

১১

ওরা চলে গেল।

আবার নিজের আসনে ফিরে এলেন স্লীম্যান। সামনে টেবিলময় ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি কাগজ। মানচিত্র, ফাইল, বংশ-তালিকা, রিপোর্ট। মাথার ওপর একটি টানা পাখা ছুলছে। হাওয়ায় কাগজগুলো থেকে থেকে নড়ছে। সাহেবের মাথার চুলগুলো ধীরে ধীরে কাঁপছে। স্লীম্যান অন্যমনস্কভাবে একটা ফাইল টেনে নিলেন। ফিতের গিঁঠটা খুলতে খুলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে জানালার দিকে তাকালেন।

জানালায় সগরের শেষ বর্ষা। গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আবার রোদ উঠেছে। জলে ধোয়া পাতাগুলো চিকচিক করছে। ছুটো কাক পাশাপাশি বসে রোদ পোহাচ্ছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই রোদটা হঠাৎ দপ করে নিভে গেল। চকচকে পাতাগুলো কেমন যেন কালচে হয়ে গেল। বোধহয় আবার মেঘ জমছে। কাক ছুটো মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। স্লীম্যান টেবিলে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। সে চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, তাঁর মনের কোণেও কোথাও মেঘ জমেছে। ক'মিনিট আগেও যে মুখটি খুশীতে টলমল করছিল এখন সেখানে থমথমে অন্ধকার। চওড়া কপালটিতে পর পর কয়টি রেখার আভাস।

চিন্তিত স্লীম্যান আলতো হাতে ফাইলটা খুললেন। এই ফাইলটিই আজ তাঁর কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ওরা বলে গেল বটে, কিন্তু তিনি জানেন, আসল সমস্যা তাঁর কোথায়। দক্ষিণ নয়, উত্তর নয়,—তিনি জানেন ওদের দেবীর আশীর্বাদ যদি তাঁর কখনও সত্যিই দরকার হয় তবে তা লাগবে এই ফাইলটি হাল্কা করতে, যার ওপরে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—'সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া',—মধ্যভারত। মধ্যভারত এক বিস্তীর্ণ এলাকা। কিন্তু স্লীম্যান জানেন শত্রু তাঁর সেখানে মাত্র একজন।—হ্যাঁ, একজন। সেই একটি মানুষের ওপরই নির্ভর করছে তাঁর শেষ ফলাফল। যদি এতদূর এগিয়ে যাওয়ার পরও কখনও তাঁকে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসতে হয় তবে সেই চরম পরাজয় মেনে নিতে হবে তাঁকে দক্ষিণী ঠগীদের জন্যে নয়, কোন দেবীর অসম্মতির জন্যেও নয়, সেই একটি মানুষের জন্যে—সমগ্র মধ্যভারত এখনও যার হাতের মুঠোয়, ঠগীদের মধ্যে ক্ষমতায় এখনও যে সম্রাট!

ছুটো বর্ষা গেল। ছু-ছু'টি বর্ষা। তৃতীয়টিও যাওয়ার পথে! আর ক'দিন পরেই বাদল চুকে যাবে। হয়ত শত্রু এখন নতুন করে অভিযানের জন্য তৈরী হচ্ছে। বর্ষা বিদায় নেওয়া মাত্র পথে নামবে। অসহায় পথিকের শবে আবার মধ্যভারতের মাটি উর্বর হবে। হারিয়ে-যাওয়া মানুষের শোকে শীতের হাওয়া কনকন করবে। অসম্ভব! অসম্ভব! চেয়ারে নিজের পিঠটাকে চেপে ধরলেন স্লীম্যান,—এভাবে খুনের অধিকার দিয়ে ওকে আর একটি মাসও ছেড়ে রাখা চলে না, আমি বেঁচে থাকতে তা হয় না, তা অসম্ভব!

—বড়াসাহেব! দরজায় কার যেন গলার আওয়াজ। ফাইল থেকে মুখ তুলে স্লীম্যান সেদিকে তাকালেন। হাতে একগাদা কাগজ নিয়ে সেলামের ভঙ্গীতে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সাহেবের খাস-বেয়ারা। ধাঁ করে মনে পড়ল কোর্টে যাওয়ার সময় হয়েছে। আসামীদের শেষ

রায় শোনাতে হবে। ত্রস্ত হাতে হাতের ফাইলটি বন্ধ করে স্লীম্যান তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। দেরাজটা টেনে ফাইলটা সাবধানে সেখানে রেখে ডালাটা আবার ভেতরে ঠেলে দিয়ে তিনি বাইরের দিকে পা বাড়ালেন।

কোর্টে সেই এক দৃশ্য, এক কর্তব্য।

বিচারের পালা আগেই শেষ হয়ে গেছে। এবার শুধু আসামীদের শেষ আদেশটি শোনাতে হবে। ঘরের এক কোণে ম্যাজিস্ট্রেটের আসন। তার তিনদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র সান্ত্রী। সামনে অর্ধবৃত্তাকারে পাতা বেঞ্চিগুলোতে চুপচাপ বসে আছে একদল ঠগী, তারা চরমদণ্ড নিতে এসেছে।

স্লীম্যান নিজের আসনে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদালতের কাজ সুরু হয়ে গেল। পরোয়ানাগুলো আসামীদের হাতে হাতে বিলি করে সেরেস্তাদার নিজের টেবিলে ফিরে এলেন। তারপর দীর্ঘ ফর্দটা হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নামগুলো পড়ে গেলেন। ওরা ফাঁকে ফাঁকে বলে গেল—হাজির! হাজির!

এবার বাকীটুকু স্লীম্যানের কর্তব্য। এ আদালতে তিনিই ম্যাজিস্ট্রেট। অপরাধের প্রথম কথাটি যেমন তিনিই শুনিয়েছিলেন তেমনি শেষ দণ্ডের কথাটিও তাঁকেই শোনাতে হবে। রুমালে মুখ মুছে স্লীম্যান উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পরিচ্ছন্ন হিন্দুস্তানীতে ধীরে ধীরে বললেন, তোমরা নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলে। আদালত তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন। কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিল তাই তোমাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। কাল সকালে তোমাদের ফাঁসী হবে। তোমাদের যদি কারও কোন বিশেষ প্রার্থনা থেকে থাকে তবে অনায়াসে তোমরা আমাকে তা জানাতে পার।

সাধারণত ওরা কেউ কিছু ভিক্ষে চাইত না। চাইলেও বড়জোর

কেউ বলত, আমার একমাত্র আরজি হুজুর, মরার পর আমাকে যেন পোড়ান হয়! অথবা, আমাকে যেন কবর দেওয়া হয়। একবার শুধু একজনকে ফিসফিস করে বলতে শোনা গিয়েছিল—এ জন্মে তো বেঁচে গেলেন হুজুর! কিন্তু বেহেস্তেই হোক আর দোজকেই হোক, ঠগীর সঙ্গে আপনার আবার একদিন মোলাকাত হবে, সেদিন কে কাকে ফাঁসী দেয় দেখা যাবে! অনুচ্চ রামসীতে বলা সে বাক্যটি স্লীম্যানের কান এড়াতে পারেনি। তিনি অবাক হয়ে তরুণটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে প্রতিশোধস্পৃহা, কিন্তু তিলমাত্র মৃত্যুভয় নেই!

কোন মুখেই সে বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না!—লিখেছেন ফেণী পার্কাস। সে বছর (১৮৩০) কিছুদিন তিনি স্লীম্যানদের অতিথি হয়েছিলেন। স্লীম্যানের বিচার-সভা এবং ঠগীদের দণ্ড গ্রহণ দুই-ই তিনি দেখেছেন।—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য,—ফেণী লিখছেন,—বিশেষত ওদের অন্তিম মুহূর্তটি। না দেখলে তা বিশ্বাস হত না। একটি তরুণ গলায় ফাঁস পরিয়ে আর সময় নষ্ট করতে রাজী নয়। সে নিজেই তক্তাটা ঠেলে দিয়ে সামনে লাফিয়ে পড়ল। যেন কোন সাঁতারু স্বেচ্ছায় উঁচু থেকে জলে ঝাঁপ দিল! ফেণী পরে শুনেছিলেন—শুধু মৃত্যুক্ষণে নয়, জীবনেও সমান দুঃসাহসী ছিল এই ছেলেটি। ডিসেম্বরে অমুরপাতিনে ছ'জন পথিককে খুন করে ক'দিনের মধ্যেই আবার ভূপালের বিলসায় 'ঝিরণী' দিতে শোনা গিয়েছিল তাকে। অমুরপাতিন জব্বলপুর থেকে একশ' মাইল পূবে, বিলসা জব্বলপুর থেকে দু'শ মাইল পশ্চিমে! এ ছেলে কাঁদবে কেন?

শুধু এই একটি তরুণই নয়, সগরের ফাঁসীমঞ্চের দিকে প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছে অজস্র মানুষ; তাদের কারও চোখে জল নেই। ডাঃ হেনরী স্প্রাই স্লীম্যানের নিকট-আত্মীয়। সগরের ঠগী-কারাগারে তিনি প্রধান চিকিৎসক। জেলখানার ডাক্তার হিসেবে তাঁকে প্রতিদিন

এই দৃশ্য দেখতে হয়। ফেণীর মত তাঁরও সেই এক কথা,—সে দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না!

পরের দিন ভোরে ফাঁসী হবে। কিন্তু কারও চোখে মুখে লেশমাত্র মৃত্যুভয় নেই। কোন কক্ষে কান্না নেই, অনুশোচনা নেই। চিরকালের মতই নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত, আনন্দিত। খুনী জীবনে ওদের যেমন কোন দুঃখ ছিল না, মর্ত্যে জীবনের শেষ রাত্রিটিতেও তাদের কারও দুঃখ নেই। কেননা, ওরা ভবানীর সন্তান। ওরা এই মৃত্যুকে মনে মনে ভবানীর দেয় বলেই গ্রহণ করেছে। ওরা বিশ্বাস করে, ভবানী তাঁর সন্তানদের কোলে তুলে নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে বেহেস্তের দুয়ারে বসে আছেন। সারারাত সেই আনন্দে ওরা গান গাইছে। ভবানীর জয়গান!

ভোরে কয়েদখানার দরজায় এসে দাঁড়ায় সারি সারি গাড়ি। ছ্যাকড়া গাড়ি। গান গাইতে গাইতে ঠেলাঠেলি করে ওরা গাড়িতে ওঠে। গলায় তাদের ফুলের মালা। মুখে বিন্ধ্যাচলের জয়গান। খোয়া-ওঠা পথে দুলতে দুলতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে গাড়ি। প্রতিটি গাড়ির আগে পিছে সশস্ত্র সিপাই-সান্ত্রী। ওরা গাড়ির তালে তালে গান গাইছে।

শহরের উত্তরে শহরতলীর এক কোণে বধ্যভূমি। জেলখানা থেকে প্রায় দেড়মাইল পথ। পথের মোড়ে মোড়ে অগণিত দর্শক। তারা কেউ হাসছে, কেউ ব্যঙ্গ করছে, কেউ দুঃখ করছে। কিন্তু ওদের কারও সেদিকে নজর নেই। আনন্দিত যাত্রীদল গান গাইতে গাইতে ফাঁসীমঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছে। কেউ কেউ গলা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে জায়গাটা আর কত দূরে। সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে ঘোড়ার পিঠে চলেছেন ডাক্তার। তাঁকে এদের শেষ নিঃশ্বাসের সাক্ষী থাকতে হবে। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ওরা চেঁচিয়ে উঠছে—রুকসৎ ডাক্তার সাহেব!—সালাম ডাক্তার সাহেব!—না

জেনে কোন অপরাধ করে থাকলে আপন গুণে মাপ কিজিয়ে সাহেব!

ফাঁসীকাঠের সামনে দাঁড়াবার পরও সেই আনন্দমুখর জীবন। দড়িটা ভার সইতে পারবে কিনা কেউ টেনে টেনে তাই পরখ করছে। কেউ-বা দর্শকদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে, কেউ ফাঁসীমঞ্চে দাঁড়িয়েই বেয়াড়া দর্শকের সঙ্গে রসিকতা করছে, কেউ-বা আপন হাতে গলায় ফাঁস তুলে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে গিঁঠটা কোথায় পড়ল তাই দেখছে। তারপর বিন্ধ্যাচল কি জয়! ভবানী কি জয়!—বলতে বলতে মৃত্যুলোকে লাফিয়ে পড়ছে! কারও কোন খেদ নেই। ফাঁসীমঞ্চে একমাত্র লক্ষ্য তাদের, সরকারী জল্লাদ হয়েছে বলেই কোন অন্ত্যজ যেন দড়ি পরানোর নাম করে তাদের স্পর্শ না করতে পারে। তার চেয়ে অনেক ভাল এই নিজের দড়ি নিজে পরে ঝুলে পড়া!

এ খবরগুলো স্লীম্যান জানতেন। তিনি জানতেন, ঠগী রণভঙ্গ দিয়েছে। তারা জেনে গেছে হিন্দুস্তানে আর তাদের ঠাঁই নেই। ভবানী ঠগী-জীবনে চিরকালের মত ছেদ টেনে দিয়েছেন। নয়ত কোন কালে কোন মানুষ যা পারেনি, সামান্য ফিরিঙ্গী কেন তা পারবে।—কেন দলের লোকেরা রাজসাক্ষী হবে।—কেনই বা তারা পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত বিদ্যা এমন ভাবে অন্যের হাতে তুলে দেবে। ওরা তাই হাল ছেড়ে দিয়েছিল। কারও কোন যাচ্ঞা নেই, কোন প্রার্থনা নেই!

উত্তরের অপেক্ষায় স্লীম্যান আরও ক'মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু কোর্ট নীরব। কারও মুখে কোন সাড়া নেই। ম্যাজিস্ট্রেট হুকুমনামায় সই করে নিঃশব্দে কোর্টঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। শুধু পুরানো সহকর্মীরাই লক্ষ্য করলেন, সাহেবের আদালত-ত্যাগের ভঙ্গীটা

আজ স্বাভাবিক নয়, একটু অন্য রকম। অন্যদিন তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলেন। কোন্ আসামীর জন্যে কি বিশেষ ব্যবস্থা দরকার, তার নির্দেশ দেন। কখনও কখনও ওদেরও কাছে ডেকে ছেলেমেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করেন। কোন্ ছেলেটা কি হলে বাবার মন সবচেয়ে খুশী হবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তা বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আজ যেন তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। চাপরাশী-খিদমদগার থেকে স্থরু করে সেরেস্তাদার-ইনস্পেক্টার সবাই অবাক হয়ে দেখলেন, সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে সোজা তাঁর বাংলোর দিকে পা বাড়ালেন।—তবে কি মেমসাহেবের কোন অস্থখ-বিস্থখ?

ওরা জানেন না, স্লীম্যান একই দিনে এই দ্বিতীয়বার পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ঘরে ফিরলেন। সকালে একবার তাঁকে ব্যঙ্গ করে গেছে রাজসাক্ষীরা। ওরা বলে গেছে—কাজ কঠিন হবে আপনার দক্ষিণে! অথচ তিনি জানেন আসল শত্রু তাঁর দক্ষিণে নয়, উত্তরেও নয়,—মধ্যে, মধ্যভারতে। কিন্তু সে কথাটা ওদের কাছে প্রকাশ করতে পারেননি তিনি। কেননা, এবার নিয়ে তিন বছর হবে! এতদিন ধরে চেষ্টা করছেন, কিন্তু তবুও শত্রুকে জব্দ করতে পারেননি তিনি।—ঠগীদের কাছে সে পরাজয়ের কাহিনী তিনি কি করে বলবেন? এ বেলা দ্বিতীয় পরাজয় ঘটে গেছে তাঁর কোর্ট ঘরে। কাল ভোরে মরতে চলেছে মানুষগুলো, অথচ তাদের কোন প্রার্থনা নেই। ওদের সেই নীরবতা, স্লীম্যানের মনে হচ্ছে সে যেন উপহাস। ওদের কোন ভিক্ষে নেই, কারণ ওরা জানে—তাদের যিনি মৃত্যুলোকে পাঠাচ্ছেন তিনি এই সাহেব নয়,—বিন্ধ্যাচলের জননী! সত্যিই তো তাই! তা না হলে যে অবিশ্বাসী এখনও ফেরারী হয়ে আছে, তাকে তিনি ধরতে পারছেন না কেন? কেন দু-দু'বার হাত ফস্কে চলে গেল সে। তবে কি স্লীম্যান একমাত্র তাদেরই ফাঁসীকাঠে দিতে পারে যারা

ভবানীর মন বুঝে নিজেরা ধরা দেয়?—অসম্ভব! এ পরাজয় উইলিয়াম হেনরী স্লীম্যান কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না!

ঘরে ঢুকেই আবার গিয়ে নিজের চেয়ারে বসলেন স্লীম্যান। আবার সেই টেবিল, সেই ফাইল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। টানা পাখার এখন বিশ্রাম চলছে। টেবিলের এককোণে বাতিদানে একসঙ্গে তিনটি মোমবাতি জ্বলছে। স্লীম্যান তন্ময় হয়ে ফাইলের পাতা উল্টে চলেছেন। সেই কোন্ সকালে প্রাতঃরাশ সেরে অফিস ঘরে ঢুকেছিলেন, তারপর সারাদিনে আর খাওয়া হয়নি। ত্নপুরের খাবার যথারীতি পাশের ঘরে টেবিলে ঢাকা পড়ে আছে। অধিকাংশ দিনই তাই থাকে। সকালের পর খেতে খেতে তাঁর সেই সন্ধ্যা। এমেলি নিজের হাতে টেবিল সাজিয়ে বসে থাকেন। 'ঠগী' সোজা সেখানে গিয়ে বসেন। খেতে খেতে সারাদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা পাড়েন। কখনও কখনও তাঁর সে আলোচনায় খানসামা-বাবুর্চিরাও যোগ দেয়। 'ঠগী'র ঘরে নোকরী করতে করতে তারাও এখন সেসব কথায় রপ্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া স্লীম্যান ওদের পরামর্শও মনোযোগ দিয়ে শোনেন। হাজার হোক, ওরা এদেশের লোক।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেল, কিন্তু সাহেবের তবুও ঘরে ফেরার নাম নেই। উৎকণ্ঠিত এমেলি প্রথমে জমাদারকে পাঠিয়ে খোঁজ নিলেন। তারপর আয়াকে নিয়ে নিঃশব্দে অফিস ঘরে এসে চেয়ারের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। স্লীম্যান তখনও ত্রস্ত হাতে কি যেন লিখে চলেছেন। এমেলির মুখের ছায়াটা কাগজে এসে পড়ল। তিনি কলম থামিয়ে সেদিকে না তাকিয়েই কাগজটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। কৌতূহলী এমেলি ধীরে ধীরে পড়ে গেলেন ঃ

রায় সিং সম্পন্ন জায়গীরদার। জাতে তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁর বাড়ীতে একজন মহিলা ছিলেন। তিনি জায়গীরদারের জ্ঞাতি এবং

নিকট-আত্মীয়। সন্তানসম্ভবা বলেই তিনি তখন রায় সিংয়ের ওখানে আছেন। কারণ, স্বামী তাঁর বিদেশে, এ সময়ে মানুষ নিকট-জনদের কাছেই থাকে। কিন্তু মেয়েটির ভাগ্য ভাল নয়। কেননা, জায়গীরদার রায় সিং তখন সিন্ধিয়ার কোপদৃষ্টিতে আছেন। প্রায় আঠার হাজার টাকা খাজনা অনাদায়ী পড়ে আছে তাঁর কাছে। রায় সিং কিছুতেই তা শোধ করবেন না। বাধ্য হয়েই সিন্ধিয়াকে অন্য পথ ধরতে হল। খবর এল, সিন্ধিয়া তাঁর বিদ্রোহী জায়গীরদারকে সাজা দেওয়ার জন্যে ফৌজ পাঠাচ্ছেন। সে ফৌজের অধিনায়কত্ব করছে ফরাসী অভিযাত্রী পেরঁ। খবর পেয়ে রায় সিংও প্রস্তুত হলেন। তাঁর বাড়ীকে তিনি কেল্লা করে তুললেন।

দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হল। যুদ্ধে রায় সিং হেরে গেলেন। পেরঁ তাঁর ঘরবাড়ী সব তছনছ করে দিল। বাড়ীর মেয়েপুরুষেরা যে যেদিকে পারলেন পালিয়ে গেলেন। কিন্তু সেই মেয়েটি পালাতে গিয়ে আটকে পড়লেন। আতঙ্কে তিনি বাড়ী থেকে অদূরে পথের ধারে এক শিশুর জন্ম দিলেন। বাইবেলের রীতিতে তাঁর সেই পুত্রের নাম হল—ফিরিঙ্গীয়া। কেননা, ফিরিঙ্গীরা যেদিন ওঁদের ঘর জ্বালিয়ে দেয় সেদিন তার জন্ম।

—সুতরাং, এমেলি নীরবে পড়ে গেলেন—আমাদের সব চেয়ে প্রবল শত্রু যে, সেই ফিরিঙ্গীয়া বড়ঘরের সন্তান। সে সুদর্শন, বলবান, বুদ্ধিমান এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। জীবিকার জন্যে তার ঠগী হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তবুও আজ সে ঠগী। মধ্যভারতে সবচেয়ে নিষ্ঠুর, সবচেয়ে বেপরোয়া ঠগী। তাকে যে পর্যন্ত ধরে এনে ফাঁসীকাষ্ঠে না ঝুলাতে পারছি আমরা, ততদিন মধ্যভারতকে এ পাপ থেকে মুক্ত করার কোন পথ নেই। আমার মনে হয় গত বছর একবার আমরা তাকে প্রায় নাগালের মধ্যে পেয়েছিলাম। কিন্তু তবুও তাকে ধরতে পারিনি। এবার যেন আর সেই ভুল না হয়।

এমেলি নিঃশব্দে কাগজটা স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, এবার অবশ্যই আমি তোমাকে সাবধান করব। তোমার নিজের বিবরণ পড়েই আমি তা করতে বাধ্য হচ্ছি।—হেনরী, মাই লাভ, বি কেয়ারফুল!

স্লীম্যান হাসলেন। তারপর বেয়ারাকে ডেকে কাগজটা তার হাতে দিয়ে বললেন, কেরানীকে বলো কাল সকালেই এর কপি যেন প্রত্যেক ইনস্পেক্টারের হাতে পৌঁছায়। তারপর এমেলির হাত ধরে তিনি নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। রাত তখন আটটা। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। বাংলোর বাগানে টানা সুরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে।

সগর থেকে মাত্র কয় ক্রোশ দূরে একটা কুটিরের দাওয়ায় বসে এই অন্ধকারের দিকেই তাকিয়ে ছিল ফিরিঙ্গীয়া। টানা সুরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ক' সপ্তাহের মধ্যেই আকাশ নিশ্চয়ই ফর্সা হয়ে যাবে। তাকে আবার পথে বের হতে হবে। এবার সে আরও খুন করবে। খুনে খুনে গোটা মধ্যভারত সে কবরখানায় পরিণত করবে। একবার পরখ করে দেখবে, সগরের ফিরিঙ্গী বেশী বল ধরে, না এই ব্রাহ্মণ ফিরিঙ্গীয়া!

স্লীম্যানের কথা ভাবলেই কেন জানি ফিরিঙ্গীয়ার পেশীগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে, মনে হয় এক্ষুনি সে সগরের দিকে ছোটে। সেখানে গিয়ে সোজা সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে তার বলতে ইচ্ছে করে—কোন্ অধিকারে তুমি বিদেশী আমাদের পেশা কেড়ে নিচ্ছ? কেন তুমি ঠগীদের এভাবে ফাঁসীকাঠে ঝোলাচ্ছ? ওদের কি কেউ নেই? না থাকে, আমি আছি! বাপকা বেটা হও তবে এগিয়ে এস, আমার সঙ্গে পাঞ্জা কষ দেখি! শুনেছি সাহেব, তুমি ফৌজের লোক ছিলে! একদিন আমিও তা ছিলাম। অক্টরলনি সাহেবকে জিজ্ঞেস করো,

জানতে পারবে। পেশোয়া বাজীরাওকে জিজ্ঞেস করো, জানতে পারবে। কে না চিনত সেদিনের ফিরিঙ্গীয়াকে! একদিন তুমিও চিনবে। ওঁরা ফৌজী ফিরিঙ্গীয়াকে চিনতেন, তুমি চিনবে ঠগী ফিরিঙ্গীয়াকে; সেই ফিরিঙ্গীয়া—যে আজ আইন জানে না, আইন মানে না, খুন ছাড়া যে আজ আর কিছু ভাবতে পারে না!

দাওয়া থেকে নেমে পথে বের হল ফিরিঙ্গীয়া। গাঁ-টা আজই একবার ঘুরে আসা দরকার। এবার আর বর্ষার জন্যে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। এবার তার অনেক দায়িত্ব, অনেক কাজ। এবারও যদি সগরের সাহেবকে সমুচিত শিক্ষা না দিতে পারে সে, তবে হিন্দুস্তানে আর ঠগী থাকবে না, সব ঠগ উজাড় হয়ে যাবে! প্রতিদিন নতুন নতুন দল ধরা পড়ছে, প্রতিদিন অগণিত ঠগী ফাঁসীকাঠে প্রাণ দিচ্ছে।—অসম্ভব! ফিরিঙ্গীয়া কিছুতেই তা চলতে দিতে পারে না। এবার সে খুনের পর খুন চালিয়ে যাবে, সাহেবকে জানিয়ে দেবে সব ঠগ এখনও মরেনি, কেউ কেউ এখনও বেঁচে আছে,—ফিরিঙ্গীয়া এখনও ফিরিঙ্গীয়াই আছে!

বর্ষার পর শরৎ এল, শরতের পর শীত। নভেম্বর উঁকি দিয়েছে। কিন্তু স্লীম্যান এখনও তাঁর আসল শত্রুর কোন হদিস করে উঠতে পারছেন না। ফিরিঙ্গীয়া তাঁর নিজের দায়িত্ব। তার ভার তিনি অন্য কারও হাতে তুলে দিতে ভরসা পাচ্ছেন না। তা ছাড়া, ফিরিঙ্গীয়া তাঁর জয়-পরাজয়ের শেষ কথা। সে কথাটা তিনি নিজেই শুনতে চান।

সগর থেকে শুধু সে কারণেই তিনি তাঁর দপ্তর আপাতত জব্বলপুরে উঠিয়ে এনেছেন। কেননা, তাঁর ধারণা ফিরিঙ্গীয়া যে জগতের প্রভু জব্বলপুর তার কেন্দ্র। অভিযানের সূচনায় সন্ধান সুরু করেছিলেন তিনি দক্ষিণের শেষ সীমানা থেকে। কারণ, নামটি

প্রথম যে ঠগীর মুখে শোনা গিয়েছিল সে ছিল দক্ষিণের লোক। এখন বুঝতে পারছেন তাঁর হিসেবে ভুল হয়ে গেছে। দক্ষিণ ফিরিঙ্গীয়ার ঠিকানা নয়, তার খ্যাতির ভুবনে একটি অঞ্চল মাত্র। সেভাবে খুঁজতে গেলে ফিরিঙ্গীয়ার নাম পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। স্লীম্যান তাই এবার অতি সন্তর্পণে তাঁর জাল বুনেছেন। শিকারী বাঘের মত তিনি জব্বলপুরে ওঁৎ পেতে বসে আছেন। এবার তাঁর নির্ভুল হিসেব। শিকারকে কখনও না কখনও সামনে পড়তেই হবে!

বেশী দিন অপেক্ষা করতে হল না। হঠাৎ একদিন ভোরে হাঁপাতে হাঁপাতে সাহেবের সামনে এসে হাজির হল এক চর। —হুজুর, ফিরিঙ্গীয়া এদিকেই আছে। জব্বলপুর থেকে মাত্র তিন ক্রোশ দূরে সে তার ছেলে, বৌ আর মাকে নিয়ে আস্তানা পেতেছে। মতলব কি, এখনও তা বোঝা যাচ্ছে না।

স্লীম্যান তক্ষুনি লোকটির সঙ্গে একজন ঘোড়সওয়ারকে কাছাকাছি থানায় পাঠিয়ে দিলেন। হুকুম গেল, আজ রাতেই হানা দেওয়া চাই। খুব হুঁসিয়ার! পাখী যদি শেষ পর্যন্ত উড়েই যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা যেন কিছুতেই হারিয়ে না যায়। ফিরিঙ্গীয়ার অভাবে আপাতত তার মা এবং স্ত্রীও কম মূল্যবান নয়!

দু'দিন বাদে সিপাইরা ফিরে এল। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্লীম্যান দেখলেন, সঙ্গে ওদের কোন বন্দী নেই। তবে কি শত্রু এবারও আমাকে ফাঁকি দিল?

জমাদার সেলাম করে সামনে এসে দাঁড়াল।—হুজুর, ফিরিঙ্গীয়ার মা আর বৌ এই পাল্কীতে আছে। ঠগী আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে আমরা দেখলাম বৌ অঘোরে ঘুমোচ্ছে, পাশের বালিশ খালি। সেই শূন্য শয্যায় একটা গুলীভরা পিস্তল আর এই বন্দুকটি পড়ে আছে। স্লীম্যান দেখলেন, দু'টি অস্ত্রই বিলিতি,

ইংলিশ মেক। ওদের সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝতে পারলেন, দোষটা তাঁর ভাগ্যের নয়, যাদের পাঠিয়েছিলেন সেই নাজিবদের। তাঁর বাহিনীতে ওরা নতুন। ওদের পাঠান তাঁর পক্ষে বিবেচনার কাজ হয়নি। তবুও তিনি এখন রীতিমত আশান্বিত। কারণ, টুকিটাকি খবর জোড়াতালি দিয়ে ফিরিঙ্গীয়ার যে মূর্তিটি তিনি মনে মনে গড়ে তুলেছেন, তাতে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, প্রবল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এই ঠগী অচিরেই জব্বলপুরের দিকে পা বাড়াবে। কিছুতেই সে তার মা এবং তার স্ত্রীকে এভাবে দুষমনের হাতে লাঞ্ছিত হতে দেবে না। ফিরিঙ্গীয়া এখানে ছুটে এল বলে।

হঠাৎ স্লীম্যানের মনে পড়ল, ফিরিঙ্গীয়ার এক বৈমাত্র ভাই তাঁর হেপাজতে আছে। পরের দিন তার ফাঁসী হবে। পাশে দণ্ডায়মান ইনস্পেক্টারের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ছেলেটাকে একবার এখানে আনতে পারলে মন্দ হতো না! গিয়ে বল, ওর মা আমার এখানে আছে, ইচ্ছে করলে সে তার সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করতে পারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইনস্পেক্টার ওকে নিয়ে ফিরে এলেন। ফিরিঙ্গীয়ার বুড়ো মা কিছু বলার আগেই ছেলেটি তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলল, অনেক ভালবাসা দিয়েছ তুমি। তোমার কোলে-পিঠেই মানুষ হয়েছি। কিন্তু আমি নিতান্ত হতভাগ্য, প্রতিদানে তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারলাম না। আজ বাদে কাল মরতে চলেছি, কিন্তু ঋণের দায় সেই তেমনি রয়ে গেল। বুড়ী হাত ধরে তাকে টেনে মাটি থেকে তুললেন। তারপর ছেলেটির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, বাছা, তোর সব দেনা আজও আমি ভালবাসায় মিটিয়ে দিলাম। জেনানাদের মত এমন কাঁদিস না বাপ, মরছিসই যখন মরদের মত মর!

স্লীম্যান কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি মা আর ছেলের প্রতিটি

কথা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। তিনি ভেবে পাচ্ছেন না, এ কি করে সম্ভব? একই মানুষ কি করে যুগপৎ নৃশংস খুনী এবং এমন কর্তব্যপরায়ণ মমতাময় পুত্র হয়? তাও কি সম্ভব? ফিরিঙ্গীয়ার স্ত্রীকে সামনে বসিয়ে তিনি জেরা স্বরু করলেন।

ফুটফুটে তরুণী মেয়ে, সুন্দর চেহারা। ঘোমটার আড়ালে হু'টি বড় বড় ডাগর চোখ দেখা যাচ্ছে। চোখে মুসলমানী রূপসীদের কায়দায় সুর্মা টানা। গলায়, হাতে সুন্দর গহনা। স্লীম্যান লক্ষ্য করলেন, গহনাগুলো অধিকাংশই সোনার। গলার হারটিতে কয়টি পাথরও রয়েছে।

সাহেব বললেন, তোমার কোন ভয় নেই বহিন। আমি যা জিজ্ঞেস করছি তুমি নির্ভয়ে তার উত্তর দাও। ফিরিঙ্গীয়া ব্রাহ্মণ কি তোমার স্বামী?

মেয়েটি মাথা নাড়ল।

—সে কি করে, তুমি কি তা জান?

মেয়েটি এবারও মাথা নাড়ল। তবে এবার তার বক্তব্য উল্টো। ফিরিঙ্গীয়ার বৌ মাথা নেড়ে বলছে সে তা জানে না।

প্রশ্নটা আবার নতুন করে পাড়লেন স্লীম্যান—তুমি বলতে চাও তোমার স্বামী যে মানুষ খুন করে তাদের ধনে তোমাকে সাজায়, সে কথা তুমি জান না?

মেয়েটি এবারও মাথা নাড়ল। সেই একই অনড় বক্তব্য—না।

স্লীম্যান সত্য এবং মিথ্যার ফারাক বোঝেন। তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, এই 'না' ঠগী-বৌয়ের সাজানো 'না' নয়। মেয়েটি সত্যিই সে খবর রাখে না।

এবার নতুন প্রশ্ন সাহেবের মুখে—আচ্ছা, যদি আমি প্রমাণ করতে পারি তোমার স্বামী একজন খুনী তবে কি তুমি তাকে ছেড়ে দেবে?

এবারও উত্তর হল—না।

—ছাড়বে না? তারপরও সেই স্বামীকে নিয়ে ঘর করবে তুমি?

—হ্যাঁ। ঘাড় নেড়ে জবাব দিল মেয়েটি।

স্লীম্যান বললেন, আচ্ছা এবার তুমি যেতে পার। ইনস্পেক্টারের দিকে ঘুরে তিনি বললেন, জেলে ওদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করো। দেখো, ওদের যেন কোন কষ্ট না হয়। ওর স্ত্রীকে দেখবার পর ফিরিঙ্গীয়া এখন স্লীম্যানের কাছে আরও স্পষ্ট। সে শুধু সুদর্শন এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষই নয়, তার নিশ্চয় একটা প্রকাণ্ড হৃদয়ও আছে। এমন হৃদয় যেখানে পরিমাণহীন হিংস্রতার পাশাপাশি অফুরন্ত ভালবাসাও আছে। নয়ত এমন রূপসী তরুণীর মুখে নিশ্চয় এমন উত্তর পাওয়া যেত না। বিশেষ স্লীম্যান আগেই খবর নিয়ে জেনেছেন, ফিরিঙ্গীয়ার স্ত্রী যে সে কোন গরীবের ঘরের মেয়ে নয়। ফিরিঙ্গীয়ার মতই সেও সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। ওদের পরিবার ঝাঁসী এবং সুমতুরে রীতিমত সুখ্যাত ঘর। সুতরাং শুধু ভাত-কাপড় আর সোনা-দানার লোভে এ মেয়ে কোন খুনীকে ভালবাসতে পারে না! নিশ্চয় সে আর কোথাও বাঁধা আছে। স্লীম্যান জানেন, সে বাঁধন শুধু হিন্দুর স্ত্রী-ধর্ম নয়, তার অনেকখানিই ভালবাসা। এ ভালবাসার টানেই খুনী একদিন ফিরে আসবে খাঁচার আশেপাশে!

ফিরিঙ্গীয়া তাই আসছিল।

পাখী যেমন করে খাঁচার বন্দী সঙ্গিনীর দিকে ছুটে আসে ঠিক সেই ভাবে, উড়ে উড়ে এদিক ওদিক থেমে থেমে। তবে ফিরিঙ্গীয়া টিয়া ময়না নয়, সে দুরন্ত ঈগল। তার পাখায় যেমন বেগ, চোখে তেমনি তীক্ষ্ণ নজর। সে শুধু সাবধানীর মতই সগরের দিকে এগিয়ে আসছে না, দিগ্বিজয়ী বীরের মত প্রতি মাইল পথ জয় করে সগৌরবে এগিয়ে আসছে। যেখানেই তার পা পড়ছে সেখানেই 'ঝিরনী' উঠছে। নিঃশব্দে মানুষ কবরের তলায় হারিয়ে যাচ্ছে।

ফুল-ছড়ানো পথে নয়, প্রকৃত মরদের মত প্রতি পায়ে মৃতদেহ ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে ফিরিঙ্গীয়া তার ভালবাসার মানুষের দিকে এগিয়ে চলেছে। স্লীম্যানকে সে দেখাবে হিন্দুস্তানীরাও তাদের মা-বোন স্ত্রী-পুত্রের ইজ্জত বাঁচাতে জানে! দরকার হয় সে খাঁচা ভাঙবে, গোটা সগর জ্বালিয়ে দেবে!

ফিরিঙ্গীয়া এগিয়ে চলেছে।

বাড়ী ছেড়েছিল সে সেই কবে! সঙ্গে ছিল মাত্র পঁচিশ জন অনুচর। ফিরিঙ্গীয়া তবুও একবারের জন্যেও ভাবেনি যে সাহেবের তুলনায় সে কত কমজোরী। বেপরোয়ার মত মোগলসরাইয়ের পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল সে। সামনে দু'জন মারাঠা পথিক পড়েছিলেন, নিমেষে তাঁরা উধাও হয়ে গেলেন! আরও মাইল তিন এগিয়ে গেল সে। সেখানে গিয়ে নতুন কোন শিকার পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু লাভ হল, দলপতি আরও এগার জন ঠগ হাতে পেয়ে গেল। ওদের নিয়ে সে ইন্দোরের রঘুবরের দিকে পা বাড়াল। সেখানে পাওয়া গেল দু'জন মারাঠা এবং একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীকে। ওঁরা সগর থেকে ইন্দোরে ফিরছিলেন। তাঁরাও যথারীতি কবরে প্রেরিত হলেন। ক'দিন পরেই স্বরূপ সিং এবং তার দলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওর দলে ছিল পনের জন ঠগ, ফিরিঙ্গীয়া তাদেরও সঙ্গে নিল। পরের দিনই ইন্দোর থেকে পাটনের পথে তিনজন পথিক হারিয়ে গেলেন। তার পরের দিন ছ'জন। দু'দিন পরে নর্মদার পাগলানাঘাট পেরিয়েই আরও তিন জন। এবার যারা গেল তারা সিপাই!

খুনের পর খুন করে বেপরোয়ার মত এগিয়ে চলেছে ফিরিঙ্গীয়া। এবার আর তার মনে দয়া নেই, মায়া নেই, ভালবাসা নেই। একদা বাজীরাওয়ের ঘরের মেয়েকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল সে, এবার আর তা হবে না। যাকে পাবে ফিরিঙ্গীয়া তাকেই হত্যা

করবে। নারী হোক পুরুষ হোক, ধনী হোক গরীব হোক, ফিরিঙ্গীয়া এবার কাউকে বাদ দেবে না। সাহেব তার মাথায় আগুন যখন জ্বালিয়েছে তখন সে আগুনের দহন পোয়াতেই হবে! ফিরিঙ্গীয়ার ঘরে আগুন ধরিয়ে মানুষের সাধ্য কি শান্তিতে ঘর করে!

হাতের লোটাটায় মাথায় জল ঢালতে ঢালতে মনে মনে হিসেব করছিল ফিরিঙ্গীয়া—শ' পূর্ণ হয়েছে, মেয়েদের ধরলে একশ' পাঁচজন! —আরও চাই তোমার সাহেব? আচ্ছা, তাও পাবে! মাথায় জল ঢালতে লাগল ফিরিঙ্গীয়া। জলটা ভাল। যেমন পরিষ্কার তেমনি ঠাণ্ডা। ঝরণাটার কি নাম ভুলে গেছে ফিরিঙ্গীয়া। তার শুধু মনে আছে জায়গাটা সগর থেকে খুব দূরে নয়। বিলসা থেকে বড়জোর মাইল দশেক হবে। আর কয়েক মাইল পরেই সগর। ভাবতে ভাবতে ফিরিঙ্গীয়া এবার জলে নেমে পড়ল। দুপুর গড়িয়ে এসেছে, জলের ঢেউয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের ছায়াগুলো দৈত্যের মত নড়ছিল। ফিরিঙ্গীয়া ডুব দিয়ে উঠতেই সেগুলো খেলনার মত ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঠগীদের রাজা ফিরিঙ্গীয়া ব্রাহ্মণ সেদিকে তাকিয়ে ভারি মজা পেল। ইচ্ছে করেই সে আবার আর একটা ডুব দিল, তারপর আর একটা। হঠাৎ নিঃঝুম বনভূমি কাঁপিয়ে কর্কশ গলায় কি যেন একটা চেঁচিয়ে উঠল। হাতের চেটোটা কানের পাশে বাঁকিয়ে ধরে উৎকর্ণ ফিরিঙ্গীয়া ঘাড় কাত করল। পেঁচাটা আবার ডেকে উঠল। ফিরিঙ্গীয়া হাতটা তেমনি কানে রেখেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পেছনে তাকাল।

পেছনে গাছতলায় বসে জটলা করছে তার চল্লিশ অনুচর। সঙ্গে একপাশে আরও কয়জন মানুষ। দেখলে বোঝা যায় তারা এপাশের বড় দলটির সঙ্গী মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। ফিরিঙ্গীয়ার বাসনা, সগরের প্রবেশদ্বারে এদের কবর দিয়ে সে সগরে ঢোকে। সিংহের গুহার সামনে রক্তচিহ্ন রেখে গুহায় উঁকি দেয়।—কিন্তু অসময়ে

এই পেচকধ্বনি কেন?—তবে কি দেবী তার মতলব সব বানচাল করে দিতে চলেছেন?—অসম্ভব। তা হতে পারে না।—ফিরিঙ্গীয়া ব্রাহ্মণের মত এত নরমুণ্ড কেউ তাঁকে দিতে পারেনি।—মা তার সঙ্গে নেমকহারামী করতে পারেন না, তিনি এত নির্দয় হতে পারেন না!

সর্দারের পেছনেই ঘাসে বসে গা রগড়াচ্ছিল তার সহকারী খারহোরা। সে চেঁচিয়ে উঠল—জমাদার, চিড়িয়া! চিড়িয়া!

কান থেকে হাতটা মুখে সরিয়ে নিয়ে এল ফিরিঙ্গীয়া—চুপ! চেঁচামেচি করবে না। মিছিমিছি লোকগুলো ভয় পাবে। আমিও শুনেছি, এ ভয়ের কিছু নয়।

হাতের গামছাটা কোমরে জড়িয়ে সর্দারের আরও কাছে এসে দাঁড়াল খারহোরা।—কিন্তু জমাদার, এ চিড়িয়া সর্বনাশা—

ধমকে উঠল ফিরিঙ্গীয়া—হয়েছে, আমাকে আর শেখাতে হবে না! আমি এর আগেও বার কয় পরখ করে দেখেছি, চিড়িয়া ভবিষ্যতের কথা বলে; যেদিন ডাকে সেদিনের কথা নয়! সুতরাং, তুমি যাও, নির্ভয়ে যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন কর!

তল্পিতল্পা বেঁধে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল দলটা। আগে আগে দলপতি ফিরিঙ্গীয়া, পেছনে তার অনুচরেরা। মাঝখানে সেই পথিকেরা। পাহাড়িয়া পথে ওরা ধীরে ধীরে সগরের দিকে এগিয়ে চলেছে। ধুলো উঠছে, মানুষের কাকলি শোনা যাচ্ছে। নিশ্চিন্ত ফিরিঙ্গীয়া স্লীম্যান সন্দর্শনে চলেছে। সে জানে না, আজ সকাল থেকেই নিরাপদ ব্যবধান রেখে স্লীম্যান তার পিছু পিছু হাঁটছেন। সাহেব স্বয়ং নন, তাঁর অনুচরেরা। তাঁরই পরামর্শ মত একদল পাকা সেপাই পথিকের বেশে ওর পেছনে পেছনে হাঁটছে। তাদের পেছনে আর একদল ঘোড়ার পিঠে আসছে। সাহেব এবার অতিশয় সতর্ক। তিনি আর সময় দিতে রাজী নন।

সন্ধ্যায় একটা গাঁয়ের পাশে এসে থামল ফিরিঙ্গীয়ার দল। গাঁয়ের

নাম—মারী। দলপতির ইঙ্গিতে অনুচরেরা গাছতলায় বিশ্রামের আয়োজন করতে লাগল। ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফিরিঙ্গীয়া গাঁয়ের দিকে চলল। খারহোরাকে বলে গেল, তুমি যখন কথাটা বললেই তখন প্যাটেলের কাছ থেকে একটু খবর নিয়ে আসি! জিজ্ঞেস করলেই বোঝা যাবে, পথে বিপদের কোন সম্ভাবনা আছে কি নেই! চিড়িয়া নিয়ে মিছিমিছি এমন মুখভারী করে বসে থাকার মানে হয় না!

কিছুদূর যেতে না যেতেই একজন গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে দেখা। তাকে থামিয়ে ফিরিঙ্গীয়া কথাবার্তা সুরু করল।—এদিকে দিনকাল কেমন চলেছে, গমের দর কি, খাজনা আদায়ে জবরদস্তি কেমন, ঠগীদের উৎপাতই বা কি ধরনের! নানা কথা—যা সময় পড়েছে, ঠগীতে দেশ ছেয়ে গেছে! ফিরিঙ্গীয়া বলে চলেছে—সগরের সাহেবেরা কি করছে, বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটছে? পথিক যদি নিশ্চিন্ত মনে মাল-জান নিয়ে পথই না চলতে পারল তবে এমন ফিরিঙ্গী রাজত্বে আমাদের দরকার কি?

আলাপ জমে উঠেছে। হঠাৎ অদূরে কলকোলাহল, চিৎকার। লোকটিকে সেখানেই থামিয়ে দিয়ে ফিরিঙ্গীয়া সেদিকে ছুটল। ক'পা গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল তাকে। চোখের সামনে অবিশ্বাস্য দৃশ্য। একদল সিপাই তার দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অসংখ্য লোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে হাতে বন্দুক। শেয়াল যেমন করে মুরগীর ছানা ধরে তেমনি ওরা ঠিক সেভাবেই ঠগীদের ধরছে। ভয়ে দড়ি ছিঁড়ে ঘোড়াটা এদিকে ছুটছে।

আর এক মুহূর্তও ভাবল না ফিরিঙ্গীয়া। গাছতলায় না গিয়ে সে ঘোড়ার পেছনে ছুটতে লাগল। গাঁয়ের সীমানা পার হয়ে প্রায় এক মাইল ছুটে তবে তাকে ধরা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গীয়া লাফিয়ে তার পিঠে চড়ে বসল। তারপর চোখের নিমেষে সামনের অন্ধকারে মিশে গেল।

সগরের বাংলোয় সেই হৃদয়বিদারক খবর পৌঁছল। পরাজিত স্লীম্যান আবার ঘাড় হেঁট করে নিজের টেবিলে গিয়ে বসলেন। দক্ষিণ পরিষ্কার হয়ে এসেছে, কিন্তু মধ্যভারতে এখনও সেই বিষবৃক্ষ সগৌরবে দণ্ডায়মান। ফিরিঙ্গীয়াকে এখনও ধরা গেল না।—ধিক স্লীম্যান, ধিক! এই তোমার ক্ষমতা!

আবার সেই ফাইল, সেই মানচিত্র, সেই দিস্তা দিস্তা জবানবন্দী। দলের চল্লিশজনের মধ্যে আটাশ জনকে ধরে আনতে পেরেছে ওরা। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বলেছে। কিন্তু দলপতি তাদের কোথায় যেতে পারে সে সম্পর্কে সবাই নীরব।—আমরা তা বলতে পারব না

স্লীম্যান সর্বশেষ মানচিত্রটা টেবিলে রাখলেন। তারপর মনে মনে বললেন—এই হচ্ছে বিলসা,—নাঃ, দলহারা দলপতি এখন আর একাকী এখানে ঘুরে বেড়াবে না। পাশে দণ্ডায়মান অফিসারটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তোমরা বরং এখানটায়, এই ঝাঁসীর দিকে এগিয়ে যাও। সেখানে ঠগীদের একটা পুরানো 'বাগ' আছে। আমার ধারণা সেখানে বসে সে নতুন করে দল গড়ার চেষ্টা করবে। হয়ত ইতিমধ্যে তা গড়েও ফেলেছে।—সুতরাং, হাতের পেন্সিলটায় কপালে টোকা দিতে দিতে স্লীম্যান বললেন, সুতরাং তোমরা এক কাজ কর, তোমরা বাঁয়ের এই গ্রামটিতে খোঁজ কর। যদি সেখানে কোন খবর না পাওয়া যায়, তবে এপাশের সারিটায় খোঁজ করবে, প্রত্যেকটি গাঁয়ে হানা দেবে।—আমার ধারণা, পাখী এদিকেই কোন কুঞ্জে আছে!—হুঁ, আর একটা কাজ করবে, ধন সিং আর সোগর এই দু'জন রাজসাক্ষীকে পথে ছেড়ে দিয়ে যাবে। ওরা যেন রানার সঙ্গে নিয়ে চারদিকে হুঁস রেখে চলে। যখন যে খবরই পাও আমাকে জানাবে।

যথারীতি এবারও নির্ভুল অনুমান। সত্যি সত্যিই ঝাঁসীর সেই

গাঁয়ের দিকে চলেছে নিঃসঙ্গ ফিরিঙ্গীয়া। সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকেই সে আসছিল। পথে বারোজন অনুচর আবার তার সঙ্গ নিয়েছিল। কিন্তু ফিরিঙ্গীয়া তাতে রাজী হয়নি। সে জেনে গেছে বারোজন মানুষ নিয়ে এখন আর সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করা চলে না। গত সন্ধ্যার সেই ঘটনার পর তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সে এখন জালে পড়েছে। যেখান থেকে স্লীম্যান তার লোকগুলোকে ধরে নিয়ে গেলেন সেখানে কোনদিন ফিরিঙ্গী একাজ করতে পারবে স্বপ্নেও সে তা ভাবেনি। কে জানে এই লোকগুলো, তার এই অনুচরগুলোই, হয়ত কখন সিপাই হয়ে তাকে ঘিরে ধরবে। তার আর কাউকে বিশ্বাস নেই! তাই বলে কি ফিরিঙ্গীয়া ব্রাহ্মণ আত্মসমর্পণ করবে? না, তাও হয় না। ফিরিঙ্গীয়া আবার দল গড়বে। এমন দল যা বান্দা নয়—মরদের দল, শাবলের মত মজবুত, বাঘের মত হিংস্র। সে দল নিয়ে সে ঝাঁসীর পথে পথে আর গরীব খুন করবে না, সগরের পাকা পথে সাহেবদের কবর দেবে। সব সাহেবকে নয়, স্লীম্যান সাহেবকে, তাঁর অনুচর ফিরিঙ্গীগুলোকে। ফিরিঙ্গীয়ার সে কাহিনী চিরকালের মত হিন্দুস্তানের মানুষের মুখে মুখে ঘুরবে।

বিবাগীর মত পুরানো দল দু'হাতে চারপাশে ছিটিয়ে দিয়ে ফিরিঙ্গীয়া নতুন দলের সন্ধানে ঝাঁসীর দিকে পা বাড়াল। বড় রাস্তা ছেড়ে সে সেই গাঁটির দিকে এগিয়ে চলল—স্লীম্যান যার নামটির নীচে পেন্সিলে একটা ছোট্ট দাগ কেটেছিলেন।

গ্রামটির নাম—কিসরাই। ছোট্ট গ্রাম। দু'চারজন বাদ দিলে অধিকাংশই গরীবের ঘর। দেখলেই বোঝা যায় কিসরাই খুব বর্ধিষ্ণু গ্রাম নয়। তার একটা কারণও আছে অবশ্য। কিসরাইয়ের পরেই পর পর কাছাকাছি আরও অনেকগুলো গ্রাম। একসঙ্গে এতগুলো গ্রাম যেখানে, সেখানে কোন গাঁয়ের পক্ষেই চেহারায় বা চরিত্রে খুব

লোভনীয় হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। ফিরিঙ্গীয়া তবুও কিসরাইকে মনে মনে তার ঠিকানা করে নিল। কেননা, এই জঙ্গলেই লুকোচুরি খেলতে বেশী সুবিধে।

ইনস্পেক্টার এবং তাঁর সঙ্গী চারজন দ্রুতপায়ে গ্রামে এসে ঢুকলেন। পেছনে পেছনে ছুটে এল 'ঠগী'র রানার—এখানে নয়, পাখী আকাশের রং থেকে আরও নিরাপদ শাখা খুঁজছে। সে ঐ পাঁচটি গ্রামের কোন একটিতে আছে। সাহেব আপনাকে বিশেষ করে মনে রাখতে বলেছেন, ফিরিঙ্গীয়া ব্রাহ্মণ কোথাও তেরাত্তির বাস করে না! কাগজটিতেও তাই লিখে পাঠিয়েছেন স্লীম্যান—রিমেম্বার, দিস ঠগ্ নেভার স্পেণ্ট মোর ছ্যান টু সাকসেসিভ নাইটস ইন এনি ভিলেজ!

ইনস্পেক্টার কাগজটা সাবধানে পকেটে ভাঁজ করে রেখে নিঃশব্দে পরের গাঁয়ের দিকে যাত্রা করলেন। গাঁয়ে ঢোকার আগেই রাজসাক্ষী ধন সিং সেলাম করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।—সাহেবের হুকুম, আমাকে সঙ্গে থাকতে হবে! নয়ত, আপনি যদি ঠিক চিনে উঠতে না পারেন!

ভোর রাত্রে ওরা গাঁয়ের মোড়লের বাড়ী হানা দিলেন। ফিরিঙ্গীয়া সেখানে নেই। তবুও মোড়লকে ছাড়া গেল না। স্লীম্যানের আদেশ। যে গাঁয়েই হানা দেবে সেখানেই প্রথমে মোড়লকে ধরবে।

ছু'জন সিপাইয়ের হেফাজতে বন্দীকে রেখে ইনস্পেক্টার পরের গ্রামের দিকে এগিয়ে চললেন। পরের দিন রাত্রে দ্বিতীয় মোড়ল ধরা পড়ল। আরও ছু'জন সিপাই সেখানে আটক রয়ে গেল। ইনস্পেক্টার ভেবে পাচ্ছেন না একজন মাত্র রাজসাক্ষী নিয়ে এমন খুনীকে তিনি কি করে কব্জি করবেন! তবুও তিনি নির্ভয়ে তৃতীয় গাঁয়ের দিকে পা বাড়ালেন। কেননা, এক সঙ্গে অনেকদিন কাজ করছেন, 'ঠগী'কে তিনি চেনেন। সময়ে তাঁর সাহায্য নিশ্চয় এসে হাজির হবে।

তৃতীয় গ্রামের মুখে দ্বিতীয় রাজসাক্ষী সোগর এসে মিলিত হল তাঁর সঙ্গে। কানে কানে বলল, হুজুর, নিশানা ভুল হচ্ছে। আমি নিজে দেখে এলাম যে গ্রামটি দু'দিন আগে আপনি ছেড়ে এসেছেন ফিরিঙ্গীয়া সেখানেই আছে, সেই কিসরাইতে। রাত ভোর হওয়ার আগেই আমাদের সেখানে পৌঁছান দরকার!

ইনস্পেক্টার তৎক্ষণাৎ সেদিকে ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন।

বাড়ীটার সামনে এসে ধন সিং আর সোগর ইনস্পেক্টারের কানে কানে কি যেন বলল। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ঘরটির দিকে। ওদের দরজা খোলার শব্দে ফিরিঙ্গীয়ার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। আজকাল ঘুম আরও হাল্কা হয়ে গেছে তার। আজ কতকাল মাকে দেখে না, বৌকে দেখে না, ছেলেটা নিশ্চয় আরও বড় হয়ে উঠেছে এতদিনে। রাত হলেই ফিরিঙ্গীয়ার বুকটা যেন কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। এভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর কোন অর্থ হয় না। পিছু পিছু সাহেবের চোখ তাড়িয়ে ফিরছে। নতুন দল গড়বে, তার সুযোগ কোথায়? তার চেয়ে সেই বোধহয় ভাল—ধরা পড়া।—বৌটাকে, ছেলেটাকে দেখতে দেবে নিশ্চয়!

ধন সিং আর সোগর একসঙ্গে ওর ওপর লাফিয়ে পড়ল। ফিরিঙ্গীয়া ওদের দরজা খুলতে দেখেছে, থাপ ধরতেও দেখেছে। কিন্তু তবুও সে বালিশ থেকে মাথা তোলেনি, ঠগীদের রাজার আর লড়াইয়ের মেজাজ নেই। শুয়ে শুয়েই সে ধরা দিল। শুধু একবার পুরানো সঙ্গী ধন সিংয়ের পিঠে দুটো থাপ্পর দিয়ে বলেছিল —সাবাস ঠগ! এই তো চাই!

ঘোড়ার পিঠে সে বিজয়বার্তা সগরের দিকে ছুটল।

কিন্তু আশ্চর্য, পুরো ঘটনার বিবরণ শুনে স্লীম্যান যেন কেমন মিইয়ে গেলেন। তাঁকে শুধু একটি কথা বলতে

শোনা গেল—হুঁ! এবার আর তাহলে পালাবার চেষ্টা করেনি সে?

এই প্রশ্নের পর অতঃপর সাহেবের মনের কথা গোপন থাকার কথা নয়। ইনস্পেক্টার ঘাড় হেঁট করলেন। ফিরিঙ্গীয়ার বিনা প্রতিরোধে এই আত্মসমর্পণের অপরাধ যেন তাঁরই। স্লীম্যান বললেন, সেই আশ্চর্য মানুষটিকে আমি একবার দেখতে চাই। আজই নয়—দিন কয় পরে!

নির্দিষ্ট দিনে বন্দীকে স্লীম্যান-সমীপে হাজির করা হল।

সময়টা আগেই জানা ছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সাহেব একটা ফাইল খুলে বসলেন। তিনি যে মনে মনে ওর জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন সে খবরটা গোপন করা দরকার। ঘরে একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। স্লীম্যান জানেন ওরা কাকে নিয়ে এসেছে। সামনে নিশ্চয় দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ধ্যানের খুনী ফিরিঙ্গীয়া—ইয়া উঁচু মস্ত চেহারা, সবল হাতের শেষে নিপুণ ক'টি আঙ্গুল। বড় বড় দু'টি চোখ মেলে মানুষটি নিশ্চয় তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। কিন্তু সাহেব তবুও একবার মুখ তুলে তাকালেন না তার দিকে। দেওয়াল-ঘড়িটা টিক টিক করছে। মৌন ফিরিঙ্গীয়া পাথরের মূর্তির মত সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার দু'পাশে ছ' জন সশস্ত্র প্রহরী। তারাও নির্বাক। মনে মনে দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়ে ফাইলের পৃষ্ঠায় যেন আরও মনোযোগী হয়ে উঠেছেন স্লীম্যান, সামনে তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সেরা শিকার ফিরিঙ্গীয়া। সেই ফিরিঙ্গীয়া ব্রাহ্মণ—যাকে হাতে না পেলে তাঁর সব শ্রম, সব উদ্যোগ বিফল হয়ে যায়; যে তাঁর কর্মজীবনে শ্রেষ্ঠতম বরমাল্য!

বাধ্য হয়ে আরও দু'পা এগিয়ে গেল জমাদার, হুজুর, ফিরিঙ্গীয়া!

—ফিরিঙ্গীয়া? যেন জীবনে তিনি নামটা এই প্রথম শুনলেন।

ফাইল থেকে ধীরে ধীরে মুখ তুলে স্লীম্যান বন্দীর মুখের দিকে তাকালেন, তারপর হিন্দুস্তানীতে জিজ্ঞেস করলেন, তা, কি চাই তোমার ?—স্লীম্যান যেন এখনও সেই ফাইলেই আছেন।

ফিরিঙ্গীয়া জবাব দিল—সাহেব, তুমি আমার মা, বৌ আর ছেলেকে আটকে রেখেছ !

স্লীম্যান বললেন, হুঁ, সত্য বটে ! ওরা আমার কাছেই আছে।

ফিরিঙ্গীয়া বলল, সাহেব, আমি নির্দোষ গাঁয়ের লোক। কেন মিছিমিছি তুমি আমার পরিবার-পরিজনের ওপর জবরদস্তি করছ ? আমাকেই বা কেন ধরিয়ে এনেছ ? কেন সাহেব তুমি আমাদের ওপর অত্যাচার করছ ?

স্লীম্যান লক্ষ্য করলেন, ফিরিঙ্গীয়া উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার গলার স্বর কাঁপছে। চোখের সাদা এলাকাটা ক্রমে লাল হয়ে এসেছে। যাক্, ক্রুদ্ধ ফিরিঙ্গীয়াকেও তাঁর একবার নিজের চোখে দেখবার বাসনা ছিল, সেটা পূর্ণ হল। তিনি এবার সোজা ফিরিঙ্গীয়ার চোখের দিকে তাকালেন, তারপর চোখটা সেখানেই বিঁধিয়ে রেখে বললেন, তাহলে তুমি নির্দোষ ?

—হ্যাঁ, সাহেব। বিন্দুমাত্র ভয়ের লক্ষণ নেই ফিরিঙ্গীয়ার গলায়।

—চুপ রও শয়তান ! হঠাৎ সিংহের মত গর্জন করে চেয়ারটাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন স্লীম্যান। তারপর অনর্গল রামসীতে বলে চললেন নির্দোষ ফিরিঙ্গীয়ার নির্দোষিতার বিবরণ !

ফিরিঙ্গীয়া নির্বাক। এতটা সে আশা করেনি। তার সবচেয়ে গোপন খুনটিরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে চলেছেন সাহেব। মন্ত্রমুগ্ধ ফিরিঙ্গীয়া ভেবে পাচ্ছে না, এ কি করে সম্ভব ? অবাক হয়ে সে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পুরো আধ ঘণ্টা একটানা গর্জন করে চললেন স্লীম্যান। তারপর কথা থামিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালেন। ফিরিঙ্গীয়া তখনও অবাক হয়ে সাহেবের দিকে তাকিয়ে আছে। সে যেন কোন মরা মানুষ, তার যেন চৈতন্য লোপ হয়ে গেছে। স্লীম্যান অফিসারদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর ধীর গলায় বললেন—বল, রাজসাক্ষী হতে রাজী! এখনও ভেবে দেখ, সময় রইল এক মিনিট! পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে টেবিলে রাখলেন স্লীম্যান, তারপর জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। কোথাও কেউ নেই, শুধু দেওয়াল-ঘড়িটা টিক টিক করছে।

মুহূর্ত পরেই আবার ঘুরে দাঁড়ালেন স্লীম্যান। ঠগীদের রাজা ফিরিঙ্গীয়া তখন যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। স্লীম্যান অবাক হয়ে দেখলেন, শাল গাছের মত প্রবল মানুষটা ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে, তার গাল বেয়ে জল পড়ছে!

১২

তার পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত।

স্লীম্যান এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রাখলেন। চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। কিন্তু সাহেবকে তবু ঠেকান গেল না, ফিরিঙ্গীয়ার হাতের বাঁধন খুলে গেল। ঠগীদের রাজা ফিরিঙ্গীয়া 'ফিরিঙ্গী ঠগের' অনুচর হল। সে রাজসাক্ষী হয়ে গেল। সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে পাপস্খলনে নামল। সে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা, অভাবিত যোগ। শিকার আর শিকারী এখন সহচর—বন্ধু। সুতরাং, শত শত বছরের ইতিহাস এবার দ্রুত উপসংহারের দিকে এগিয়ে চলল। দেখতে দেখতে কোন যাদুবলে যেন হিন্দুস্তানের প্রশান্ত মুখ থেকে সেই কালো কালো দাগগুলো মিলিয়ে গেল।

আজকের মত দেশে তখন রেল নেই, তার নেই। ডাক তখনও ঘোড়ার পিঠে, বেন্টিঙ্কের প্রিয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেনারেল কখনও উটের পিঠে, কখনও গরুর গাড়িতে, কখনও পাল্কীতে। অথচ কাজের এলাকা তাঁর হাজার হাজার বর্গমাইল। তারই মধ্যে অসাধ্য সাধন করলেন 'ফিরিঙ্গী ঠগ'। দশ বছর পরে, ১৮৪০ সনে হিসেব বের হলে দেখা গেল, তাঁর হাতে ধরা পড়েছে মোট তিন হাজার ছ'শ উননব্বই জন ঠগ। তার মধ্যে ফাঁসী হয়েছে ৪৬৬ জনের, দ্বীপান্তরী হয়েছে ১৫০৪ জন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে ৯৩৩ জনের, রাজসাক্ষী হয়েছে

৫৬ জন, রোগে-শোকে মারা গেছে ২০৮ জন এবং পালিয়ে গেছে ১২ জন।

যারা পালিয়ে যেত দু'দিন পরেই আবার তারা ফিরে আসত। স্লীম্যানের জাল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। ১৮৩৪ সনে অদ্ভুত উপায়ে জব্বলপুরের কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়েছিল সাতাশ জন। মাসের পর মাস চেষ্টায় মেঝের পাথর গুঁড়িয়ে সেই ধুলো তেলে-ভেজা সুতোয় মাখিয়ে মাখিয়ে তৈরী হয়েছিল তাদের করাত! সেই সুতোর করাতে লোহার গরাদ কেটে রাতের অন্ধকারে মিশে লাফিয়ে পড়েছিল ওরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তবুও পালান হয়নি ওদের। ক'মাস পরে কয়েক শ' মাইল দূরের এক গ্রাম থেকে স্লীম্যান আবার জব্বলপুরের পুরানো ঠিকানায় ফিরিয়ে এনেছিলেন ওদের। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে কোন ঠগীর পক্ষে পালিয়ে থাকা আর সম্ভব নয়। ঠগীদের সম্ভাব্য ঠিকানাগুলোও তখন তাঁর মুখস্ত। তিনি লিখছেন (১৮৪০) :

তামাম ভারতে অতঃপর যদি কোথাও ঠগী থেকে থাকে তবে তা থাকা সম্ভব একমাত্র পূর্ববঙ্গে। আমার ধারণা, সেখানে ওরা এখনও কিছু কিছু আছে। সম্প্রতি মেদিনীপুর এলাকায়ও ক'টি বিক্ষিপ্ত উপনিবেশ আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে তার জন্যে ভাবনা নেই। ক্যাপ্টেন ভ্যালান্স এবং মিঃ ইউয়ার্ট তার দায়িত্ব নিয়েছেন। যতদূর মনে হচ্ছে, অযোধ্যা আর পূর্ববঙ্গ বাদ দিলে আমার সামনে কর্মক্ষেত্র এখন কটক জেলা। তবে সেও কয়েকদিনের মামলা!

সত্যিই তাই। জীবনের তুলনায় ঠগীদের মরণের কাল খুবই কম, দীর্ঘ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সে সময়টুকু বোধহয় সত্যিই 'কয়েক-দিনের' বেশী নয়।

পরবর্তী সাত বছরে (১৮৪০-৪৭) ধরা পড়ল আরও পাঁচশ' একত্রিশ জন। তাদের মধ্যে ফাঁসীকাঠে নজরানা দিল ৩৫ জন,

দ্বীপান্তরী হল ১৭৪ জন, যাবজ্জীবনের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল ২৬৭ জন এবং রাজসাক্ষী হয়ে ফিরিঙ্গীয়ার পথে প্রায়শ্চিত্তে নামল ৪৬ জন। ২ জন সেবারও পালিয়ে গিয়েছিল।

পরের বছর (১৮৪৮) ধরা পড়ল একশ' কুড়িজন। তাদের মধ্যে ৫ জনের ফাঁসী হল, ২৪ জন দ্বীপান্তরী হল, ১১ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল, ৯ জন রাজসাক্ষী হল এবং অবশিষ্টরা কেউ ছাড়া পেল, কেউ স্বল্পমেয়াদী কারাবাসের সাজা পেল।—ব্যস, শত শত বছরের কলঙ্কময় নিষ্ঠুর ইতিহাস অতঃপর সেখানেই শেষ। ঠগী—বিশ্বের নিপুণতম, দুর্দ্ধর্ষতম, হিংস্রতম খুনী হিন্দুস্তানের ঠগী তারপর থেকে সত্যিই ইতিহাস।

তারপরও অবশ্য মাঝে মাঝে শোনা যেত তাদের কথা। এমনকি বহু পরে, ১৮৫৩ সনেও পাঞ্জাবে ধরা পড়েছিল একটি দল। ধরেছিলেন 'ঠগী স্লীম্যানে'র পুত্র ষোড়শ লাইট ড্রাগুন-এর তরুণ সৈনিক হেনরী আর্থার স্লীম্যান। কিন্তু সে নেহাতই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ঠগী তখন প্রধানত লোকমুখেই বেঁচে আছে মাত্র।

আজও তা আছে। তবে ভারতের পথে-প্রান্তরে নয়, সেই ভয়াবহ নামটি আজ একটি অর্থপূর্ণ শব্দ মাত্র। কখনও তা শোনা যায় নাৎসীদের বিশেষণ হিসেবে চার্চিলের মুখে, কখনও শিকাগোর কুখ্যাত গ্যাংস্টারদের বিকল্প পরিচয় হিসেবে মার্কিনী কাগজে, কখনও বিলিতি গল্প-উপন্যাসে, কখনও বা কোন শব্দের মানে খুঁজতে গিয়ে খাস অক্সফোর্ড ডিক্সনারীর পাতায়। এমনকি কলকাতার নগর কোতোয়ালদের সর্বশেষ রিপোর্টের পাতায় পর্যন্ত। যদিও সুদূর ১৯০৪ সনে পাকাপাকিভাবে ঠগী-দমন বিভাগের উচ্ছেদ হয়ে গেছে, তবুও চোর ডাকাত ইত্যাদি অপরাধীর তালিকায় পুলিশের খাতায় 'ঠগী' এখনও বেঁচে আছে! তবে সেও একটি শব্দ মাত্র। ঠগীর ইতিহাসে

চূড়ান্ত যবনিকা টানা হয়ে গেছে সেদিনই, 'ফিরিঙ্গী ঠগ' স্লীম্যান যেদিন সগরের সেই সাদা বাংলোটায় বসে মোমের আলোয় তাঁর শেষ রিপোর্ট লিখছেন।

১৮৪০ সনের আগস্ট মাসে নিজামবাহাদুরের এক প্রভাবশালী সামন্ত মাথা হেঁট করে লিখেছিলেন—তাজ্জব হলাম সাহেব, তোমরা যাদুকর! অভিযানের সূচনায় তিনি ছিলেন স্লীম্যানের অন্যতম প্রতিবাদী, সাহেবের এই ঠগ ঘাঁটাঘাঁটিতে একদম মত ছিল না তাঁর। কিন্তু '৪০ সনের রিপোর্ট পড়ে মত বদলাতে হয়েছিল তাঁকে। নিজেই তিনি এগিয়ে এসেছিলেন সাহেবকে অভিনন্দন জানাতে—সাহেব, তুমি প্রেরিত পুরুষ!

১৮৫১ সনের ১৭ই জুলাই তারিখে 'বেঙ্গল ক্রনিক্যাল'-এর পাতায় আবির্ভূত হলেন এক বেনামী পত্রলেখক। সকলের হয়ে তিনি লিখছেন—স্লীম্যান, তুমি যা দেখালে সে অবিশ্বাস্য! এর চেয়ে অনেক সহজ ছিল সিন্ধু বা পাঞ্জাব বিজয়। ঠগীদমন, পেগুকে সাম্রাজ্যভুক্ত করার চেয়েও, অনেক অনেক বেশী কঠিন কাজ। ভারতের ইতিহাসের আর সাধ্য নেই কোনদিন তোমাকে ভোলে! '৫৩ সনে উত্তর দিলেন স্লীম্যান : আমি এমন বলব না, ভারতে আজ আর একজনও ঠগী নেই। চলতে চলতে কোন পথিক হয়ত আজও হঠাৎ উধাও হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা হবে কোন একক, বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সুসংগঠিত দল হিসেবে ঠগী আজ অতীতের কাহিনী। ওদের আর কোন দল নেই, ভবিষ্যতে কোন দিন আর তা হবেও না। কোন ঠগী আর কোনদিন তার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত বিদ্যাকে পেশা হিসেবে আপন সন্তানের হাতে তুলে দিতে পারবে না। এদেশের জন্যে আমরা যদি আর কিছু নাও করে থাকি, তবে এই একটি ভাল কাজ অবশ্যই করেছি!

কথাগুলো স্লীম্যান বলতে পেরেছিলেন, কারণ শুধু ঠগীদমন নয়—ঠগীদের পরবর্তী স্বাভাবিক জীবনের ভিত্তিটুকুও তিনিই আপন হাতে রচনা করেছিলেন। তাঁর মানবিক হাতের স্পর্শেই তখন তাদের অন্য পোষাক, অন্য পরিচয়। কখনও দেখা যেত স্লীম্যান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন আর ঠগীরা পথের ধারে চারাগাছ বসাচ্ছে। গতকাল অবধিও বিনাশ ছিল যাদের ধর্ম, তারা পরম যত্নে মাটি তৈরী করছে, চারাগাছের গোড়ায় জল দিচ্ছে। নর্মদার ঝাঁসী-ঘাট থেকে গঙ্গাতীরের মীর্জাপুর পর্যন্ত ছিয়াশী মাইল পথের তু'ধারে যত গাছ সব ঠগীদেরই হাতে বসান। 'ফিরিঙ্গী ঠগ' তাদের ধর্মহরণ করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি তাদের নবধর্মেও দীক্ষিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন—স্বাভাবিক মানুষের ধর্মে। ১৮৪৭ সনে জব্বলপুরের কর্মশালায় উঁকি দিলে দেখা যেত, যে হাত ক'দিন আগেও ফাঁসীর রুমাল ছাড়া আর কিছু ধরতে জানত না, নিপুণ হাতে ঠকাঠক তাঁত চালাচ্ছে তারাই। ঠগী-বৌ মোম গড়ছে, প্রদীপের জন্যে পলতে বানাচ্ছে। ঠগীর ছেলে কেতাব পড়ছে, হাতের কাজ শিখছে।

এই শিল্প-বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৮৩৮ সনে। জনক—'ফিরিঙ্গী ঠগ' স্লীম্যান। পরিকল্পনাকারী—ক্যাপ্টেন চার্লস ব্রাউন। পরিচালক মিঃ উইলিয়ামস। সেখানে তখন (১৮৪৭) মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় সাড়ে আটশ' ঠগ। তাদের কেউ পাহারাদার, কেউ কারিগর। স্লীম্যান নিয়ম করেছিলেন, যারা রাজসাক্ষী হয়েছে কিংবা যারা ফাঁসীকাঠে জীবন দিয়েছে তাদের পরিবার-পরিজনদের আবার সংসারের মুক্ত অঙ্গনে ফিরে যাওয়ার আগে প্রত্যেককে এখানে কিছুকাল কাটিয়ে যেতেই হবে। জীবিকার অজুহাতে কাউকে তিনি ভবিষ্যতে আবার পুরানো পথে ফিরে যেতে দিতে রাজী নন। সংসারের জন্যেও একটি নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর আদেশ ছিল, নতুন করে পরিচয় অর্জনের আগে কোন ঠগীর সন্তান বিয়ে করতে

পারবে না। তিনি চান না হিন্দুস্তানের কোন মানুষ ভবিষ্যতে বলুক—আমি ঠগীর ছেলে, বাবা আমার ঠগী ছিল।

ওরা প্রথম প্রথম আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু দু'দিন বাদেই হাতে নগদ পয়সার স্পর্শ পাওয়া মাত্র সব আপত্তি দূর হয়ে গেল। মন্ত্রপূত কোদাল আর রুমালের কথা ভুলে পুরানো জমাদার কার্পেটে ফুল ফোটাবার সাধনায় মত্ত হল। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন স্লীম্যান। তাঁরই নির্দেশে, তাঁরই নকশার ছক ধরে তৈরী হচ্ছে এই বিরাট কার্পেট। শেষ করতে পারলে লম্বায় সেটি হবে আশী ফুট, চওড়ায় চল্লিশ ফুট। এ কার্পেট বিলেত যাবে। মহারাণীর খাস কামরার শোভা হয়ে থাকবে। ঠগীদের সম্পর্কে তাঁর প্রবল আগ্রহ। মিডাস টেলারের 'জনৈক ঠগীর জবানবন্দী'র প্রথম পাঠিকা তিনি। বই ছাপা হওয়ার আগে 'প্রুফ কপি' পড়তে পড়তেই নাকি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। স্লীম্যান দেখাতে চান শুধু খুনের দক্ষতায় নয়, ইচ্ছে করলে ঠগীর হাত মহারাণীকে ফুলের নক্সায়ও সমান তন্ময় করে তুলতে পারে!

তাই করেছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সেই প্রিয় কার্পেটখানা আজও রয়েছে উইণ্ডসর ক্যাসেলের ওয়াটারলু চেম্বারে। ওজনে সেটি প্রায় দুই টন। পশ্চিমে হিন্দুস্তানের ঠগীদের অন্যতম স্মৃতি এই কার্পেট। ঠিক তেমনি পূবের চোখে 'ফিরিঙ্গী ঠগে'র সবচেয়ে স্মরণীয় স্মৃতি আজ মধ্যপ্রদেশের একটি গ্রাম। সেখানে গাঁয়ের মন্দিরে স্লীম্যানের নামে আজও প্রতি সন্ধ্যায় একটি পিতলের প্রদীপ জ্বলে।

সেবার এমেলিকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে এসেছেন স্লীম্যান। সুযোগ পেলেই তিনি তা করেন—চাষীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের ন, আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতি বিষয়ে খোঁজ খবর করেন। কিন্তু সেবার রীতি পাল্টে গেল, গাঁয়ের লোক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওঁদের

দিকে তাকিয়ে রইল। তারা খবর রাখে সাহেব বিয়ে করেছেন আজ চার বছর, কিন্তু আশ্চর্য, মেমসাহেবের কোলে তবুও কোন সন্তান নেই কেন? সহানুভূতিশীল পুরোহিত বললেন—সাহেব, অনুগ্রহ করে তুমি এক কাজ কর, মেমসাহেবকে নিয়ে তুমি আমাদের মন্দিরে চল। এ মন্দিরে যাঁরা পুজো দেন, মা ষষ্ঠীর অশেষ করুণা তাঁদের ওপর, বছর ঘুরে না আসতে তাঁরা পুত্রবতী হন।

কৌতূহলী দম্পতি হেসে মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন। যথারীতি পুজো-আর্চা হল। স্লীম্যান বললেন, আশীর্বাদ যদি ফলে তবে আমি এ মন্দিরের দৈন্যদশা ঘুচিয়ে দেব; মালগুজারকে বলে রেখো এর সংস্কার করতে যা খরচ হবে আমি তা বহন করব।

সত্যি সত্যিই বছর ঘুরে না আসতে এমেলির কোলে এল ওঁদের প্রথম সন্তান, হেনরী আর্থার! স্লীম্যান কথার খেলাপ করলেন না। স্ত্রীকে নিয়ে আবার তিনি সেই গাঁয়ে চললেন।

মন্দির সারাই হল। শুধু মন্দির নয়, সাহেবের হাতের স্পর্শে গোটা গাঁয়ের চেহারা পাল্টে গেল। সরকার থেকে ছিয়ান্নব্বই একর ফসলী জমি জোগাড় করলেন স্লীম্যান। ভূমিহীনদের মধ্যে তা বিলি করা হল। গোটা গাঁয়ে 'ধন্য' 'ধন্য' রব উঠল। গাঁয়ের মানুষ এক হয়ে ঘোষণা করল —আজ থেকে এই গ্রামের নাম রইল—স্লীমেনাবাদ। যতদিন হিন্দুস্তান থাকবে ততদিন তার মাটির বুকে একটি গ্রামের ঘরে অন্তত বেঁচে থাকবে সগরের এই সাহেব। দুনিয়া জানবে, হিন্দুস্তান শুধু ঠগীদের দেশ নয়, তাদের যিনি উচ্ছেদ করতে নেমেছেন এদেশের মানুষ তাঁকেও ভালবাসে! গাঁয়ের মন্দিরে সেদিন সন্ধ্যায় একটি মঙ্গলদীপ জ্বালান হয়েছিল। স্লীমেনাবাদ ঘোষণা করেছিল—যতদিন এই মন্দির থাকবে ততদিন প্রতি সন্ধ্যায় এই শিখাটিও জ্বলবে!

স্লীমেনাবাদে আজও তা জ্বলে। এ মঙ্গলদীপ শুধু 'ফিরিঙ্গী ঠগী'র উদ্দেশ্যে ভারতের প্রণতি নয়, এ শান্তি-প্রদীপ ঠগী-মুক্ত ভারতেরও

প্রতীক। ভারতে আর ঠগী নেই। রোসন জমাদার, রুস্তম খাঁ, এনায়েৎ, দুর্গা, কল্যাণ সিং, ফিরিঙ্গীয়া, কেউ আর বেঁচে নেই। যদি থাকত তবে দমকা হাওয়া হয়েই হয়ত ওরা একদিনের জন্যে হলেও সেই শিখাটিকে নিভাতে চেষ্টা করত! কিন্তু ঠগীর সেই শেষ বাসনার কাহিনীও আজ ইতিহাস।

১৮৫৬ সনে দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছরের কর্মজীবনশেষে ভারত ত্যাগের মাত্র কয়মাস আগের কথা। স্লীম্যান তখন আর সগরের সেই তরুণ 'ফিরিঙ্গী ঠগ' নন, তিনি পরিণতবয়স্ক প্রবীণ রাজনীতিক। ঠগীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অতি অল্প। ১৮৩৮ সনে তিনি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জেনারেলের পদ থেকে কমিশনার হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ১৮৪৮ সন থেকে আবার তিনি পাকাপাকিভাবে রাজনৈতিক আসনে ফিরে এসেছেন। কেননা, দেশে আর ঠগী নেই। বাধক ডাকাতেরাও অবলুপ্তপ্রায়। অতঃপর পুরানো চেয়ারে বসে থাকার অর্থ, মিছিমিছি সময় এবং শক্তির অপচয়। তবুও নজর রাখা প্রয়োজন। সে দায়িত্ব নিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের আসনে বসেছেন তাঁর প্রিয় ভাইপো কর্ণেল জেমস স্লীম্যান। বুন্দেলখণ্ডে গভর্ণর-জেনারেলের আপন প্রতিনিধি বিখ্যাত উইলিয়াম হেনরী স্লীম্যান এখন (১৮৪৯) লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট। অযোধ্যার বর্তমান এবং ভবিষ্যত চিন্তা ছাড়া তাঁর যদি আর কোন নেশা থেকে থাকে তবে সে নৃতত্ত্ব। তিনি প্রমাণ করতে চান, পাঞ্জাবের দলীপ সিং আর কেণ্টের নাইটেরা আদিতে এক। ঠিক তেমনি হিন্দুস্তানের জাঠ আর জুটল্যাণ্ডের জুটরাও রক্তে অভিন্ন। সবাই তারা খাসগড়ের লোক! এসব নির্দোষ গবেষণা ছাড়া অসুস্থ ক্লান্ত স্লীম্যানের এখন আর কোন নেশা নেই। তিনি তখন মনে মনে ভারত থেকে বিদায় নিয়ে ফেলেছেন। আর ক'মাসের মধ্যেই তিনি এদেশ ত্যাগ করছেন।

প্রতিদিনের অভ্যেসমত সেদিনও বারান্দায় স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের

সঙ্গে সন্ধ্যা কাটিয়ে নিজের ঘরে ঢুকছেন প্রবীণ রেসিডেন্ট। তাঁর একটা হাত অবশ হয়ে গেছে, চোখে আলো কম। চারদিকে ঘন অন্ধকার। তবুও কি মনে করে হঠাৎ দরজার কাছে এসেই বাঁ হাতে এক ঝটকায় ভারী পর্দাটা সরিয়ে ফেললেন তিনি। সঙ্গে ছিল কন্যা এলিজাবেথ। সে সভয়ে দেখল, ছোরা হাতে একটি লোক দাঁড়িয়ে।

—তুমি ঠগী! বহুকাল ভুলে যাওয়া 'রামসী'তে গর্জন করে উঠলেন স্লীম্যান। আরও দু'বার আততায়ীর মোকাবেলা করতে হয়েছে তাঁকে। তিনি জানতেন, সেই দু'জনের কেউ-ই ঠগী ছিল না। ওরা ছিল রাজনৈতিক খুনী। কিন্তু এবার আর চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না তাঁর। 'রামসী'তেই ধমকে উঠলেন তিনি—ছোরাটা আমার হাতে দাও!

আশ্চর্য, মন্ত্রমুগ্ধের মত লোকটি ছোরার হাতলটা ধীরে ধীরে স্লীম্যানের দিকে বাড়িয়ে ধরল। হাতিয়ারটা হাতে নিয়ে বাইরের দিকে অঙ্গুলি দেখালেন স্লীম্যান—যাও, এদেশে যেন আর কোনদিন তোমার মুখ না দেখা যায়!

লোকটা সেলাম করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর নিঃশব্দে অন্ধকারে মিশে গেল।

সম্ভবত সে-ই ভারতের শেষ ঠগী। অন্তত স্লীম্যান তাই বলেছিলেন। ভয়ার্ত এলিজাবেথের কানে কানে 'ফিরিঙ্গী ঠগ' বলেছিলেন—মাকে বলার দরকার নেই, এই বেচারাই হিন্দুস্তানের শেষ ঠগী!

পরিশিষ্ট

ঠগী বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় অনেক পুঁথি-পত্র রয়েছে। তার প্রায় সব ক'টিরই উৎস স্লীম্যানের নিজের লেখা বই এবং রিপোর্ট-গুলো। স্লীম্যান অনেক বইয়ের গ্রন্থকার। তাঁর ঠগী সম্পর্কিত রচনাগুলির নাম—Ramaseeana or A Vocabulary of the Peculiar language used by the Thug Gangs of Upper and Central India (1836) ; A Report on the System of the Megpunnaism in Delhi and Native States…etc. (1839) ; Papers on Thuggee ; Report on the Tusma Baz Thugs ; Report on the Depredations committed by the Thug Gangs of Upper and Central India (1840) এবং Illustrations of the History and Practice of the Thugs. শেষোক্ত বইটি নানা রিপোর্ট এবং জবানবন্দীর সংকলন। সংকলক—Edward Thornton। এতে জলের ঠগীদেরও কয়েকটি কাহিনী আছে। Papers on Thuggee বইটিতে ঠগীদের কুলপঞ্জী এবং তাদের চলাচল পথের মানচিত্রগুলো অন্যতম আকর্ষণীয় উপাদান। এছাড়া আর একটি আকর্ষণীয় গ্রন্থ বিখ্যাত Rambles and Recollections of an Indian Official (প্রথম প্রকাশ ১৮৪৪, অক্সফোর্ড সংস্করণ, Ed. V. Smith, 1915)। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বইটি বোন মেরী ফার্স-এর কাছে লেখা (১৮৩৬—   ) চিঠির ভিত্তিতে রচিত। তার প্রতিপাদ্য বিষয় কেবলই ঠগী নয়। কিন্তু 'ঠগী স্লীম্যানে'র লেখা বলেই ঠগীরাও সেখানে অনুপস্থিত নয়।

ঠগী-ধর্ম এবং তাদের আচার সম্পর্কিত সমসাময়িক আর একটি উল্লেখযোগ্য বই—Tribes and Castes of Central India, —R. V. Russell & Lall; ঠগীদের চিত্রশোভিত এই বইটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ঠগীদের বিষয়ে লিখিত সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের বইগুলোর মধ্যে আছে A Popular Account of the Thugs and Dacoits (1857)—James Hutton; Some Records of Crime—General Hurvey এবং স্লীম্যানের পৌত্র কর্নেল স্যার জেমস স্লীম্যানের লেখা—Thug, or A Million Murders. তিনি হিসেব করেছেন, তিনশ' বছরে ঠগীরা অন্তত দশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। হিসেবটার মধ্যে হয়ত কিছু বাড়াবাড়ি আছে, কিন্তু সংখ্যাটা যে তার কাছাকাছি কিছু হবে সে বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। কেননা, বরহাম স্বীকার করেছিল, তার চল্লিশ বছরের কর্মজীবনে সে হত্যা করেছে ৯৩১ জনকে। আর একজন, ফুলি থাঁর কুড়ি বছরের কর্মজীবন তল্লাস করে পাওয়া গিয়েছিল ৫০৮ জন!···স্লীমেনাবাদের মন্দিরটি সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক খবর দিয়েছেন জেমস স্লীম্যান। তিনি লিখেছেন—ঠাকুমা এমেলির পরে (এমেলি স্লীম্যান দেহত্যাগ করেন ১৮৮২ সনে) যখনই আমাদের পরিবারের কেউ সে মন্দিরে গিয়েছেন, তিনিই এক বছরের মধ্যে পুত্রবতী হয়েছেন!

সমসাময়িক ভারতের বিবরণের জন্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Wanderings of a Pilgrim in Search of Picturesque (1858)—Fanny Parkes। তাঁর বইয়ে বিন্ধ্যাচলের মন্দির, প্রতিমা এবং ঠগীদের পথ-নির্দেশক ঘুঁটির চিত্র আছে (Vol. I, Chap. XV দ্রষ্টব্য)। ফেনী গভর্নমেণ্ট গেজেটের যে চিঠিটি উদ্ধৃত করেছেন, তা হালে (১৯৫৯) প্রকাশিত অনিলচন্দ্র দাসগুপ্ত

সম্পাদিত The Days of John Company—Selections from Calcutta Gazette, 1824-1832-তেও রয়েছে। এছাড়া আরও ক'টি প্রয়োজনীয় বইয়ের মধ্যে আছে—Recollections (1852)—Lady Login; History of British India—Edward Thornton; Administration of the East India Company—John William Kaye; India, It's Administration and Progress—Sir John Stratchy; এবং Dr. H. H. Spry লিখিত Modern India (1837)। শেষোক্ত বইটির গ্রন্থকার স্লীম্যানের আত্মীয়। তিনি জব্বলপুরে ঠগীদের জেলে চিকিৎসক ছিলেন। স্লীম্যানের সঙ্গে তিনিও একাধিকবার 'বিল'-এ কবর খোঁড়া দেখেছেন।

ঠগীদের আদি ইতিহাস সম্পর্কে স্লীম্যান হেরডটাস এবং থিভেনটের (Travels, Jean de Thevenot—1684) উল্লেখ করেছেন। অন্যরাও প্রাচীন ইউরোপীয় সূত্র বলতে এই দু'জনকেই উদ্ধৃত করেছেন। আমার চোখে আর একজন প্রাচীন সাক্ষী ধরা পড়েছেন। তিনি বিখ্যাত ভ্রমণকারী ফ্রেইয়ার। ঠগীদের কথা তাঁর বিবরণেও রয়েছে। (দ্রষ্টব্য : A New Account of East India and Persia (1909), Vol. I, pp. 244-5)। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়, স্লীম্যান এলাহাবাদে থাকা কালে ডাঃ শেরউডের যে রিপোর্টটি 'আবিষ্কার' করেন, সম্ভবত সেটি Asiatic Researches-এর একটি খণ্ড। তার ১৩ সংখ্যক খণ্ডে (১৮২০) ডাঃ শেরউড-লিখিত 'On the Murderers called Phansigars' ছাড়াও 'Observations Regarding Bradheks and Thegs' নামে আরও একটি মূল্যবান রচনা আছে। লেখক—J. Shakespear.

প্রসঙ্গত ভিনসেণ্ট স্মিথের যে উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার কথাও উল্লেখযোগ্য। মোগলযুগের পর ভারতের অবস্থার বিবরণ

দিতে গিয়ে স্মিথ (Oxford History of India, Book VIII, Chap. 1, p. 573-) বৈরাগী, পিণ্ডারি, সন্ন্যাসী ইত্যাদির সঙ্গে ঠগীদের একাকার করে ফেলেছেন। সমসাময়িক পটভূমির চিত্র হিসেবে এই অধ্যায়টি মূল্যবান হলেও মনে রাখা দরকার, ঠগী এবং অন্যরা এক নয়। বিশেষত, উত্তর বাংলার সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই। সন্ন্যাসীরা আজ স্বাধীনতার কামনায় জাতীয়তাবাদী যোদ্ধদল হিসেবে স্বীকৃত। (দ্রষ্টব্য : বঙ্কিম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ (আষাঢ়, ১৩৪৫) আনন্দ মঠে ৺যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা)। ঠগীদের মনে সন্ন্যাসীদের মত কোন অস্পষ্ট জাতীয়তার আদর্শও ছিল না। তারা কখনও কোন ইংরেজকে হত্যা করত না।

স্লীম্যানের জীবনীর জন্যে অবশ্যপাঠ্য The Yellow Scarf (1961)—Lt. General Sir Francis Tuker। এতকাল স্লীম্যানের কোন পূর্ণাঙ্গ জীবনী ছিল না। স্যার ফ্রান্সিস লিখেছেন, তাঁর সমসাময়িকরা সকলেই স্বজাতির মধ্যে জীবনীকার খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু স্লীম্যান সেদিক থেকে দুর্ভাগা। তার একটি কারণ '···he never paraded his success before those who might have honoured him.' দ্বিতীয় কারণ, স্লীম্যানের রাজনৈতিক আদর্শ। যে মুষ্টিমেয় ইংরেজের চোখে সেদিন ভবিষ্যত বিদ্রোহের লক্ষণ ধরা পড়েছিল, স্লীম্যান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অযোধ্যার রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি এই রাজ্যটিকে গ্রাস করার পক্ষে ছিলেন না। তাঁর অযোধ্যা ত্যাগের পরেই ১৮৫৭'র বিদ্রোহ। সুতরাং স্লীম্যানকে বীরের সম্মান দেওয়ার তখন সময় কোথায়? স্যার ফ্রান্সিস লিখছেন—'Very few indeed realise how closely he came to averting the catastrophe of 1857.'

স্লীম্যানের কর্মজীবনের সঠিক মূল্যায়নের জন্যে আর একটি

বই—The men who ruled India, the Founders (1953)—Philip Woodruff.

ঠগীদের বিষয়ে কিছু কিছু উপন্যাসও প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে গত শতকে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল Meadows Taylor-এর Confessions of a Thug (প্রথম প্রকাশ ১৮৩৯) এবং একালে John Masters-এর The Deceivers (1952)। উপন্যাস হিসেবে দু'টিই অত্যন্ত সুখপাঠ্য। ইতিহাস-পাঠককে শুধু মনে রাখতে হবে, টেলারের নায়ক আমীর আলি যেভাবে একা একা হত্যা করে বেড়ায়, সত্যিকারের ঠগী আমীর আলি তা করত না, এবং জন মাস্টারস-এর নায়ক উইলিয়াম স্যাভেজ যেভাবে ঠগী ধরেন উইলিয়াম স্লীম্যান সেভাবে ঠগী খুঁজে বেড়াতেন না।

নির্ঘণ্ট